আয়াতুল জিহাদ

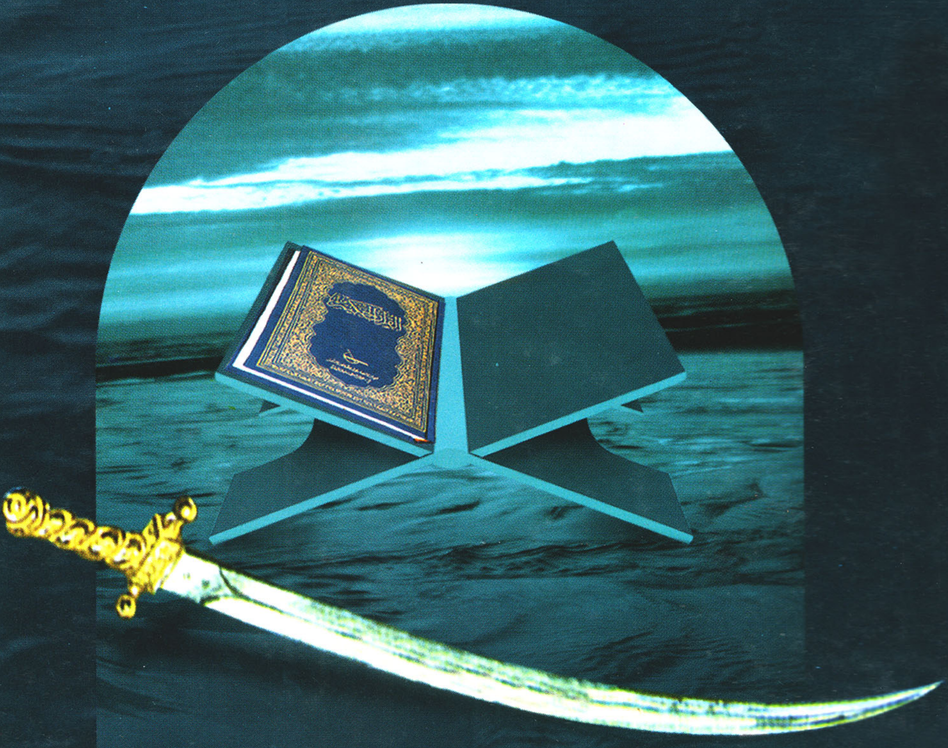

মাওলানা মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান

আয়াতুল জিহাদ

(জিহাদ বিষয়ক আয়াতসমূহের তরজমা ও তাফসীর)

সংকলন ও সম্পাদনা
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
দাওরা ও ইফতা, জামিআ ফারুকিয়া, করাচী
উস্তাযুল হাদীস, জামিআ ইসলামিয়া, ঢাকা
খতীব, রাজার দেউরী জামে মসজিদ, ঢাকা।

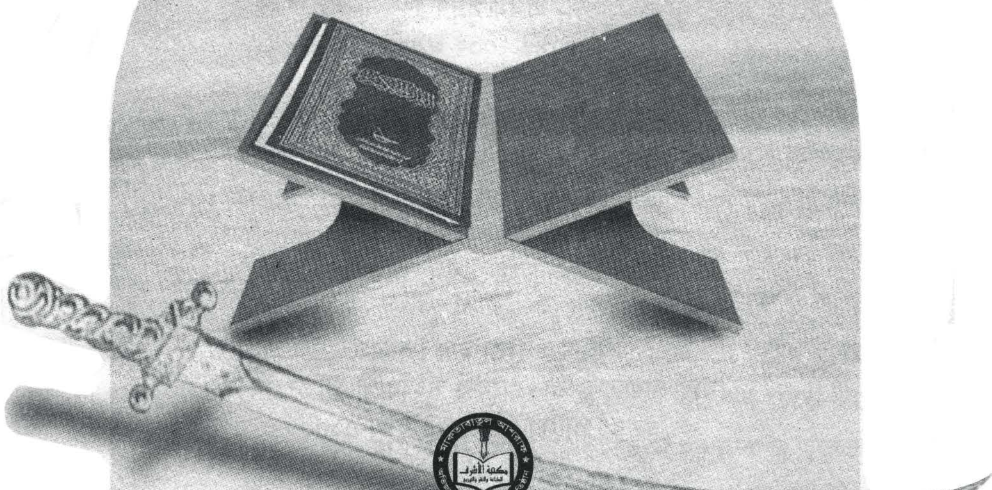

MAKTABATUL-ASHRAF
মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ০১১-৮৩৭৩০৮, ০১৭-১৪১৭৬৪

আয়াতুল জিহাদ

সংকলন ও সম্পাদনা ঃ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান

প্রকাশক
মুহাম্মাদ আবু সা'দ
মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
৫০, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ০১১-৮৩৭৩০৮, ০১৭-১৪১৭৬৪

দ্বিতীয় মুদ্রণ ঃ
জুন ২০০৩ ঈসায়ী

প্রথম মুদ্রণ ঃ
আগষ্ট ২০০২ ঈসায়ী

[সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

প্রচ্ছদ ঃ ইবনে মুমতাজ
গ্রাফিক্স ঃ নাজমুল হায়দার
কালার ক্রিয়েশন, ঢাকা

মুদ্রণ ঃ মুত্তাহিদা প্রিন্টার্স
(মাকতাবাতুল আশরাফের সহযোগী প্রতিষ্ঠান)
৩/খ, পাটুয়াটুলী লেন, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭৩৯৫২৭৪

ISBN-984-8291-22-3

মূল্য ঃ একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

উৎসর্গ

জিহাদকে সন্ত্রাস নামে আখ্যায়িত করে,
সমগ্র দুনিয়াব্যাপী ভয়ঙ্কর বিপর্যয় সৃষ্টির মাধ্যমে
এ যুগের নব্য ফেরাউনরা যখন
ইজ্জত ও আযাদীর পতাকাবাহী,
মিল্লাতের মুহাফিজ ও গৌরব–
মুসলিম মুজাহিদদের জন্য,
আল্লাহর প্রশস্ত যমীনকে
সংকীর্ণ করে তুলেছে।
সেই কঠিন মুহূর্তেও যে সকল জানবাজ মর্দে মুজাহিদ
পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে নীরবে নিভৃতে
তাগুতের দর্পচূর্ণ করে ইনসাফ ও শান্তির
পতাকা উত্তোলন করার মানসে
কলিজার তপ্ত খুন ঢেলে দিয়ে
মিল্লাতের আযাদী ও গৌরবের ইতিহাস রচনা করে যাচ্ছেন,
সে সকল মহান মুজাহিদদের দস্ত মুবারকে।
হে আল্লাহ! আমাদেরকেও এই বেহেশতী কাফেলায় শরীক হওয়ার
তাওফীক দান কর।

– সংকলক

যাদের জন্য এই কিতাব

- যে সকল লোক জিহাদকেই মুক্তির একমাত্র পথ মনে করেন; তাদের জন্য।
- আর যারা জিহাদকেই সকল অশান্তি ও বিপর্যয়ের মূল ভাবেন, তাদের জন্যও।
- যারা জিহাদকে সাম্য, শান্তি ও শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার একমাত্র মাধ্যম মনে করেন, তাদের জন্য।
- পক্ষান্তরে যারা জিহাদকেই সন্ত্রাস মনে করেন, তাদেরও জন্য।
- যারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জিহাদী আদর্শের অনুসারী তাদের জন্য।
- অপরদিকে যারা পাশ্চাত্যের প্রভাবে প্রভাবিত হয়ে "শান্তির ধর্ম ইসলামে জিহাদের মত ভয়ঙ্কর বস্তুর স্থান নেই" ভাবেন, তাদের জন্যও।
- চারিদিকে ভয়ঙ্কর বিপদের ঘনঘটা দেখেও যারা জিহাদের পথে অটল-অবিচল থাকেন, তাদের জন্য।
- আর পৃথিবীর নব্য ফেরাউনদের আস্ফালন দেখে যারা ভয়ে কুঁকড়ে যান এবং মুসলিম নামটিও বদলানোর চিন্তা করেন, তাদের জন্যও।
- জিহাদকেই জীবনের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি মনে করে যারা এই বেহেশতী কাফেলায় শরীক হয়েছেন, তাদের জন্য।
- ক্ষমতার মসনদ ও পদ দখল করে যারা আল্লাহর চিরন্তন বিধান জিহাদকে আত্মঘাতি মনে করেন, তাদের জন্যও।
- ঐ সকল বৃদ্ধ যারা জীবন সায়াহ্নে এসে পিছনে তাকিয়ে ব্যর্থতার গ্লানিতে নত শীর হয়ে জীবনের বাকী সময়টুকু স্বার্থক করতে চান এবং আখেরাতকে নির্মাণ করতে চান, তাদের জন্য।
- ঐ যুবক পাশ্চাত্যের জীবন বিধ্বংসী সংস্কৃতি, প্রযুক্তি ও নেশা যার জীবনকে সূচনাতেই কুড়ে কুড়ে খেয়ে শেষ করে দিয়েছে অথচ উন্নতি ও সফলতা এখনও তার পদচুম্বন করতে পারে, তার জন্যও।
- ঐ কিশোর ও বালক, যাদের ধর্মবিমুখ, পাশ্চাত্য সভ্যতার নগ্ন স্রোতে গা ভাসাতে অভ্যস্ত পিতা-মাতা, নিস্পাপ সন্তানকেও বিধর্মীর হাতে তুলে দিয়ে সন্তানের উপকার করছেন বলে মনে করেন, তাদের জন্যও।

মোটকথা বৃদ্ধ, যুবক, কিশোর, ধর্মপ্রাণ, ধর্মবিমুখ, রাজা-প্রজা, মালিক-শ্রমিক, শিক্ষক, বুদ্ধিজীবী তথা সর্বস্তরের সকল বয়সের মুসলমানদের জন্য এই কিতাব।

সংকলকের কথা

بسم الله الرحمن الرحيم

আল্লাহ পাক মানব জাতিকে পৃথিবীতে শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা ও রক্ষার গুরু দায়িত্ব দিয়ে তাঁর খলীফারূপে প্রেরণ করেছেন। তাঁদের জীবন বিধান হিসেবে নাযিল করেছেন পবিত্র কুরআন। আল্লাহপাকের সর্বশ্রেষ্ঠ সৃষ্টি, সমগ্র জগতের রহমত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনও ছিল কুরআনেরই বাস্তব নমূনা।

মহান রাব্বুল আলামীন পবিত্র কুরআনে যে বিষয়টিকে সবচেয়ে বেশী আলোচনা করেছেন, তাহলো এই পৃথিবীর শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষার একমাত্র পথ– জিহাদ। যার দরুণ দেখা যায় যে, ইসলামী আমলসমূহের মধ্যে জিহাদের আলোচনা যেরূপ বিস্তারিতভাবে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, অন্য কোন আমলের আলোচনা এরূপ বিস্তারিতভাবে করা হয়নি।

আল্লাহপাক ঈমানদারদেরকে এই আমলে উৎসাহী ও অভ্যস্ত করার জন্য সূরার পর সূরা নাযিল করেছেন। প্রায় অর্ধ সহস্র আয়াতে বিভিন্নভাবে জিহাদের উদ্দেশ্য, উপকারিতা ও প্রয়োজনীয়তার কথা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করেছেন। মুজাহিদের মর্যাদা, জিহাদ না করার ভয়ংকর পরিণতির কথাও স্পষ্টভাবে বর্ণিত হয়েছে।

কুরআন শরীফ গভীর মনোযোগ সহকারে অধ্যয়ন করে কোন কোন প্রসিদ্ধ মুফাসসির এই মর্মে মত প্রকাশ করেছেন যে, পবিত্র কুরআনের আলোচ্য বিষয়ই হলো জিহাদ।

আল্লাহ পাক কুরআন মাজীদের বিভিন্ন জায়গায় جهاد في سبيل الله এর পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করেছেন। যার অর্থ, "আল্লাহর পথে সশস্ত্র সংগ্রাম" তাছাড়া قتال শব্দও বারবার এসেছে। পবিত্র কুরআনে (সামান্য ব্যতিক্রম সহ) جهاد في سبيل الله ২৬ বার আর قتال শব্দটি ৭৯ বার বর্ণিত হয়েছে।

পবিত্র কুরআনের বেশ কয়েকটি সূরা পরিপূর্ণরূপে জিহাদের ফযীলত, আহকাম ও জিহাদ ত্যাগ করার ভয়ংকর পরিণতি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। যেমন দশ রুকু বিশিস্ট 'সূরা আনফাল' যার অপর নাম 'সূরা বদর', ষোল রুকু বিশিষ্ট 'সূরা বারাআত' যার অপর আরো কয়েকটি নাম আছে।

পবিত্র কুরআনের বেশ কয়েকটি সূরার নাম জিহাদ বিষয়ক পারিভাষিক শব্দে রাখা হয়েছে। যেমন, সূরা আহযাব, সূরা মুহাম্মদ, [যার অপর নাম قتال (সশস্ত্র সংগ্রাম)] সূরা ফাতাহ, (বিজয়) সূরা সাফ (মুজাহিদদের কাতার), সূরা হাদীদে যুদ্ধ উপকরণের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এছাড়া সূরা বাকারা, সূরা আলে ইমরান, সূরা নিসা, সূরা হুজুরাত, সূরা ইউনুস, সূরা রূম ও সূরা হজ্জেও বিস্তারিতভাবে জিহাদের কথা বর্ণিত হয়েছে।

(ফাযায়েলে জিহাদ, মাওলানা মাসউদ আযহার ৭ পৃঃ)

আমরা আমাদের এ গ্রন্থে চৌদ্দটি অধ্যায়ে তিনশত চল্লিশখানা জিহাদ সংক্রান্ত আয়াতের তরজমা ও তাফসীর পেশ করেছি। অবশ্য কিছু সংখ্যক আয়াতে একাধিক বিষয় বর্ণিত হওয়ায় একাধিক অধ্যায়ে তার আলোচনা এসেছে।

এ বিষয়ে এ ধরনের প্রয়াস বাংলা ভাষায় এই প্রথম। যদি কোন যোগ্য ব্যক্তি এদিকে মনোযোগী হন, তাহলে এ বিষয়ে আরো বৃহৎ ও বিস্তারিত গ্রন্থ তৈরী হতে পারে। আল্লাহ পাক

এ মহান খেদমতের জন্য তার কোন যোগ্য বান্দাকে নিয়োজিত করুন। আমীন।

এ কিতাবটি সংকলনের কাজ শুরু করেছিলাম আজ থেকে প্রায় এক যুগ আগে ১৪১১ হিজরীর জিলক্বদ মাসে জিহাদের আমলে লিপ্ত থাকা অবস্থায়। সে সময় এ কাজে আমাকে যারা উৎসাহিত করেছিলেন এবং সহযোগিতা করেছিলেন তাদের অনেকেই শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করে আল্লাহ পাকের সান্নিধ্যে চলে গেছেন। আল্লাহ পাক ঐ সকল শহীদের মর্যাদা বৃদ্ধি করুন। আমীন।

প্রথমাবস্থায় শুধুমাত্র আয়াতসমূহ ও তাঁর তরজমা পেশ করা হয়েছিল। পরবর্তীতে কয়েকজন বন্ধু ও মুরুব্বী তরজমার সাথে সাথে তাফসীর সংযুক্ত করার পরামর্শ দেন, মূলতঃ তাদের পরামর্শেই গ্রন্থটি বর্তমানরূপে বিন্যাস করা হয়েছে। তরজমা ও তাফসীর উভয়টিই জগদ্বিখ্যাত আলেম ও মুফাসসির হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী (রহঃ)-এর বিখ্যাত তাফসীর গ্রন্থ "মাআরেফুল কুরআন" থেকে নেওয়া হয়েছে। মূল কিতাব থেকে কপি করার মত কঠিন কাজটি আ াম দিয়েছেন আমার ছাত্র ও সহকর্মী মাওলানা আবদুল হাই। আল্লাহ পাক তাকে উত্তম বিনিময় দান করুন।

মাকতাবাতুল আশরাফের পুস্তক তালিকায় বইটির নাম আমরা অনেক আগেই ছেপে দিয়েছিলাম এবং আশাও ছিল খুবই তাড়াতাড়িই প্রকাশ করার কিন্তু বিভিন্ন অসুবিধার কারণে বেশ দেরী হয়ে গেল। যার ফলে অনেকেই বার বার চিঠি লিখেছেন, ফোন করে খোঁজ নিয়েছেন আল্লাহ পাকের এ সকল প্রিয় বান্দাদেরকে অপেক্ষার কষ্ট দেওয়ার জন্য আমি করজোড়ে ক্ষমাপ্রার্থী।

আমাদের সার্বিক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও কিছু অসঙ্গতি থেকে

যাওয়া বিচিত্র নয়। সহৃদয় পাঠক সমাজের নিকট আবেদন কারো দৃষ্টিতে কোন অসঙ্গতি ধরা পড়লে আমাদেরকে অবহিত করবেন। ইনশাআল্লাহ পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করে দিবো।

আজকের নব্য ফেরাউনদের আস্ফালন ও সন্ত্রাশ দমনের নামে সৃষ্ট মহা সন্ত্রাসে পৃথিবী যখন মুসলিম রক্তে রক্তাক্ত হচ্ছে, খান খান হয়ে ভেঙ্গে যাচ্ছে পৃথিবীর শান্ত পরিবেশ, হায়েনার অট্ট হাসিতে কেঁপে উঠছে শান্তিকামী মানুষের অন্তর, তখন এ পৃথিবীতে মনুষ্য বাসের উপযোগী পরিবেশ ফিরিয়ে আনার জন্য পবিত্র কুরআন থেকে জিহাদের সবক নেয়া যে কিরূপ অপরিহার্য ও জরুরী হয়ে পড়েছে সেটা সচেতন মুসলমান মাত্রই অনুধাবন করে থাকেন। আর জিহাদের এই ভুলে যাওয়া মহান সবক স্মরণ করিয়ে দেয়ার জন্যই আমাদের এ প্রয়াস।

এ কিতাবটি পাঠ করে যদি কারো মধ্যে "জিহাদী চেতনা" ফিরে আসে তাহলে আমরা আমাদের শ্রম স্বার্থক মনে করবো। আল্লাহ পাক আমাদেরকে জিহাদের ভুলে যাওয়া পাঠ পুণরায় আত্মস্থ করে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়ে বাতিলের মোকাবিলা করার তাওফীক দান করুন। আমীন। ইয়া রাব্বাল আলামীন।

নিবেদক
মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান খান
মাকতাবাতুল আশরাফ
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

তারিখ ৫ই জুমাদাল উখরা
১৪২৩ হিজরী

সূ চী প ত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	
জিহাদের ডাক	
১৭–৭৭	
ফিতনা হত্যার চেয়ে মারাত্মক	১৭
ফিতনা দূরীভূত হওয়া পর্যন্ত জিহাদ কর	১৯
আল্লাহর পথে ব্যয় কর	২০
জিহাদে অর্থ ব্যয়	২১
তোমাদের উপর জিহাদ ফরয করা হল	২২
আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী	২৪
নিয়তের অকৃত্রিমতার জন্য সওয়াব দানের প্রতিশ্রুতি	২৫
জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে বিস্ময়কর কাহিনী	২৬
তোমরাই বিজয়ী হবে	২৮
আল্লাহ দেখবেন কারা জিহাদ করল	৩০
আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালবাসেন	৩০
মোকাবেলায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর	৩১
নিজেদের অস্ত্র তুলে নাও	৩২
পার্থিব ফায়দা সীমিত	৩৩
একটি শিক্ষামূলক ঘটনা	৩৫
আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করতে থাকুন	৩৭
কুরআনী বিধানের বর্ণনা শৈলী	৩৮
আল্লাহর পথে জিহাদ কর	৩৮
আল্লাহর পথে জিহাদ করবে	৩৯
তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক	৪১
যেন তাদের উত্তরসূরীরা পালিয়ে যায়	৪৪
আল্লাহর শত্রুদের উপর যেন প্রভাব পড়ে	৪৫
মুসলমানগণকে জিহাদের জন্য উৎসাহিত করুন	৪৭
কুফর প্রধানদের সাথে যুদ্ধ কর	৫১
যিম্মীদের বিদ্রূপ অসহ্য	৫২

বিষয়	পৃষ্ঠা
করজোড়ে জিযিয়া প্রদান করা পর্যন্ত তোমরা যুদ্ধ কর	৫৫
মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ কর	৫৭
আল্লাহর পথে জান ও মাল দিয়ে জিহাদ কর	৫৮
কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন	৬৪
মুসলমানের জান-মাল আল্লাহ্ ক্রয় করে নিয়েছেন	৬৫
জিহাদের সর্বপ্রথম আয়াত	৬৬
কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও	৬৭
আল্লাহর সাহায্য লাভের শর্ত	৬৮
কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রথম আদেশ	৬৮
জিহাদের একটি হেকমত	৬৯
আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর	৭০
যে ব্যবসা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেয়	৭১
তাদের গর্দান মার	৭২
জিহাদ সিদ্ধ হওয়ার একটি হেকমত	৭৩
পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পাবে	৭৫
হুদায়বিয়ার সফর থেকে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের কেউ কেউ পরে তাওবা করে খাঁটি মুসলমান হয়ে গিয়েছিল	৭৬
কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ	৭৭

দ্বিতীয় অধ্যায়

জিহাদের ফযীলত বা মুজাহিদের মর্যাদা

৭৮–৯১

আল্লাহ্ মুজাহিদদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন	৭৮
জিহাদ সম্পর্কিত কতিপয় বিধান	৭৮
শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনে শৈথিল্য করো না	৭৯
তিনি তোমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন	৮০
যখন শত্রুর সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হও	৮১
যুদ্ধ-জিহাদে কৃতকার্যতা লাভের জন্য কুরআনের হেদায়েত	৮২
সত্যিকারের মুসলমান	৮৫
জান্নাতের সুসংবাদ	৮৭

বিষয়	পৃষ্ঠা
আল্লাহর পথের তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধা	৮৮
আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালবাসেন	৮৯
তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য কর!	৮৯
অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব	৯০
যারা আল্লাহর পথে খরচ করে ও জিহাদ করে	৯০
আল্লাহ ভালবাসেন যারা সারিবদ্ধভাবে জিহাদ করে	৯১
আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট	৯১

তৃতীয় অধ্যায়

যুদ্ধের নিয়মাবলী

৯৩–৯৯

হে ঈমানদারগণ! অস্ত্র তুলে নাও	৯৩
তোমরা যখন আল্লাহর পথে সফর কর	৯৩
যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের শাস্তি	৯৫
বন্দীদেরকে নিজের কাছে রাখা উচিত নয়	৯৮
আল্লাহ বিশ্বাস ভঙ্গকারীকে পছন্দ করেন না	৯৮
সন্ধি চুক্তি বাতিল করার উপায়	৯৮
আল্লাহর উপর ভরসা কর	৯৯

চতুর্থ অধ্যায়

যুদ্ধের সময় নামায

১০৩–১০৫

সফর ও কসরের বিধান	১০৪

পঞ্চম অধ্যায়

জিহাদ বিমুখতা এবং রণাঙ্গন থেকে ফেরার হওয়ার পরিণতি

১০৬–১১৯

সব কিছুই আল্লাহর হাতে	১০৬

বিষয়	পৃষ্ঠা
এসো আল্লাহ্‌র রাহে লড়াই কর	১০৯
বাহানা করো না	১১০
সে আল্লাহ্‌র গযব নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে	১১১
পলায়ন তোমাদের কাজে আসবে না	১১৩
তাদের জন্য জিহাদ মঙ্গলজনক হবে	১১৫
তারা আল্লাহ্‌র কোন ক্ষতি করতে পারবে না	১১৬
আল্লাহ্ কখনো তাদেরকে ক্ষমা করবেন না	১১৭
তারা সামান্য বোঝে	১১৮

ষষ্ঠ অধ্যায়

যুদ্ধক্ষেত্রে সতর্কতা ও গোপানীয়তার প্রয়োজনীয়তা

১২০–১২২

রটনা নিষিদ্ধ	১২০
আল্লাহ্‌র রীতিতে পরিবর্তন নেই	১২১
কোন সংবাদ আসলে তা পরীক্ষা কর	১২২

সপ্তম অধ্যায়

যুদ্ধের ফলাফল

১২৩–১৩৮

তালুত ও জালুতের কাহিনী	১২৪
মোকাবিলায় নিদর্শন রয়েছে	১২৬
আল্লাহ্‌র উপরই ভরসা করা উচিত	১২৭
গর্দানের উপর আঘাত হান	১২৭
সবই আল্লাহ্‌র নিকট পৌঁছে	১৩০
আল্লাহ্‌ই যথেষ্ট	১৩২
আল্লাহ্ আমাদের সাথে আছেন	১৩৩
আল্লাহ্ তাঁর রাসূল ও মুমিনদের প্রতি শান্ত্বনা নাযিল করেন	১৩৪
ঈমানদারদের রক্ষা করা আমার দায়িত্ব	১৩৫

বিষয়	পৃষ্ঠা
মুমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব	১৩৫
যুদ্ধক্ষেত্রে আল্লাহ মুমিনদের জন্য যথেষ্ট	১৩৭
আসমান ও যমীনের বাহিনীসমূহ আল্লাহরই	১৩৭

অষ্টম অধ্যায়

মালে গণীমত

১৩৯-১৫১

মহানবী (সাঃ)-এর ওফাতের পর এক পঞ্চমাংশের বন্টন	১৪৮
যাবিল-কুরবার পঞ্চমাংশ	১৪৮

নবম অধ্যায়

আল্লাহর রাস্তায় (ধর্মযুদ্ধে) শহীদ হওয়ার ফযীলত

১৫২-১৬০

শহীদদেরকে মৃত বলো না	১৫২
তারা জীবিত ও জীবিকা প্রাপ্ত	১৫৩
আল্লাহর রাহে শাহাদাত বরণকারীদের বিশেষ মর্যাদা	১৫৩
আল্লাহর নিকট রয়েছে উত্তম বিনিময়	১৫৬
হিজরত ও শাহাদাতের দ্বারা হক্কুল ইবাদ ব্যতীত অন্যান্য সব গোনাহ মাফ হয়ে যায়	১৫৬
তাদের জিহাদ করাই কর্তব্য	১৫৭
আল্লাহ শহীদদেরকে পছন্দনীয় জায়গায় পৌছাবেন	১৫৮
আল্লাহ শহীদদের কর্ম বিনষ্ট করবেন না	১৫৯

দশম অধ্যায়

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের জিহাদসমূহ

১৬১-২৫০

(ক) বদর যুদ্ধ	১৬১

বিষয়	পৃষ্ঠা
বদর যুদ্ধের বিবরণ	১৬৪
(খ) উহুদ যুদ্ধ	১৭৮
উহুদ যুদ্ধের পটভূমি	১৭৯
বিজাতীর দৃষ্টিতে মহানবী (সাঃ)-এর সামরিক প্রজ্ঞা	১৮১
উহুদ যুদ্ধের সূচনা	১৮২
উহুদের মহাপরীক্ষার তাৎপর্য	১৮৯
উহুদের ঘটনায় মুসলমানদের উপর বিপদ আসার কারণ	১৮৯
(গ) হামরাউল আসাদ যুদ্ধ	১৯০
হামরাউল আসাদ যুদ্ধের বিবরণ	১৯১
(ঘ) হুনাইন যুদ্ধ	১৯৪
(ঙ) তাবুক যুদ্ধ	২০৪
দুনিয়ার মোহ ও আখেরাতের প্রতি উদাসীনতা সকল অপরাধের মূল	২১১
(চ) খন্দক বা আহযাব যুদ্ধ	২১৬
খন্দক বা আহযাব যুদ্ধের বিবরণ	২২০
রাজনীতি ক্ষেত্রে মিথ্যার আশ্রয় নতুন ব্যাপার নয়	২২১
আল্লাহর ধৈর্য	২২২
মদীনার উপর বৃহত্তর আক্রমণ	২২২
মুসলমানগণের যুদ্ধ প্রস্তুতি	২২৩
পরিখা খনন	২২৩
(ছ) হুদায়বিয়ার সন্ধি ও বায়আতে রিদওয়ান	২২৪
হুদায়বিয়ার ঘটনা	২৩০
প্রথম অংশ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর স্বপ্ন	২৩০
দ্বিতীয় অংশঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কেরাম ও মরুবাসী মুসলমানদের সাথে চলার জন্য ডাকা এবং কারও অস্বীকার করা	২৩১
তৃতীয় অংশ ঃ মক্কাভিমুখে যাত্রা	২৩২
চতুর্থ অংশ ঃ মক্কাবাসীদের মোকাবিলায় প্রস্তুতি	২৩২
সংবাদ পৌঁছানোর একটি অভাবনীয় সরল পদ্ধতি	২৩৩
রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংবাদ প্রেরক	২৩৩

বিষয়	পৃষ্ঠা
পঞ্চম অংশঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উষ্ট্রীর পথিমধ্যে বসে যাওয়া	২৩৪
ষষ্ঠ অংশ ঃ হুদায়বিয়ায় একটি মুজেযা	২৩৫
সপ্তম অংশ ঃ প্রতিনিধিদের মধ্যস্থতায় মক্কাবাসীদের সাথে আলাপ-আলোচনা	২৩৬
অষ্টম অংশঃ হযরত উসমান (রাযিঃ)কে পয়গামসহ প্রেরণ	২৩৮
নবম অংশ ঃ মক্কাবাসী ও মুসলমানদের মধ্যে সংঘর্ষ এবং মক্কাবাসীদের সত্তর জনের গ্রেফতারী	২৩৯
দশম অংশ ঃ বায়আতে রিদওয়ানের ঘটনা	২৪০
একাদশ অংশ ঃ হুদায়বিয়ার ঘটনা	২৪০
(জ) বনী নযীরের যুদ্ধ	২৪৪
বনু নযীর গোত্রের ইতিহাস	২৪৫
একটি শিক্ষা	২৪৭
ইসলাম ও মুসলমানদের উদারতা বর্তমান রাজনীতিকদের জন্য একটি শিক্ষাপ্রদ ব্যাপার	২৪৮
(ঝ) মক্কা বিজয়	২৪৯

একাদশ অধ্যায়

ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত পাহারা দেয়া

২৫১-২৫৩

রেবাত বা ইসলামী সীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা	২৫১

দ্বাদশ অধ্যায়

প্রতিশোধ গ্রহণ

২৫৪-২৫৫

দাওয়াতদাতাকে কেউ কষ্ট দিলে প্রতিশোধ গ্রহণ করা জায়েয; কিন্তু সবর করা উত্তম	২৫৪

বিষয়	পৃষ্ঠা

ত্রয়োদশ অধ্যায়
জিহাদের উপকরণ বা আসবাবপত্র
২৫৬-২৬১

(ক) লৌহ	২৫৬
(খ) ঘোড়া	২৫৭
নিজের সামর্থের মধ্যে থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ কর	২৫৮
জিহাদের জন্য যুদ্ধোপকরণ ও অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করা ফরয	২৫৮
তোমাদের আরোহনের জন্য	২৬০
শয়তানের বাহিনী	২৬০
তোমরা ঘোড়ায় কিংবা উটে চড়ে যুদ্ধ করনি	২৬১

চতুর্দশ অধ্যায়
আল্লাহর জন্য হিজরত
২৬২-২৭৯

হিজরতের আবশ্যকতা	২৬২
হিজরতের বিভিন্ন প্রকার ও বিধান	২৬২
হিজরতের সংজ্ঞা	২৬৪
হিজরতের ফযীলত	২৬৭
হিজরত ও শাহাদাতের দ্বারা হক্কুল এবাদ ব্যতীত অন্যান্য সব গোনাহ মাফ হয়ে যায়	২৬৮
হিজরত দুনিয়াতেও সচ্ছল জীবিকার কারণ হয় কি?	২৭৩
মুজাহিদদের শ্রেষ্ঠত্ব	২৭৬
মুসলমানদের ধন-সম্পদের উপর কাফেরদের দখল সম্পর্কিত বিধান	২৭৭
মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরত	২৭৮

##

প্রথম অধ্যায়
জিহাদের ডাক

ফিতনা হত্যার চেয়ে মারাত্মক

وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللّٰهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا ط إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ (١٩٠) وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ج وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتّٰى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ ج فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ ط كَذٰلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ (البقرة: ١٩٠-١٩١)

তরজমাঃ (১৯০) যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তোমরা ও আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর; কিন্তু সীমা লংঘন করো না। আল্লাহ সীমালংঘন- কারীগণকে ভালবাসেন না। (১৯১) যেখানে তাদেরকে পাবে হত্যা করবে এবং যে স্থান থেকে তারা তোমাদিগকে বহিষ্কৃত করেছে তোমরাও সেই স্থান থেকে তাদেরকে বহিষ্কার করবে। ফিতনা হত্যা অপেক্ষা গুরুতর। মসজিদুল হারামের নিকট তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে না যে পর্যন্ত তারা সেখানে তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে। যদি তারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে, তবে তোমরা তাদেরকে হত্যা করবে, এটাই কাফিরদের পরিণাম। (বাকারাঃ ১৯০–১৯১)

তাফসীরঃ গোটা মুসলিম উম্মত এ ব্যাপারে একমত যে, মদীনায় হিজরতের পূর্বে কাফেরদের সঙ্গে 'জিহাদ' ও কিতাল (যুদ্ধ-বিগ্রহ) নিষিদ্ধ ছিল। সে সময়ে অবতীর্ণ কুরআন মাজীদের সব আয়াতেই কাফেরদের অন্যায়-অত্যাচার নীরবে সহ্য করে ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা, ক্ষমা ও উদারতা প্রদর্শনের শিক্ষা দেয়া হয়। রবী ইবনে আনাস প্রমুখ সাহাবায়ে কেরাম

(রাযিঃ)-এর উক্তি অনুসারে মদীনায় হিজরতের পর সর্বপ্রথম কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে উপরোক্ত আয়াতটি নাযিল হয়। তবে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)-এর এক বর্ণনা অনুযায়ী কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের নির্দেশ সম্পর্কিত এটিই প্রথম আয়াত। যথা–

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْا

কিন্তু অধিকাংশ সাহাবী (রাযিঃ) এবং তাবেয়ীন (রহঃ)-এর মতে এ প্রসঙ্গে সূরা বাকারার উপরোল্লেখিত আয়াতই প্রথম আয়াত। তবে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) যে আয়াতটিকে এ প্রসঙ্গে নাযিলকৃত প্রথম আয়াত বলে মত প্রকাশ করেছেন, সে আয়াতটিকেও এ প্রসঙ্গে প্রথম দিকে নাযিলকৃত আয়াতসমূহের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে প্রথম আয়াত বলা চলে।

এ আয়াতে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, মুসলমানগণ কেবলমাত্র সেসব কাফেরদের সঙ্গেই যুদ্ধ করবে, যারা তাদের বিপক্ষে সম্মুখ-সমরে উপস্থিত হবে। এর অর্থ এই যে, নারী, শিশু, বৃদ্ধ, ধর্মীয় কাজে সংসার ত্যাগী উপাসনারত সন্নাসী-পাদ্রী, প্রভৃতি এবং তেমনিভাবে অন্ধ, খঞ্জ, পঙ্গু, অসমর্থ অথবা যারা কাফেরদের অধীনে মেহনত মজদুরী করে। কিন্তু তাদের সঙ্গে যুদ্ধে শরীক না হয়– সেসব লোককে যুদ্ধে হত্যা করা জায়েজ নয়। কেননা, আয়াতের নির্দেশে কেবলমাত্র তাদের সঙ্গেই যুদ্ধ করার হুকুম রয়েছে। যারা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে। কিন্তু উল্লেখিত শ্রেণীর লোকদের কেউই যুদ্ধে যোগদানকারী নয়। এজন্য ফেকাহশাস্ত্রবিদ ইমামগণ বলেন, যদি কোন নারী, বৃদ্ধ অথবা ধর্ম প্রচারক বা ধর্মীয় মিশনারীর লোক কাফেরদের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে অথবা কোন প্রকার যুদ্ধে তাদের সাহায্য করতে থাকে, তবে তাদেরকেও হত্যা করা জায়েয। কারণ, তারা اَلَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَكُمْ 'যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে' এই আয়াতের আওতাভুক্ত।

(মাযহারী, কুরতুবী, জাস্সাস্, মাআরেফুল কুরআন– ১/৫৫৭)

পুরো মক্কী যিন্দেগীতে মুসলমানদেরকে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার ব্যাপারে বাধা দান করা হয়েছিল এবং সর্বদা ক্ষমা ও উদারতার শিক্ষা প্রদান করা হয়েছিল। কাজেই উল্লেখিত আয়াত নাযিল হওয়ার পর সাহাবীগণের

ধারণা হয়েছিল যে, হয়তো কোন কোন ক্ষেত্রে কাফেরদিগকে হত্যা করা নিষিদ্ধ ও দোষনীয় হয়ে থাকবে। এ ধারণার অপনোদন কল্পে ইরশাদ হলো–

وَالْفِتْنَةُ اَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ

(এবং ফেতনা বা দাঙ্গা-হাঙ্গামা সৃষ্টি করা হত্যা অপেক্ষাও কঠিন অপরাধ।)

অর্থাৎ, একথা তো অবশ্যই সত্য ও সর্বজন বিদিত যে, নর হত্যা নিকৃষ্ট কর্ম। কিন্তু মক্কার কাফেরদের কুফুরী ও শিরকের উপর অটল থাকা এবং মুসলমানদিগকে ওমরাহ ও হজ্জের মত ইবাদতের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করা অতি গুরুতর ও কঠিন অপরাধ। এরূপ প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করার কারণেই তাদেরকে হত্যা করার অনুমতি প্রদান করা হলো। আলোচ্য আয়াতে উল্লেখিত فِتْنَةٌ (ফিতনাহ) শব্দটির দ্বারা কুফর, শিরক এবং মুসলমানদের ইবাদতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করাকেই বুঝানো হয়েছে।

(জাস্‌সাস্‌, কুরতুবী ও মাআরেফুল কুরআন– ১/৫৫৯)

ফিতনা দূরীভূত হওয়া পর্যন্ত জিহাদ কর

ইরশাদ হয়েছে–

فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (١٩٢) وَقٰتِلُوْهُمْ حَتّٰى لَاتَكُوْنَ فِتْنَةٌ وَّيَكُوْنَ الدِّيْنُ لِلّٰهِ ط فَاِنِ انْتَهَوْا فَلَا عُدْوَانَ اِلَّا عَلَى الظّٰلِمِيْنَ

(البقرة: ١٩٢-١٩٣)

তরজমাঃ আর তারা যদি বিরত থাকে, তাহলে আল্লাহ অত্যন্ত ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে থাক, যে পর্যন্ত ফিতনা দূরীভূত না হয় এবং আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠিত না হয়। যদি তারা বিরত হয়, তবে জালিমদিগকে ব্যতীত আর কাউকেও আক্রমণ করা চলবে না।

(বাকারাঃ ১৯২–১৯৩)

তাফসীরঃ যুদ্ধ শুরু করার পরও যদি মক্কার কাফের-মুশরিকরা নিজেদের কুফরী থেকে বিরত হয়ে যায় এবং ইসলাম গ্রহণ করে নেয়, তবে তাদের

এই ইসলাম গ্রহণকে অমর্যাদার চোখে দেখা যাবে না। বরং আল্লাহ্ তাদের অতীত কুফরীর অপরাধ ক্ষমা করে দিবেন এবং ক্ষমা ছাড়াও অশেষ নি'আমত প্রদান করে তাদের প্রতি অনুগ্রহও করবেন। আর যদি তারা ইসলাম গ্রহণ না করে, তবে যদিও অপরাপর কাফেরদের ক্ষেত্রে ইসলামী আইন এই যে, তারা স্বধর্মে থাকা সত্ত্বেও যদি ইসলামী রাষ্ট্রের আনুগত্য স্বীকার করে এবং জিযিয়া (যুদ্ধ কর) প্রদানে অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়, তবে তাদের হত্যা করা জায়েয নয়, বরং তাদের অধিকার সংরক্ষণ করা ইসলামী রাষ্ট্রের উপর অপরিহার্য হয়ে পড়ে। কিন্তু এ বিশেষ ধরনের কাফেররা যেহেতু আরবের অধিবাসী, সেহেতু তাদের জন্য জিযিয়া প্রদানের কোন আইন নেই। বরং তাদের জন্য কেবল মাত্র দু'টি পথই বিদ্যমান। (ক) ইসলাম গ্রহণ করা অথবা (খ) হত্যা। সুতরাং হে মুসলমানগণ! তোমরা তাদের সঙ্গে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ কর, যতক্ষণ না বিশ্বাসের বিভ্রান্তি অর্থাৎ, শিরক তাদের মধ্য থেকে তিরোহিত হয়ে যায়। আর তাদের দ্বীন একান্তভাবেই আল্লাহ্‌র হয়ে যায়। কারণ, কারও দ্বীন ও ধর্মমত বা জীবন বিধান একান্তভাবে আল্লাহ্‌র জন্যে হয়ে যাওয়ার অর্থই ইসলাম গ্রহণ করা। আর যদি তারা কুফরী থেকে ফিরে যায়, তবে তারা পরকালে ক্ষমা ও রহমতের অধিকারী তো হবেই তৎসঙ্গে পৃথিবীতে তাদের ব্যাপারে তোমাদেরকে এই আইন বলে দেয়া হচ্ছে যে, যারা অন্যায়ভাবে আল্লাহ্‌র দান ভুলে কুফরী ও শিরক করতে থাকে, তারা ব্যতীত তাদের কেউ শাস্তি ও দূরাবস্থার কবলে নিপতিত হবে না এবং এ সমস্ত লোক যখন ইসলাম গ্রহণ করলো, তখন আর তাদের অন্যায় থাকলো না। অতএব তার উপর আর মৃত্যুদণ্ডের শাস্তি বর্তাবে না।

(মাআরেফুল কুরআন-১/৫৬১)

আল্লাহ্‌র পথে ব্যয় কর

ইরশাদ হয়েছে-

وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ صلے
وَاَحْسِنُوْا ج اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ (البقرة ١٩٥)

তরজমাঃ আল্লাহর পথে ব্যয় কর এবং তোমরা নিজের হাতে নিজদিগকে ধ্বংসের মধ্যে নিক্ষেপ করো না এবং তোমরা সৎকাজ কর, আল্লাহ সৎপরায়ণ লোককে ভালবাসেন। (বাকারাঃ ১৯৫)

জিহাদে অর্থ ব্যয়

তাফসীরঃ وَاَنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ (এবং তোমরা আল্লাহর পথে খরচ কর)। এই আয়াতে স্বীয় অর্থ-সম্পদ থেকে প্রয়োজন মত ব্যয় করা মুসলমানদের প্রতি ফরয করা হয়েছে। এই আয়াত থেকে ফিকাহ শাস্ত্রবিদ আলেমগণ এই সিদ্ধান্তে উপণীত হয়েছেন যে, মুসলমানদের উপর ফরয যাকাত ব্যতীত আরও এমন কিছু দায়-দায়িত্ব ও খরচের খাত রয়েছে, যেগুলো ফরজ। কিন্তু সেগুলো স্থায়ী কোন খাত নয় বা সেগুলোর জন্যে কোন নির্ধারিত নেসাব বা পরিমাণ নেই। বরং যখন যতটুকু প্রয়োজন, তখন ততটুকু খরচ করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরজ। আর যদি প্রয়োজন না হয়, তবে কিছুই খরচ করা ফরজ নয়। জেহাদে অর্থ ব্যয়ও এই পর্যায়ভুক্ত।

وَلَا تُلْقُوْا بِاَيْدِيْكُمْ اِلَى التَّهْلُكَةِ

(এবং স্বহস্তে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দিওনা)

আয়াতাংশের শাব্দিক অর্থ অত্যন্ত দ্ব্যর্থহীন ও স্পষ্ট। এতে স্বেচ্ছায় নিজেকে ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করতে বারণ করা হয়েছে। এখন কথা হলো যে, 'ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করা' বলতে এক্ষেত্রে কি বুঝানো হয়েছে। এ প্রসঙ্গে কুরআন মাজীদের ব্যাখ্যাদাতাগণের অভিমত বিভিন্ন প্রকার।

ইমাম জাস্সাস ও ইমাম রাযী (রহঃ) বলেছেন, এ আয়াতের ব্যাখ্যায় বর্ণিত বিভিন্ন উক্তির মাঝে কোন বিরোধ নেই। প্রত্যেকটি উক্তিই গৃহীত হতে পারে। হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ) বলেন, এই আয়াত আমাদের সম্পর্কেই নাযিল করা হয়েছে। আমরা এর ব্যাখ্যা উত্তম রূপেই জানি। কথা হলো এই যে, আল্লাহ তাআলা ইসলামকে যখন বিজয়ী ও সুপ্রতিষ্ঠিত করলেন, তখন আমাদের মধ্যে আলোচনা হলো যে, এখন আর জিহাদের কি প্রয়োজন? এখন আমরা আপন-আপন গৃহে অবস্থান করে বিষয়-সম্পত্তির দেখাশুনা করি। এ প্রসঙ্গেই আয়াতটি নাযিল হলো। যাতে

স্পষ্ট বুঝা যাচ্ছে যে, ধ্বংসের দ্বারা এখানে জিহাদ পরিত্যাগ করাকেই বুঝানো হয়েছে। এর দ্বারা প্রমাণিত হচ্ছে জিহাদ পরিত্যাগ করা মুসলমানদের জন্য ধ্বংসের কারণ। সে জন্যই হযরত আবু আইয়ূব আনসারী (রাযিঃ) সারা জীবনই জিহাদ করে গেছেন। শেষ পর্যন্ত ইস্তাম্বুলে শহীদ হয়ে সেখানেই সমাহিত হয়েছেন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ), হুযাইফা (রাযিঃ), কাতাদাহ (রহঃ) এবং মুজাহিদ ওযাহ্হাকা (রহঃ) প্রমূখ তাফসীর শাস্ত্রের ইমামগণ থেকেও এরূপই বর্ণিত হয়েছে।

হযরত বারা ইবনে আযিব (রাযিঃ) বলেছেন– পাপের কারণে আল্লাহর রহমত ও মাগফেরাত থেকে নিরাশ হওয়াও নিজ হাতে নিজেকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেয়ার নামান্তর।

তোমাদের উপর জিহাদ ফরয করা হল

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَّهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَعَسٰى اَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَّهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ وَاَنْتُمْ لَاتَعْلَمُوْنَ (البقرة: ٢١٦)

তরজমাঃ তোমাদের উপর যুদ্ধ ফরজ করা হয়েছে, অথচ তা তোমাদের কাছে অপছন্দনীয়। তোমাদের কাছে হয়তো কোন একটি বিষয় পছন্দনীয় নয়, অথচ তা তোমাদের জন্যে কল্যাণকর। আর হয়তো বা কোন একটি বিষয় তোমাদের কাছে পছন্দনীয় অথচ তা তোমাদের জন্যে অকল্যাণকর। বস্তুত: আল্লাহ জানেন, তোমরা জাননা। (সূরা বাকারা, আয়াতঃ ২১৬)

তাফসীরঃ উল্লেখিত আয়াতে জিহাদ ফরয হওয়ার আদেশ নিম্নলিখিত শব্দগুলোর দ্বারা বর্ণনা করা হয়েছে– كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ 'তোমাদের উপর জিহাদ ফরয করা হলো।' এ শব্দগুলোর দ্বারা পরিষ্কারভাবে বুঝা যাচ্ছে যে, প্রত্যেক মুসলমানের উপর সব সময়ই জিহাদ করা ফরয। তবে কুরআনের কোন কোন আয়াত ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের

হাদীসের বর্ণনাতে বুঝা যায় যে, জিহাদের এ ফরয, ফরযে আইনরূপে প্রত্যেক মুসলমানের উপর সাব্যস্ত হয় না। বরং এটা ফরযে কিফায়াহ। যদি মুসলমানদের কোন দল তা আদায় করে এবং শত্রুর মোকাবেলায় তাঁরা যথেষ্ট হয়, তাহলে সমস্ত মুসলমানই এ দায়িত্ব থেকে রেহাই পাবে। তবে যদি কোন দেশে বা কোন যুগে কোন দলই জিহাদের ফরয আদায় না করে, তবে ঐ দেশের বা ঐ যুগের সমস্ত মুসলমানই ফরয থেকে বিমুখতার দায়ে পাপী হবে।

রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

الجهاد ماضى الى يوم القيامة

এর মর্ম হচ্ছে এই যে, কিয়ামত পর্যন্ত এমন একটি দল থাকা আবশ্যক, যারা জিহাদের দায়িত্ব পালন করবে।

স্বাভাবিক অবস্থায় সাধারণভাবে জিহাদ ফরযে কিফায়াহ হলেও মুসলমানদের নেতা যদি প্রয়োজনে সবাইকে জিহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য আহবান করেন, তখন জিহাদ ফরজে আইন হয়ে যায়।

এ প্রসঙ্গে কুরআনে-হাকীমের সূরা তাওবায় ইরশাদ হয়েছেঃ

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَا لَكُمْ اِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اثَّاقَلْتُمْ

অর্থাৎ, 'হে মুসলমানগণ! তোমাদের কি হয়েছে যে, যখন তোমাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা আল্লাহর পথে (জিহাদের জন্য) বের হও, তখনই তোমরা মনমরা হয়ে পড়।'

এ আয়াতে আল্লাহর রাস্তায় বের হওয়ার সার্বজনীন আদেশ দেয়া হয়েছে। এমনিভাবে আল্লাহ না করুন, যদি কোন ইসলামী দেশ অমুসলমান দ্বারা আক্রান্ত হয় এবং সে দেশের লোকের পক্ষে এ আক্রমণ প্রতিহত করা সম্ভব না হয়, তবে পার্শ্ববর্তী মুসলিম দেশবাসীর উপরেও সে ফরয আপতিত হয়। তারাও যদি প্রতিহত করতে না পারে, তবে এর নিকটবর্তী মুসলিম দেশের উপর, এমনিভাবে সারা বিশ্বের প্রতি মুসলমানের উপর এ ফরজ পরিব্যাপ্ত হয় এবং জিহাদ ফরযে আইন হয়ে যায়। আর যখন জিহাদ প্রয়োজনের তাকীদে ফরযে আইনে পরিণত হয়, তখন পিতা-মাতা, স্বামী-স্ত্রী অথবা ঋনদাতা কারোই অনুমতির অপেক্ষা রাখে না।

আলোচ্য আয়াতের শেষে জিহাদের প্রতি উৎসাহ দানের জন্য ইরশাদ হয়েছে যে, 'যদিও জিহাদ স্বাভাবিকভাবে বোঝা মনে হয়, কিন্তু স্মরণ রেখো, মানুষের বিচক্ষণতা, বুদ্ধি-বিবেচনা ও চেষ্টা পরিণামে অনেক সময় অকৃতকার্য হয়। ভালকে মন্দ এবং মন্দকে ভাল মনে করা বিজ্ঞ ও বড় বুদ্ধিমানের পক্ষেও আশ্চর্যের কিছু নয়। প্রতিটি মানুষই তার জীবনের যাবতীয় ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করলে বুঝতে পারবে যে, তার জীবনেই অনেক ঘটনা রয়েছে, যাতে সে কোন কাজকে অত্যন্ত লাভজনক ও উপকারী মনে করেছিল, কিন্তু পরিণামে তা অত্যন্ত অনিষ্ঠকর হয়েছে। অথবা কোন বস্তুকে অত্যন্ত ক্ষতিকর মনে করেছিল এবং তা থেকে দূরে সরে ছিল, কিন্তু পরিণামে দেখা গেল, তা অত্যন্ত লাভজনক ও উপকারী ছিল। মানুষের চেষ্টা ও বুদ্ধির অশুভ পরিণাম অনেক ব্যাপারেই ধরা পড়ে। তাই বলা হয়েছে-

خویش را دیدم در رسوائ خویش

'অনেক সময় নিজেকে আত্ম-অবমাননায় নিয়োজিত দেখেছি।'

কাজেই বলা হয়েছে, জিহাদ ও ধর্মযুদ্ধে যদিও আপাতঃদৃষ্টিতে জান ও মালের ক্ষতির আশংকা মনে হয়, কিন্তু যখন পরিণাম সামনে আসবে, তখন বুঝা যাবে যে, এ ক্ষতি বাস্তবে মোটেও ক্ষতি ছিল না; বরং সোজাসুজি লাভ-উপকার এর চিরস্থায়ী শান্তির ব্যবস্থা ছিল। (মাআরেফুল কুরআন-১/৬২০)

আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী

ইরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اُولٰۤئِكَ يَرْجُوْنَ رَحْمَةَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (البقرة: ٢١٨)

অর্থঃ আর এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে আর আল্লাহর পথে জিহাদ করেছে, তারা আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী। আর আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাকারী, করুণাময়।

(বাকারাঃ ২১৮)

নিয়তের অকৃত্রিমতার জন্য সওয়াব দানের প্রতিশ্রুতি

তাফসীর ঃ প্রকৃতপক্ষে যারা ঈমান এনেছে এবং যারা আল্লাহর রাস্তায় দেশ ত্যাগ করেছে এবং জিহাদ করেছে, তারা তো আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ পাওয়ার আশা রাখে। (তোমাদের মধ্যেও তো এ আশা রয়েছে। ঈমান এবং হিজরতের সওয়াব তো সুনির্দিষ্ট, তবে এই বিশেষ জিহাদের বেলায় সন্দেহ হতে পারে। সুতরাং তোমাদের নিয়ত যেহেতু জিহাদেরই ছিল, তাই আমার নিকট তাও জিহাদের মধ্যেই শামিল। তাহলে এই বৈশিষ্ট্য থাকা সত্ত্বেও তোমাদের নৈরাশ্য কেন?) আর আল্লাহ তাআলা (এ ভুল) ক্ষমা করবেন এবং (ঈমান, জিহাদ ও হিজরতের দরুণ তোমাদের উপর) রহমত করবেন।

পরিতাপের বিষয় যে, সর্বযুগেই এমন কিছু মানুষ থাকে যারা মৃত্যুর ভয়ে নিজে জিহাদ করে না। অধিকন্তু অন্যদেরকেও তা থেকে বিরত রাখে। আল্লাহ তাআলা এ সকল ব্যক্তি সম্পর্কে জানিয়ে দিয়েছেন যে,

اَلَّذِيْنَ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوْا لَوْ اَطَاعُوْنَا مَاقُتِلُوْا - قُلْ فَادْرَؤُوْا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِيْنَ (ال عمران ١٦٨)

অর্থাৎ, যারা জিহাদে অংশগ্রহণ করেনি বরং উপরন্তু জিহাদের ময়দানে শাহাদাত বরণকারীদের সম্পর্কে মানুষের নিকট বলাবলি করে যে, তারা যদি আমাদের কথা শুনতো, তবে নিহত হতো না। (হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদেশ দেয়া হলো) আপনি তাদেরকে বলে দিন যে, যদি মৃত্যু থেকে রেহাই পাওয়া তোমাদের ক্ষমতাধীন হয়ে থাকে, তাহলে বরং নিজের জন্য চিন্তা এবং নিজেকে মৃত্যু থেকে রক্ষা কর। অর্থাৎ, মৃত্যু জিহাদে যাওয়া না যাওয়ার উপর নির্ভরশীল নয়, ঘরে থাকলেও শেষ পর্যন্ত তোমাদের মৃত্যু আসবেই। (মাআরেফুল কুরআন–১/৭১৫)

ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা, আল্লাহর পথে জীবন উৎসর্গকারীদের প্রতি হেদায়াত করেছেন। যাতে এ বিষয়টি পরিষ্কার হয়ে যায় যে, হায়াত-মউত বা জীবন-মরণ একান্তভাবেই আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত। যুদ্ধ বা জিহাদে অংশ নেয়াই মৃত্যুর কারণ নয়। তেমনি ভীরুতার সাথে আত্মগোপন করা মৃত্যু থেকে অব্যাহতি লাভের উপায় নয়।

জীবন ও মৃত্যু সম্পর্কে বিস্ময়কর কাহিনী

কুরআনে হাকীমে এ বিষয়টি এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে–

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ أُلُوفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ ص
فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُوا ثُمَّ أَحْيَاهُمْ ط إِنَّ اللَّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ
وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ (٢٤٣) وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (٢٤٤) (البقرة: ٢٤٣ - ٢٤٤)

অর্থঃ (২৪৩) তুমি কি তাদেরকে দেখনি, যারা মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছিল? অথচ তারা ছিল হাজার হাজার। তারপর আল্লাহ তাদেরকে বললেন মরে যাও। তারপর তাদেরকে জীবত করে দিলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের উপর অনুগ্রহকারী। কিন্তু অধিকাংশ লোক শোকর প্রকাশ করে না। (২৪৪) আল্লাহর পথে লড়াই কর এবং জেনে রাখ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছু জানেন, সবকিছু শুনেন। (বাকারাঃ ২৪৩–২৪৪)

তাফসীরে ইবনে কাসীরে কয়েক জন বিশিষ্ট সাহাবীর উদ্ধৃতি সহ এর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে উল্লেখিত ঐতিহাসিক ঘটনা সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, কোন এক শহরে বনী ইসরাঈল সম্প্রদায়ের কিছু লোক বাস করতো, তাদের সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। সেখানে এক মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধির প্রাদুর্ভাব দেখা দিল। তারা ভীত হয়ে সে শহর ত্যাগ করে দুটি পাহাড়ের মধ্যবর্তী একটি প্রশস্ত ময়দানে গিয়ে বসবাস করতে লাগল। আল্লাহ তাআলা তাদেরকে এবং দুনিয়ার অন্যান্য জাতিকে একথা অবগত করার জন্য যে, মৃত্যুর ভয়ে পালিয়ে গিয়ে কেউ রক্ষা পেতে পারে না; তাদের কাছে দু'জন ফেরেশতা পাঠালেন। ফেরেশতা দু'জন সে ময়দানের দু' ধারে দাঁড়িয়ে এমন এক বিকট শব্দ করলেন যে, তাদের সবাই এক সঙ্গে মরে গেলো। একটি লোকও জীবিত রইল না; পার্শ্ববর্তী লোকেরা যখন এ সংবাদ জানতে পারলো তখন সেখানে গিয়ে দশ হাজার মানুষের দাফন-কাফন করার ব্যবস্থা করা যেহেতু খুব সহজ ব্যাপার ছিল না; তাই তাদের চারদিকে দেয়াল দিয়ে একটি বন্ধ কুপের মত করে দিল। স্বাভাবিকভাবেই তাদের মৃতদেহগুলো পঁচে গলে গেল এবং

হাড়-গোড় তেমনই পড়ে রইল। দীর্ঘকাল পর বনী ইসরাঈলের হিযকীল (আঃ) নামক একজন নবী সেখান দিয়ে যাওয়ার পথে সেই বন্ধ জায়গায় বিক্ষিপ্তাবস্থায় হাড়গোড় পড়ে থাকতে দেখে বিস্মিত হলেন। তখন ওহীর মাধ্যমে তাকে এ লোকদের সমস্ত ঘটনা অবগত করানো হলো। তিনি দোয়া করলেন, হে পরওয়ারদেগার! তাদের সবাইকে পূনর্জীবিত করে দাও। আল্লাহ তাঁর দু'আ কবুল করলেন এবং বিক্ষিপ্ত সেই হাড়গোড়গুলোকে আদেশ দিলেনঃ

اَيَّتُهَا الْعِظَامُ الْبَالِيَةُ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكَ اَنْ تَجْتَمِعِى

অর্থাৎ, ওহে পুরাতন হাড়সমূহ! আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে নিজ নিজ স্থানে একত্রিত হতে আদেশ করেছেন। আল্লাহর নবীর যবানীতে এসব হাড় আল্লাহর আদেশ শ্রবণ করলো এবং প্রত্যেকটি হাড় নিজ নিজ স্থানে পুনঃ স্থাপিত হলো। অত:পর সে নবীর প্রতি আদেশ হলো সেগুলোকে বলঃ

اَيَّتُهَا الْعِظَامُ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكَ اَنْ تَكْتَسِى لَحْمًا وَّعَصَبًا وَجِلْدًا

অর্থাৎ, ওহে হাড়সমূহ! আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা মাংস পরিধান কর এবং রগ চামড়া দ্বারা সজ্জিত হও।

এ কথার সাথে সাথে হাড়ের প্রতিটি কঙ্কাল একেকটি পরিপূর্ণ লাশ হয়ে গেল।

অত:পর রূহকে আদেশ দেওয়া হলোঃ

اَيَّتُهَا الْاَرْوَاحُ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكَ اَنْ تَرْجِعَ كُلَّ رُوْحٍ اِلَى الْجَسَدِ الَّذِىْ كَانَتْ تَعْمُرُهٗ

অর্থাৎ, ওহে আত্মাসমূহ! আল্লাহ তাআলা তোমাদিগকে যার যার শরীরে ফিরে আসতে নির্দেশ দিচ্ছেন। এ শব্দ উচ্চারিত হতে সে নবীর সামনে সমস্ত লাশ জীবিত হয়ে দাঁড়াল এবং আশ্চর্যান্বিত হয়ে চারিদিকে তাকাতে আরম্ভ করলো। আর সবাই বলতে লাগলো– سُبْحَانَكَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি হে আল্লাহ! তুমি ছাড়া আর কোন মা'বুদ নেই।

এ ঘটনাটি দুনিয়ার সমস্ত চিন্তাশিল বুদ্ধিজীবীর সামনে সৃষ্টি বলয়

সম্পর্কিত চিন্তা-ভাবনার ক্ষেত্রে এক নতুন দিগন্তের সন্ধান দেয়। তদুপরি এটা কেয়ামত ও পুনরুত্থান অস্বীকারকারীদের জন্য একটি অকাট্য প্রমাণ হওয়ার সাথে সাথে এ বাস্তব সত্য উপলব্ধি করার পক্ষেও বিশেষ সহায়ক হয় যে, মৃত্যুর ভয়ে পালিয়ে থাকা তা জিহাদ হোক কিংবা প্লেগ মহামারীই হোক আল্লাহ্ এবং তাঁর নির্ধারিত তাকদীরের প্রতি যারা বিশ্বাসী তাদের পক্ষে সমীচীন নয়।

যার এ বিশ্বাস রয়েছে যে, মৃত্যুর একটি নির্ধারিত সময় রয়েছে, নির্ধারিত সময়ের এক মুহূর্ত পূর্বেও তা হবে না এবং এক মুহূর্ত পরেও তা আসবে না, তাদের পক্ষে এরূপ পলায়ন অর্থহীন এবং আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারণ।

(মাআরেফুল কুরআন−১/৭১০)

বনী ইসরাঈলের এ ঘটনাটি ভূমিকা স্বরূপ বর্ণিত হয়েছে। পূর্ববর্তী আয়াতে জিহাদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এ ঘটনা বর্ণনা করার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে, তোমরা জিহাদে যাওয়াকে মৃত্যু এবং পলায়নকে মৃত্যু থেকে রেহাই পাওয়ার পন্থা মনে করো না; বরং আল্লাহর আদেশ পালন করে উভয় জাহানের নেকী হাসিল কর। আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের যাবতীয় বিষয়ই জানেন।

তোমরাই বিজয়ী হবে

জিহাদের গুরুত্ব বর্ণনা প্রসঙ্গে কুরআনে কারীমের অন্যত্র ইরশাদ হয়েছেঃ

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

তরজমাঃ আর তোমরা হীনবল হয়ো না এবং দুঃখ করো না। যদি তোমরা মুমিন হও, তবে তোমরাই বিজয়ী হবে। (আলে-ইমরান ঃ ১৩৯)

তাফসীরঃ উহুদ যুদ্ধের ঘটনা প্রসঙ্গে উক্ত আয়াতটি নাযিল হয়েছে। উহুদ যুদ্ধ সম্পর্কে জানা গেছে যে, কতিপয় ত্রুটি-বিচ্যুতির কারণে এ যুদ্ধে প্রথম পর্যায়ে জয়লাভ করার পর অবশেষে মুসলমানরা পরাজয় বরণ করে। সত্তর জন সাহাবী শহীদ হন। স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহত হন। কিন্তু এ সবের পর আল্লাহ তাআলা যুদ্ধের মোড় ঘুরিয়ে দেন এবং শত্রুরা পিছু হটে যায়। এ সাময়িক বিপর্যয়ের কারণ ছিল তিনটি। (১)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তীরান্দাজ বাহিনীর প্রতি যে নির্দেশ জারি করেছিলেন, পারস্পরিক মতভেদের কারণে তা শেষ পর্যন্ত প্রতিপালিত হয়নি। কেউ বললো, আমাদের এখানেই অটল থাকা দরকার। অধিকাংশের মত ছিল, এখন এ জায়গায় অবস্থান করার কোন প্রয়োজন নেই। সবার সাথে মিলিত হয়ে শত্রুদের পরিত্যক্ত সামগ্রী আহরণ করা উচিত। (২) খোদ নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিহত হওয়ার সংবাদ ছড়িয়ে পড়লে মুসলমানদের মনে নৈরাশ্যের সৃষ্টি হয়। ফলে সবাই ভীত ও হতোদ্যম হয়ে পড়ে। (৩) মদীনা শহরে অবস্থান গ্রহণ করে শত্রুদের মোকাবিলা করার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আদেশ পালনে যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল, সেটিই ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। মুসলমানদের এ তিনটি বিচ্যুতির কারণেই তারা সাময়িক বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল। এ সাময়িক পরাজয় অবশেষে বিজয়ের রূপ ধারণ করেছিল সত্য; কিন্তু মুসলিম যোদ্ধারা আঘাতে জর্জরিত ছিলেন। মুসলিম বীরদের মৃত দেহ ছিল চোখের সামনে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকেও হতভাগারা আহত করে দিয়েছিল। সর্বত্র ঘোর বিপদ ও নৈরাশ্য ছায়া বিস্তার করেছিল। মুসলিম মুজাহিদগণ স্বীয় ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্যেও বেদনায় মুষড়ে পড়েছিল। সার্বিক পরিস্থিতিতে দুটি বিষয় প্রবল হয়ে দেখা দিয়েছিল।

(১) অতীত ঘটনার জন্যে দুঃখ ও বিষাদ। (২) আশঙ্কা যে, ভবিষ্যতের জন্যে মুসলমানগণকে যেন দুর্বল ও হতোদ্যম না হয়ে পড়ে এবং বিশ্ব নেতৃত্বের দায়িত্বপ্রাপ্ত এ জাতি অঙ্কুরেই না মনোবল হারিয়ে ফেলে। এ দুটি ছিদ্রপথ বন্ধ করার জন্যে কুরআন পাকের এ বাণী অবতীর্ণ হয়।

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ, 'ভবিষ্যতের জন্যে তোমরা দূর্বল্য ও শৈথিল্যকে কাছে আসতে দিয়ো না এবং অতীতের জন্যেও বিমর্ষ ও বিষন্ন হয়ো না। যদি তোমরা ঈমান ও বিশ্বাসের পথে সোজা হয়ে থাক এবং আল্লাহ তাআলার ওয়াদার উপর ভরসা রেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য ও আল্লাহর পথে জিহাদে অনড় থাক, তবে পরিশেষে তোমরাই জয়ী হবে।

(মাআরেফুল কুরআন– ২/২০৮)

আল্লাহ দেখবেন কারা জিহাদ করল

জিহাদের আবশ্যকতা বর্ণনা করতে গিয়ে ইরশাদ হয়েছেঃ

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللّٰهُ الَّذِيْنَ جٰهَدُوْا مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ الصّٰبِرِيْنَ (ال عمران ١٤٢)

তরজমাঃ তোমরা কি মনে কর, তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে, অথচ আল্লাহ এখনও দেখেননি তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্যশীল। (আলে-ইমরানঃ ১৪২)

তাফসীর ঃ অর্থাৎ, যারা যথেষ্ট জিহাদ করেছে এবং এ পথের বিপদাপদে ধৈর্য ধারণ করেছে তারাই বিশেষভাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালবাসেন

ইরশাদ হয়েছেঃ

وَكَأَيِّنْ مِّنْ نَّبِيٍّ قٰتَلَ مَعَهٗ رِبِّيُّوْنَ كَثِيْرٌ فَمَا وَهَنُوْا لِمَا أَصَابَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَمَا ضَعُفُوْا وَمَا اسْتَكَانُوْا وَاللّٰهُ يُحِبُّ الصّٰبِرِيْنَ

(ال عمران: ١٤٦)

তরজমাঃ আর বহু নবী ছিলেন, যাঁদের সঙ্গী-সাথীরা তাঁদের অনুবর্তী হয়ে জিহাদ করেছে, আল্লাহর পথে, তাদের কিছু কষ্ট হয়েছে বটে কিন্তু আল্লাহর রাহে তারা হেরেও যায়নি, ক্লান্তও হয়নি এবং দমেও যায়নি। আর যারা সবর করে, আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন। (আলে-ইমরানঃ ১৪৬)

তাফসীর ঃ উক্ত আয়াত সহ পরবর্তী আয়াতদ্বয়ে পূর্ববর্তী পয়গাম্বরগণের সাথে জিহাদে অংশগ্রহণকারী আল্লাহ ভক্তদের দৃঢ়তা, বিপদাপদে অস্থির ও দুর্বল না হওয়ার কথা বর্ণনা করার পর তাদের একটি বিরাট গুণের কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, তারা এ অপূর্ব আত্মত্যাগের মধ্যেও আল্লাহ তাআলার দরবারে কয়েকটি দু'আ করতেন।

(১) আমাদের বিগত অপরাধসমূহ ক্ষমা করুন।

(২) বর্তমানে জিহাদকালে যে সব ত্রুটি করেছি, তা মার্জনা করুন।

(৩) আমাদের দৃঢ়তা বহাল রাখুন।

(৪) শত্রুদের বিরুদ্ধে আমাদের জয়ী করুন।

এসব দু'আয় মুসলমানদের জন্যে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ রয়েছে।

(মাআরেফুল কুরআন- ২/২১৫)

মোকাবেলায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর

ইরশাদ হয়েছেঃ

يَاَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

তরজমাঃ হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য ধারণ কর এবং মোকাবেলায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর। আর আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার।

(আলে-ইমরানঃ ২০০)

তাফসীর ঃ এ আয়াতে মুসলমানগণকে তিনটি বিষয়ের নসীহত করা হয়েছে। (১) সবর, (২) মুসাবারাহ, (৩) মুরাবাতা ও (৪) তাকওয়া, যা এ তিনের সাথে অপরিহার্যভাবে যুক্ত।

'সবর' এর শাব্দিক অর্থ বিরত রাখা ও বাঁধা। আর কুরআন ও সুন্নাহর পরিভাষায় এর অর্থ নফসকে তার প্রকৃতি বিরুদ্ধ বিষয়ের উপর জমিয়ে রাখা। এর তিনটি প্রকার রয়েছে।

এক. সবর আলাত্তাআত। অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা ও তাঁর রাসূল যে সমস্ত কাজের হুকুম করেছেন, সেগুলোর অনুবর্তিতা মনে উপর যত কঠিনই হোক না কেন তাতে মনকে স্থীর রাখা।

দুই. সবর আনিল মাআসী। অর্থাৎ, যে সমস্ত বিষয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূল নিষেধ করেছেন, সেগুলো মনের জন্য যত আকর্ষণীয়ই হোক না কেন, যত স্বাদেরই হোক না কেন, তা থেকে মনকে বিরত রাখা।

তিন. সবর আলাল মাসায়েব। অর্থাৎ, বিপদাপদ ও কষ্টের বেলায় সবর করা, ধৈর্য ধারণ করা, অধৈর্য না হওয়া এবং দুঃখ-কষ্ট ও সুখ-শান্তিকে আল্লাহরই পক্ষ থেকে আগত মনে করে মন-মস্তিষ্ককে সে জন্য অধৈর্য করে না তোলা।

মোসাবারাহঃ শব্দটি সবর থেকেই গৃহীত হয়েছে। এর অর্থ– শক্রর মোকাবিলা করতে গিয়ে দৃঢ়তা অবলম্বন করা। আর মোরাবাতা অর্থ হলো, ঘোড়াকে বাঁধা এবং যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করা। এ অর্থেই কুরআনে কারীমে বলা হয়েছে– وَمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় এ শব্দটি দুটি অর্থে ব্যবহৃত হয়।

১. ইসলামী সীমান্তের হেফাজতে সুসজ্জিত হয়ে থাকা অপরিহার্য, যাতে ইসলামী সীমান্তের প্রতি শক্ররা রক্ত চক্ষু তুলে তাকাতেও সাহস না পায়।

২. জামাআতের নামাযের এমন নিয়মানুবর্তিতা করা যে, এক নামাযান্তেই দ্বিতীয় নামাযের জন্য অপেক্ষমান থাকা। এ দুইটি বিষয়ই ইসলামের দৃষ্টিতে অত্যন্ত মাকবুল ইবাদত। এর মাহাত্ম্য অসংখ্য-অগণিত।

নিজেদের অস্ত্র তুলে নাও

ইরশাদ হয়েছেঃ

يَـٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ اٰمَنُوا خُذُوا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوا ثُبَاتٍ اَوِ انْفِرُوا جَمِيْعًا (النساء: ٧١)

তরজমাঃ হে ঈমানদারগণ! নিজেদের অস্ত্র তুলে নাও এবং পৃথক পৃথক সৈন্য দলে কিংবা সমবেতভাবে বেরিয়ে পড়। (নিসাঃ ৭১)

তাফসীর ঃ উক্ত আয়াতের প্রথমাংশে জিহাদের জন্য অস্ত্র সংগ্রহের এবং অত;পর আয়াতের দ্বিতীয় অংশে জিহাদে অংশগ্রহণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এতে একটি বিষয় বুঝা যাচ্ছে এই যে, কোন ব্যাপারে বাহ্যিক উপকরণ অবলম্বন করা তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতার পরিপন্থী নয়। এ বিষয়টি আরো কয়েক জায়গায় সবিস্তারে আলোচিত হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ বুঝা যাচ্ছে, এখানে অস্ত্র সংগ্রহের নির্দেশ দেওয়া হলেও এমন প্রতিশ্রুতি কিন্তু দেওয়া হয়নি যে, এ অস্ত্রের কারণে তোমরা নিশ্চিতভাবেই নিরাপদ হতে পারবে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বাহ্যিক উপকরণ অবলম্বন করাটা মূলতঃ মানসিক স্বস্তি লাভের জন্যই হয়ে থাকে। বাস্তবে

এগুলো লাভ-ক্ষতির ব্যাপারে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না। যেমন এ ব্যাপারে ইরশাদ হয়েছেঃ

قُلْ لَنْ يُّصِيْبَنَا اِلاَّ مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا

অর্থাৎ, হে নবী! আপনি বলে দিন, আমাদের উপর এমন কোন বিপদাপদই আসে না, যা আল্লাহ আমাদের তাকদীরে নির্ধারিত করে দেননি।

উপরোক্ত আয়াতে প্রথমে জিহাদের প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ এবং অতঃপর জিহাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হওয়ার নিয়ম বাতলে দেওয়া হয়েছে। এ প্রসঙ্গে দু'টি বাক্য– فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ اَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا ব্যবহার করা হয়েছে। ثُبَاتٌ শব্দটি ثُبَةٌ এর বহুবচন। এর অর্থ ক্ষুদ্র দল। অর্থাৎ, তোমরা যখন জিহাদের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হবে, তখন একা একা বের হবে না, বরং ছোট ছোট দলে বের হবে কিংবা (সম্মিলিত) বড় সৈন্য দল নিয়ে বেরুবে। তার কারণ, একা একা যুদ্ধ করতে গেলে ক্ষতির আশঙ্কা রয়েছে। শত্রুরা এমন সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে মোটেও শৈথিল্য করে না। (মাআরেফুল কুরআন– ২/৫৪০)

পার্থিব ফায়দা সীমিত

ইরশাদ হয়েছেঃ

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْا اَيْدِيَكُمْ وَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَاٰتُوا الزَّكٰوةَ فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ اِذَا فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللّٰهِ اَوْ اَشَدَّ خَشْيَةً وَقَالُوْا رَبَّنَا لِمَ كَتَبْتَ عَلَيْنَا الْقِتَالَ لَوْ لَا اَخَّرْتَنَا اِلٰى اَجَلٍ قَرِيْبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْيَا قَلِيْلٌ وَالْاٰخِرَةُ خَيْرٌ لِّمَنِ اتَّقٰى وَلَا تُظْلَمُوْنَ فَتِيْلًا (النساء: ٧٧)

তরজমাঃ তুমি কি সেসব লোককে দেখনি, যাদেরকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে, তোমরা নিজেদের হাতকে সংযত রাখ, নামায কায়েম কর এবং যাকাত দিতে থাক। অতঃপর যখন তাদের প্রতি জিহাদের নির্দেশ দেওয়া হল, তৎক্ষণাৎ তাদের একদল লোক মানুষকে ভয় করতে আরম্ভ করল,

যেমন করে ভয় করতে হয় আল্লাহকে। এমনকি তার চেয়েও অধিক ভয়। আর বলতে লাগল, হায় পালনকর্তা! কেন আমাদের উপর যুদ্ধ ফরয করলে! আমাদেরকে কেন আরও কিছু কাল অবকাশ দান করলে না! (হে রাসূল!) তাদেরকে বলে দিন, পার্থিব ফায়দা সীমিত। আর আখেরাত পরহেযগারদের জন্য উত্তম। আর তোমাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও জুলুম করা হবে না।

(নিসাঃ ৭৭)

তাফসীর ঃ শানে নুযুল–

الَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ قِيْلَ لَهُمْ كُفُّوْا اَيْدِيَكُمْ

হিজরতের পূর্বে মক্কায় কাফেররা মুসলমানদের প্রতি কঠিন নিপীড়ন চালাচ্ছিল। এতে মুসলমানগণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত হয়ে অভিযোগ করতেন এবং কাফেরদের মুকাবিলা করার অনুমতি চাইতেন। অত্যাচারের প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য। কিন্তু হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে এই বলে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখতেন যে, 'আমার প্রতি মুকাবিলা করার কোন নির্দেশ হয়নি। বরং ধৈর্য ধারণ করার ও ক্ষমা করার নির্দেশ রয়েছে।'

তিনি আরও বলতেন, নামায কায়েম করার এবং যাকাত দান করার যে, নির্দেশ তোমাদেরকে দেয়া হয়েছে, তাই যথারীতি সম্পাদন করতে থাক। কারণ, মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর আনুগত্যের জন্য নিজেদের মনের সাথে জিহাদ করতে এবং দৈহিক কষ্ট সহিষ্ণুতায় আল্লাহর রাহে স্বীয় ধন-সম্পদ ব্যয় করতে অভ্যস্ত না হয়, ততক্ষণ পর্যন্ত জিহাদ করা এবং আল্লাহর রাহে নিজের প্রাণ বিসর্জন দেয়া তাদের পক্ষে দুষ্কর হয়। মুসলমানগণ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথাগুলো হৃষ্টচিত্তে মেনে নিয়েছিলেন। কাজেই অতঃপর হিজরতোত্তরকালে যখন জিহাদের নির্দেশ হল, তখন তাদের আনন্দিত হওয়া উচিত ছিল যে, আমাদের আবেদন এবার গৃহীত হলো। কিন্তু কোন কোন অপরিপক্ক মুসলমান কাফেরদের মুকাবিলা করার ব্যাপারে এমন ভয় করতে লাগলেন যে, যেমন ভয় করা উচিত ছিল আল্লাহর আযাবের

ব্যাপারে বরং তাদের ভয় ছিল ততোধিক। আর তারা এমন বাসনাও পোষণ করতে লাগলেন যে, আরও কয়েকটি দিন যদি জিহাদের হুকুম না আসত এবং আমরা আরও কিছু সময় বেঁচে থাকতাম। তবে কতই না ভাল হতো। এসব কারণেই আয়াতটি অবতীর্ণ হয়।

(রূহুল মাআনী, মাআরেফুল কুরআন– ২/৫৪৯)

একটি শিক্ষামূলক ঘটনা

أَيْنَ مَا تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ

আল্লাহ তাআলা জিহাদের হুকুম সম্বলিত এ আয়াতের মাধ্যমে জিহাদ থেকে বিরত লোকদের সে সন্দেহের অপনোদন করে দিয়েছেন যে, হয়তো জিহাদ থেকে আত্মগোপন করে থাকতে পারলে মৃত্যু থেকেও আত্মরক্ষা করা যাবে। সে জন্যই বলা হয়েছে, একদিন না একদিন মৃত্যু অবশ্যই আসবে। তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু সেখানেই গিয়ে উপস্থিত হবে। কাজেই বিষয়টি যখন এমনি অবধারিত, তখন জিহাদ থেকে তোমাদের আত্মগোপনের প্রয়াস সম্পূর্ণ অর্থহীন।

হাফেজ ইবনে কাসীর (রহঃ) এ আয়াতের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে একটি শিক্ষণীয় ঘটনার উল্লেখ করেছেন। যা ইবনে জারীর ও ইবনে আবী হাতিম মুজাহিদ থেকে উদ্ধৃত করেছেন। ঘটনাটি এই–

বিগত উম্মতগুলোর থেকে কোন এক উম্মতের জনৈকা মহিলার প্রসবের সময় ঘনিয়ে আসে এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই সে এক কন্যা সন্তান প্রসব করে। তখন সে নিজের ভৃত্যকে আগুন আনার জন্য পাঠায়। ভৃত্য দরজা দিয়ে যখন বেরিয়ে যাচ্ছিল, তখন হঠাৎ একটি লোক তার সামনে পড়ল এবং জিজ্ঞেস করল এ স্ত্রীলোকটি কি প্রসব করেছে? ভৃত্য বলল, একটি কন্যা সন্তান প্রসব করেছে। তখন সে লোকটি বলল, আপনি মনে রাখবেন– এ কন্যা একশত পুরুষের সাথে যিনা (ব্যাভিচার) করবে এবং শেষ পর্যন্ত মাকড়সার দ্বারা তার মৃত্যু ঘটবে। একথা শুনে ভৃত্য ফিরে এল এবং সঙ্গে সঙ্গে একটি ছুরি নিয়ে সে মেয়ের পেটটি কেটে ফেলল এবং মনে মনে

ভাবল, নিশ্চয় তার মৃত্যু হয়েছে। তারপর সে সেখান থেকে পালিয়ে গেল। কিন্তু এ মেয়ের মা সঙ্গে সঙ্গে তার পেট সেলাই করে দিল। শেষ পর্যন্ত সে সুস্থ হয়ে উঠল, যৌবনে পদার্পণ করল। এ মেয়েটি এতই সুন্দরী ছিল যে, তখনকার সময়ে তদাঞ্চলে এমন রূপসী দ্বিতীয়টি ছিল না। যাহোক, সে ভৃত্য পালিয়ে সাগর পথে চলতে লাগল এবং দীর্ঘ দিন যাবত রুজি-রোজগার করে বিপুল ধন-সম্পদ অর্জন করে। অতঃপর বিয়ে করার উদ্দেশ্যে শহরে ফিরে এল। এখানে এসেই সে এক বৃদ্ধার সাক্ষাৎ পেল। প্রসঙ্গতঃ সে তার অভিপ্রায় বৃদ্ধাকে জানিয়ে বলল যে, আমি একজন অনুপমা রূপসীকে বিয়ে করব, যার তুলনা এ শহরে আরেকটি থাকবে না। তখন সে বৃদ্ধা জানাল যে, এ শহরে অমুক মেয়ের চাইতে রূপসী আর কেউ নেই। আপনি বরং তাকেই বিয়ে করে ফেলুন। শেষ পর্যন্ত চেষ্টা-চরিত্র করে সে তাকেই বিয়ে করে নিল। বিয়ের পর যুবতী তার এই স্বামীর পরিচয় জানতে চাইলো যে, তুমি কে? কোথায় থাক? সে বলল, আমি এ শহরেরই অধিবাসী। কিন্তু এক শিশু কন্যার পেট ফেড়ে আমি এখান থেকে পালিয়ে গিয়েছিলাম। অতঃপর সে সম্পূর্ণ বৃত্তান্ত শুনালো। সব কাহিনী শুনে যুবতী বলল, সে কন্যাটি আমিই। একথা বলে নিজের পেট খুলে দেখাল, যাতে তখনও দাগ বিদ্যমান ছিল। এটি দেখে পুরুষটি বলল, তুমি যদি সত্যি সে মেয়ে হয়ে থাক, তাহলে তোমার ব্যাপারে দুটি কথা বলছি। একটি হলো এই যে, তুমি একশত পুরুষের সাথে যিনা করবে। যুবতী স্বীকার করল এবং বলল যে, তাই হয়েছে, তবে আমার সংখ্যা মনে নেই।

দ্বিতীয় বিষয়টি এই– তুমি মাকড়সার দ্বারা আক্রান্ত হয়ে মারা যাবে।

পুরুষ তার জন্য অর্থাৎ, তার এই স্ত্রীর জন্য একটি বিরাট প্রাসাদ নির্মাণ করল। তাতে মাকড়সার জালের চিহ্ন মাত্রও ছিল না। একদিন সে প্রাসাদে শুয়ে শুয়েই দেয়ালে একটি মাকড়সা দেখতে পেল। স্ত্রী জিজ্ঞেস করল এটা কি সে মাকড়সা, তুমি আমাকে যার ভয় দেখাও? পুরুষ বলল, হ্যাঁ, এটিই। একথা শুনে মেয়েটি সঙ্গে সঙ্গে বিছানা থেকে উঠে গেল এবং বলল যে, একে তো এক্ষণেই আমি মেরে ফেলব। একথা বলে মাকড়সাটিকে নীচে ফেলে দিল এবং পায়ে পিষে মেরে ফেলল।

মাকড়সাটি মরে গেল সত্য কিন্তু মেয়েটির পায়ে এবং আঙ্গুলে তার বিষের ছিঁটা গিয়ে পড়ল যা শেষ পযন্ত তার মৃত্যুর কারণ হয়ে দাঁড়াল। (ইবনে কাসীর)

এ মহিলাটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বিরাট প্রাসাদে বাস করেও সহসা একটি মাকড়সার দ্বারা মৃত্যু মুখে পতিত হল। কিন্তু তার বিপরীতে এমন বহু লোক রয়েছে যারা গোটা জীবনই অতিবাহিত করেছে যুদ্ধ-বিগ্রহের মাঝে। অথচ সেখানেও তাদের মৃত্যু আসেনি। ইসলামের প্রখ্যাত সেনাপতি হযরত খালেদ ইবনে ওয়ালীদ সারা জীবন শাহাদাত লাভের আশায় জিহাদে নিয়োজিত থাকেন এবং শত সহস্র কাফেরকে তলোয়ারের আঘাতে হত্যা করেন। প্রতিটি ভয়-সংকুল উপত্যকা তিনি নিঃশঙ্কোচিত্তে অতিক্রম করতে থাকেন এবং সর্বদা এ প্রার্থনাই করতে থাকেন, যেন তাঁর মৃত্যু নারীদের মত ঘরের কোণে না হয়ে বরং নির্ভিক সৈনিকের মত জিহাদের ময়দানেই হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত তাঁর মৃত্যু বিছানায় পড়েই হল। এতেই প্রতীয়মান হয় যে, জীবন ও মৃত্যুর ব্যবস্থাটি একক ক্ষমতার অধিকারী আল্লাহ নিজের হাতেই রেখেছেন। তিনি ইচ্ছা করলে শান্তির নীড়ে মাকড়সার মাধ্যমেই মৃত্যু দান করেন, আর যখন তিনি বাঁচাতে ইচ্ছা করেন, তখন তলোয়ারের নীচ থেকেও বাঁচিয়ে রাখেন। (মাআরেফুল কুরআন-২/৫৫৩)

আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করতে থাকুন

فَقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللّٰهِ ج لَا تُكَلَّفُ اِلَّا نَفْسَكَ وَحَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ ج عَسَى اللّٰهُ اَنْ يَّكُفَّ بَأْسَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ط وَاللّٰهُ اَشَدُّ بَأْسًا وَّاَشَدُّ تَنْكِيْلًا (النساء ٨٤)

তরজমাঃ আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করতে থাকুন; আপনি নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ের যিম্মাদার নন। আর আপনি মুসলমানদেরকে উৎসাহিত করতে থাকুন। শীঘ্রই আল্লাহ কাফেরদের শক্তি-সামর্থ্য খর্ব করে দেবেন। আর আল্লাহ শক্তি-সামর্থ্যের দিক দিয়ে অত্যন্ত কঠোর এবং কঠিন শাস্তিদাতা। (নিসাঃ ৮৪)

কুরআনী বিধানের বর্ণনা শৈলী

তাফসীর ঃ فَقَاتِلْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ج এ আয়াতের প্রথম বাক্যে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, আপনি একাই যুদ্ধের জন্য তৈরী হয়ে পড়ুন; কেউ আপনার সাথে থাক বা না থাক। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় বাক্যে একথাও বলা হয়েছে যে, অন্যান্য মুসলমানদেরকে এ ব্যাপারে উৎসাহ দানের কাজটিও পরিহার করবেন না। এভাবে উৎসাহ দানের পরেও যদি তারা যুদ্ধের জন্য উদ্বুদ্ধ না হয়, তবে আপনার দায়িত্ব পালিত হয়ে গেল; তাদের কর্মের জন্য আপনাকে জবাবদিহি করতে হবে না।

এতদসঙ্গে একা যুদ্ধ করতে গিয়ে যেসব বিপদাশঙ্কা দেখা দিতে পারে, তার প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে– আশা করা যায় আল্লাহ কাফিরদের যুদ্ধ বন্ধ করে দিবেন এবং তাদেরকে ভীত ও পরাজিত করে দিবেন। আর আপনাকে একাই জয়ী করবেন। অতঃপর এই বিজয় প্রসঙ্গে প্রমাণ বর্ণনা করা হয়েছে যে, আপনার প্রতি যখন আল্লাহ তাআলার সমর্থন রয়েছে– যার সমরশক্তি অপেক্ষা অসংখ্য গুণ বেশী, তখন আপনার বিজয়ই আবশ্যম্ভাবী ও নিশ্চিত। তারপর এই সুদৃঢ় প্রতিরোধ ক্ষমতার সঙ্গে সঙ্গে স্বীয় শাস্তির কঠোরতা বর্ণনা করা হয়েছে। এ শাস্তি কিয়ামতের দিনই হোক, কিংবা পার্থিব জীবনেই হোক, যুদ্ধ ক্ষেত্রে যেমন আমার শক্তি অপরাজেয়, তেমনি শাস্তি দানের ক্ষেত্রে আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর। (মাআরেফুল কুরআন–২/৫৬৭)

আল্লাহর পথে জিহাদ কর

ইরশাদ হয়েছে–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِىْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (مائدة ٣٥)

অর্থঃ হে মুমিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তার নৈকট্য অন্বেষণ কর এবং তাঁর পথে জিহাদ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হও। (মায়েদাঃ ৩৫)

তাফসীরঃ আলোচ্য আয়াতে প্রথমে খোদাভীতি এবং দ্বিতীয় পর্যায়ে ঈমান ও সৎকর্মের মাধ্যমে নৈকট্য অন্বেষণের নির্দেশ দিয়ে বলা হচ্ছেঃ

وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ

অর্থাৎ, আল্লাহর পথে জিহাদ কর। যদিও জিহাদ সৎকর্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল, কিন্তু সৎকর্মসমূহের মধ্যে জিহাদের স্থান যে শীর্ষে– একথা বুঝানোর জন্য জিহাদকে পৃথকভাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছে–

وذروة سنامه الجهاد

অর্থাৎ, ইসলামে শীর্ষস্থান হচ্ছে জিহাদের। এছাড়া জিহাদকে এক্ষেত্রে গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করার একটি তাৎপর্য এই যে, পূর্ববর্তী আয়াতে দেশে অনর্থ ও অশান্তি সৃষ্টি করাকে হারাম ও অবৈধ বলে আখ্যা দিয়ে তার জাগতিক ও পরলৌকিক শাস্তি বর্ণনা করা হয়েছিল। বাহ্যিক দিক দিয়ে জিহাদকেও দেশে অশান্তি উৎপাদনের নামান্তর মনে হয়। তাই এরূপ সম্ভাবনা ছিল যে, কোন অজ্ঞ ব্যক্তি জিহাদ ও অশান্তির মধ্যে পার্থক্য নাও বুঝতে পারে। এ কারণে দেশে অশান্তি সৃষ্টির নিষিদ্ধতা ঘোষণার পর জিহাদের নির্দেশ গুরুত্ব সহকারে উল্লেখ করে এতদুভয়ের পাথর্ক্যের দিকে فِي سَبِيلِهِ শব্দে ইঙ্গিত করা হয়েছে। কারণ, ডাকাতি, বিদ্রোহ ইত্যাদিতে যে হত্যাকাণ্ড ও অর্থ-সম্পদ লুণ্ঠন করা হয়, তা শুধু ব্যক্তিগত স্বার্থ, কামনা-বাসনা ও হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার নিমিত্ত হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে জিহাদে হত্যা ও লুণ্ঠন থাকলেও তা শুধু আল্লাহর বাণী সমুন্নত করা এবং অত্যাচার ও অবিচার মিটিয়ে দেয়ার উদ্দেশ্যে হয়। এতদুভয়ের মধ্যে আসমান-যমীন তফাৎ। (মাআরেফুল কুরআন– ৩/১৩৫)

আল্লাহর পথে জিহাদ করবে

ইরশাদ হয়েছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا مَنْ يَرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ

ز يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ط ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ ط وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ (مائدة ٥٤)

তরজমাঃ হে মুমিনগণ! তোমাদের মধ্যে যে স্বীয় ধর্ম থেকে ফিরে যাবে অচিরেই আল্লাহ এমন এক সম্প্রদায় সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালবাসবেন এবং তারা তাঁকে ভালবাসবে। তারা মুসলমানদের প্রতি দয়াশীল হবে এবং কাফিরদের প্রতি কঠোর হবে। তারা আল্লাহর পথে জিহাদ করবে এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে ভীত হবে না। এটি আল্লাহর অনুগ্রহ– তিনি যাকে ইচ্ছা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্য দানকারী, মহাজ্ঞানী।

(মায়েদাহ ৫৪)

তাফসীরঃ উক্ত আয়াতে বলা হয়েছে মুসলমানরা যদি ধর্ম ত্যাগী হয়ে যায়, আল্লাহ অন্য কোন জাতির অভ্যুত্থান ঘটাবেন এবং আয়াতে সেই পুণ্যাত্মা জাতির কিছু গুণাবলীও বর্ণনা করেছেন। যারা ধর্মের কাজ করে, এ গুণগুলোর প্রতি তাদের লক্ষ্য রাখা উচিত। কারণ, এসব গুণের অধিকারী আল্লাহর দৃষ্টিতে প্রিয় ও মাকবুল।

তাদের প্রথম গুণের সারমর্ম হলো– অধিকার সমূহের পূর্ণতা এবং দ্বিতীয় গুণের সারমর্ম হলো– বান্দার অধিকার ও কাজ-কারবারের সমতা। তাদের তৃতীয় গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে–

يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

অর্থাৎ, তারা সত্য ধর্মের প্রচার ও প্রসারের লক্ষ্যে জিহাদে প্রবৃত্ত হবে। এর সারমর্ম এই যে, কুফর ও ধর্ম ত্যাগের মুকাবিলা করার জন্যে শুধু কতিপয় ইবাদত এবং নম্র ও কঠোর হওয়াই যথেষ্ট নয়, বরং ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্দীপনাও থাকতে হবে। এ উদ্দীপনাকে পূর্ণতা দানের জন্যে চতুর্থ গুণ– وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَائِمٍ বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছে। অর্থাৎ, ধর্মকে প্রতিষ্ঠিত ও সমুন্নত করার চেষ্টায় তারা কোন ভর্ৎসনাকারীর ভর্ৎসনারও পরওয়া করবে না।

চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে, কোন আন্দোলন পরিচালনার পথে দু'টি বিষয় অন্তরায় হয়ে থাকে। প্রথমতঃ বিরোধী শক্তির প্রবলতা এবং দ্বিতীয়তঃ আপন

লোকদের ভর্ৎসনা ও তিরস্কার। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, যারা আন্দোলন পরিচালনায় দৃঢ় সংকল্প হয়ে অগ্রসর হয়, তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে বিরোধী শক্তির কাছে নতি স্বীকার করে না– জেল-জুলুম, যখম, হত্যা ইত্যাদি সবকিছুই অম্লান বদনে সহ্য করে নেয়। কিন্তু আপন লোকদের ভর্ৎসনা-বিদ্রূপ ও নিন্দাবাদের মুখে বড় বড় কর্মবীরদেরও পদস্খলন ঘটে। সম্ভবতঃ এ কারণেই আল্লাহতাআলা এখানে এর গুরুত্ব ফুটিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে বলেছেন যে, তারা কারও ভর্ৎসনার পরওয়া না করে স্বীয় জিহাদ অব্যাহত রাখবে। (মাআরেফুল কুরআন– ৩/১৮৬)

তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে–

وَقَاتِلُوهُمْ حَتّٰى لَاتَكُونَ فِتْنَةٌ وَّيَكُونَ الدِّيْنُ كُلُّهُ لِلّٰهِ ج فَاِنِ انْتَهَوْا فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ (انفال ٣٩)

তরজমাঃ আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক, যতক্ষণ না ভ্রান্তি শেষ হয়ে যায় এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। তারপর যদি তারা বিরত হয়ে যায়, তবে আল্লাহ্ তাদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করেন। (আনফাল ৩৯)

তাফসীরঃ উক্ত আয়াতের দুটি শব্দ বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। (১) ফেতনা, (২) দ্বীন। আরবী অভিধান অনুযায়ী শব্দ দুটি একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

তাফসীর শাস্ত্রের ইমামগণ, সাহাবায়ে কেরামও তাবেঈনদের নিকট থেকে এখানে দুটি অর্থ উদ্ধৃত করেছেন।

(১) ফেতনা অর্থ, কুফর ও শিরক আর (২) দ্বীন অর্থ, ইসলাম ধর্ম নিতে হবে। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) থেকেও এই বিশ্লেষণ বর্ণিত হয়েছে। সুতরাং এই তাফসীর অনুযায়ী আয়াতের অর্থ হবে এই যে, মুসলমানদিগকে কাফেরদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করে যেতে হবে যতক্ষণ না কুফর নিঃশেষিত হয়ে ইসলামের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা ঘটে এবং ইসলাম ছাড়া অন্য কোন ধর্মের অস্তিত্ব যতক্ষণ না বিলুপ্ত হয়ে যায়। এক্ষেত্রে এই

নির্দেশ শুধুমাত্র মক্কাবাসী এবং আরববাসীদের জন্য নির্দিষ্ট হবে। কারণ আরব হচ্ছে ইসলামের উৎসস্থল। এতে ইসলাম ছাড়া যদি অন্য কোন ধর্ম বিদ্যমান থাকে, তাহলে দ্বীন ইসলামের জন্য তা হবে আশংকাজনক। তবে পৃথিবীর অন্যত্র অন্যান্য ধর্মমত ও আদর্শকে আশ্রয় দেয়া যেতে পারে। যেমন, কুরআনে কারীমের অন্যান্য আয়াতে এবং হাদীসের বিভিন্ন বর্ণনায় প্রমাণিত হয়েছে।

আর দ্বিতীয় তাফসীর যা হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) প্রমুখ সাহাবায়ে কেরামের উদ্ধৃতিতে বর্ণিত রয়েছে। তাহলো এই যে, এতে ফেতনা অর্থ হচ্ছে– সেসব দুঃখ-দুর্দশা ও বিপদাপদের ধারা, যা মক্কার কাফেররা সদা সর্বদা মুসলমানদের উপর অব্যাহত রেখেছিল। যতক্ষণ পর্যন্ত তারা (মুসলমানগণ) মক্কায় অবস্থান করেছিলেন। প্রতি মুহূর্তে তাদের অবরোধে আবদ্ধ থেকে নানা রকম কষ্ট সহ্য করে গেছেন। তারপর যখন তারা মদীনার দিকে হিজরত করেন, তখন তারা প্রতিটি মুসলমানের পশ্চাদ্ধাবন করে তাঁদের হত্যা ও লুণ্ঠন করতে থাকে। এমনকি মদীনায় পৌঁছার পরও গোটা মদীনা আক্রমণের মাধ্যমে তাদের হিংসা-রোষই প্রকাশ পেতে থাকে।

পক্ষান্তরে 'দ্বীন' শব্দের অর্থ হল প্রভাব ও বিজয়। এক্ষেত্রে আয়াতের ব্যাখ্যা হবে এই যে, মুসলমানগনের কাফেরদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকা কর্তব্য, যতক্ষণ না তাঁরা অন্যের অত্যাচার-উৎপীড়ন থেকে মুক্তি লাভ করতে সমর্থ হন।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ)-এর এক ঘটনার দ্বারাও এ ব্যাখ্যাই পাওয়া যায়। তাহলো এই যে, মক্কার প্রশাসক হযরত আবদুল্লাহ ইবনে যুবায়ের (রাযিঃ)-এর বিরুদ্ধে যখন হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফ সৈন্য সমাবেশ করে এবং উভয় পক্ষের মুসলমানদের উপরই যখন মুসলমানদের তলোয়ার চলতে থাকে, তখন দু'জন লোক হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে নিবেদন করেন যে, এই ক্ষণে মুসলমানগণ যে মহা বিপদের সম্মুখীন, তা আপনি নিজেই দেখছেন, অথচ আপনি সেই

উমর ইবনে খাত্তাবের পুত্র, যিনি কোনক্রমেই এহেন ফেতনা-ফাসাদকে বরদাশত করতেন না। কাজেই আপনি আজকের ফেতনার সমাধান করার উদ্দেশ্যে কি কারণে এগিয়ে আসেন না। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) বললেন, তার কারণ এই যে, আল্লাহ তাআলা কোন মুসলমানের রক্তপাত করাকে হারাম সাব্যস্ত করেছেন। আগত দু'জন আরয করলেন, আপনি কি কুরআনের এই আয়াতটি পাঠ করেন না–

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ

অর্থাৎ, যুদ্ধ করতে থাক, যতক্ষণ না ফেতনা-ফাসাদ তথা দাঙ্গা-হাঙ্গামা দূরিভূত হয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর (রাযিঃ) বললেন, নিশ্চয়ই আমি এ আয়াত পাঠ করি এবং এর উপর আমলও করি। আমরা এ আয়াতের ভিত্তিতে কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ অব্যাহত রেখেছি যতক্ষণ না ফেতনা শেষ হয়ে দ্বীন-ইসলামের বিজয় সূচিত হবে। অথচ তোমরা আল্লাহ ব্যতীত সত্য ধর্মের বিরুদ্ধে অন্য কারো বিজয় সূচিত হোক তা চাও না। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল এই যে, জিহাদ ও যুদ্ধের হুকুম ছিল কুফুরীর ফেতনা এবং কাফেরদের অত্যাচার-উৎপীড়নের বিরুদ্ধে। তা আমরা করেছি এবং বরাবর করে যাচ্ছি। আর তাতে করে সে ফেতনা প্রশমিত হয়ে গেছে। মুসলমানদের পারস্পরিক গৃহযুদ্ধকে তার সাথে তুলনা করা যথার্থ নয়। বরং মুসলমানদের পারস্পরিক লড়াই-বিবাদের ক্ষেত্রে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হেদায়াত হচ্ছে এই যে, তাতে বসে থাকা লোকটি দাঁড়ানো ব্যক্তির অপেক্ষা উত্তম।

এ বিশ্লেষণের সারমর্ম এই যে, মুসলমানদের উপর ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে ততক্ষণ পর্যন্ত যুদ্ধ-জিহাদ অব্যাহত রাখা ওয়াজিব, যতক্ষণ না মুসলমানদের উপর তাদের অত্যাচার-উৎপীড়নের ফেতনার পরিসমাপ্তি ঘটে এবং যতক্ষণ না তথাকথিত সমস্ত ধর্মের উপর ইসলামের বিজয় সূচিত হয়। আর এমন অবস্থাটি কিয়ামতের নিকটবর্তীকালেই বাস্তবায়িত হবে এবং সে কারণে কিয়ামত পর্যন্ত জিহাদের হুকুম অব্যাহত ও বলবৎ থাকবে।

(মাআরেফুল কুরআন–৪/২৮৯)

যেন তাদের উত্তরসূরীরা পালিয়ে যায়

ইরশাদ হয়েছে–

فَإِمَّا تَثْقَفَنَّهُمْ فِى الْحَرْبِ فَشَرِّدْ بِهِمْ مَنْ خَلْفَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (انفال ٥٧)

তরজমাঃ সুতরাং যদি কখনো তুমি তাদেরকে যুদ্ধে পেয়ে যাও, তবে তাদের এমন শাস্তি দাও, যেন তাদের উত্তরসূরীরা তাই দেখে পালিয়ে যায়, তাদেরও যেন শিক্ষা হয়। (সূরা আনফাল ৫৭)

তাফসীরঃ উক্ত আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা স্বীয় রাসূলকে চুক্তি লংঘনকারীদের সম্পর্কে একটি বিশেষ হেদায়েতনামা দিয়েছেন। আয়াতে বর্ণিত– تَثْقَفَنَّهُمْ শব্দের অর্থ, তাদের উপর ক্ষমতা লাভ করা। আর شَرِّدْ মূলধাতু تَشْرِيْدٌ থেকে গঠিত হয়েছে। এর প্রকৃত অর্থ বিতাড়িত ও বিক্ষিপ্ত করে দেওয়া। অতএব, আয়াতের অর্থ হবে যে, আপনি যদি কোন যুদ্ধে তাদের উপর ক্ষমতা লাভে সমর্থ হয়ে যান, তবে তাদেরকে এমন কঠোর শাস্তি দিন যা অন্যান্যের জন্যও নিদর্শন হয়ে যায়। তাদের পশ্চাতে যারা তাদের সহায়তা ও ইসলামের শত্রুতায় লেগে আছে তারাও যেন একথা উপলব্ধি করে নেয় যে, এখান থেকে পালিয়ে প্রাণ বাঁচানোই কল্যাণ। এর মর্ম হলো এই যে, এদেরকে এমন শাস্তিই যেন দেয়া হয়, যা দেখে মক্কার মুশরেকীন ও অন্যান্য শত্রু সম্প্রদায়গুলোও প্রভাবিত হবে এবং ভবিষ্যতে মুসলমানদের মুকাবিলা করার সাহস করবে না। আয়াতের শেষাংশে لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ বলে রাব্বুল আলামীনের ব্যাপক রহমতের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এই সুকঠিন নির্দেশমূলক শাস্তির প্রকৃত উদ্দেশ্য প্রতিশোধ গ্রহণ কিংবা প্রতিহিংসা চরিতার্থ করা নয়; বরং এতে তাদেরই কল্যাণ যে, হয়তো বা এহেন অবস্থা দেখে এরা কিছুটা চেতনা ফিরে পাবে এবং নিজেদের কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে নিজেদের সংশোধন করে নেবে।

(মাআরেফুল কুরআন– ৪/৩৩৭)

আল্লাহর শত্রুদের উপর যেন প্রভাব পড়ে

ইরশাদ হয়েছে–

وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَبَقُوا ط إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ (٥٩) وَأَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ ج لَا تَعْلَمُونَهُمْ ج اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ط وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ (٦٠)

(انفال ٥٩-٦٠)

তরজমাঃ (৫৯) আর কাফেররা যেন একথা মনে না করে যে, তারা বেঁচে গেছে; কখনও এরা আমাকে পরিশ্রান্ত করতে পারবে না। (৬০) আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যাই কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি-সামর্থ্যের মধ্যে থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে। যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর আর তাদেরকে ছাড়া অন্যান্যদের উপরও যাদেরকে তোমরা জান না; আল্লাহ তাদেরকে চিনেন। বস্তুত: যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহর রাহে তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের কোন হক অপূর্ণ থাকবে না।

(আনফালঃ ৫৯–৬০)

তাফসীরঃ উল্লেখিত আয়াতদ্বয়ের মধ্যে প্রথম আয়াতে সে সমস্ত কাফেরের বিষয় আলোচনা করা হয়েছে– যারা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেনি বলে বেঁচে গেছে কিংবা অংশ নিয়েও পালিয়ে নিজের প্রাণ রক্ষা করেছে। এ আয়াতে তাদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, এরা যেন এমন ধারণা না করে যে, বাস্তবিক পক্ষেই আমরা বেঁচে গেছি। কারণ, বদরের যুদ্ধটি কাফেরদের জন্য এক খোদায়ী আযাব। এই পাকড়াও থেকে বেঁচে যাওয়া কারো পক্ষে সম্ভব নয়। সুতরাং বলা হয়েছে– إِنَّهُمْ لَا يُعْجِزُونَ অর্থাৎ, এরা নিজের চতুরতার দ্বারা আল্লাহকে পরিশ্রান্ত করতে পারবে না, তিনি যখনই তাদেরকে পাকড়াও করতে চাইবেন, তখন এরা এক পা'ও সরতে পারবে না। হয়তো বা পৃথিবীতেই এরা ধরা পড়ে যেতে পারে, না হয় আখেরাতে তো তাদের আটকে পড়া অবধারিত।

এ আয়াত ইঙ্গিত করে দিচ্ছে যে, কোন অপরাধী পাপী যদি কোন বিপদ ও কষ্ট থেকে মুক্তি পেয়ে যায় এবং তারপরও যদি তাওবা না করে বরং স্বীয় অপরাধে অটল-অবিচল থাকে, তবে তাকে এর লক্ষণ মনে করো না যে, সে কৃতকার্য হয়ে গেছে এবং চিরকালের জন্যই মুক্তি পেয়ে গেছে, বরং সে সর্বক্ষণই আল্লাহর হাতের মুঠোয় রয়েছে এবং এই অব্যাহতি তার বিপদকে আরো বাড়াচ্ছে যদিও সে তা অনুভব করতে পারছে না।

বিশুদ্ধ হাদীস সমূহে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করা এবং সেগুলো ব্যবহার করার কায়দা-কৌশল অনুশীলন করাকে বিরাট ইবাদত ও মহা পূণ্য লাভের উপায় বলে সাব্যস্ত করেছেন। তীর বানানো এবং চালানোর জন্য বিরাট বিরাট সওয়াবের ওয়াদা করা হয়েছে। আর জিহাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য যেহেতু ইসলাম ও মুসলমানদের প্রতিরক্ষা এবং প্রতিরক্ষার বিষয়টি সর্ব যুগে ও সর্ব জাতিতে আলাদা রকম, সেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

جَاهِدُوا الْمُشْرِكِيْنَ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ وَاَلْسِنَتِكُمْ

অর্থ, 'মুশরিকদের বিরুদ্ধে জান-মাল ও মুখে জিহাদ কর।' (আবু দাউদ, নাসায়ী ও দারেমী গ্রন্থে হযরত আনাস (রাযিঃ) থেকে হাদীসটি রেওয়ায়েত করা হয়েছে।)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস দ্বারা বুঝা যাচ্ছে, জিহাদ ও প্রতিরোধ যেমন অস্ত্রশস্ত্রের মাধ্যমে হয়ে থাকে, তেমনই কোন কোন সময় মুখেও হয়ে থাকে। তাছাড়া কলম ও মুখেরই হুকুম রাখে। ইসলাম ও কুরআনের বিরুদ্ধে কাফির ও মুলহিদদের আক্রমণ এবং তার বিকৃতি সাধনের প্রতিরোধ মুখে কিংবা কলমের দ্বারা করাও এই সুস্পষ্ট নির্দেশের ভিত্তিতে জিহাদের অন্তর্ভুক্ত।

উল্লেখিত আয়াতে যুদ্ধোপকরণ প্রস্তুত করার নির্দেশ দানের পর সেসব সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করার ফায়দা এবং আসল উদ্দেশ্যও এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে–

تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ

অর্থাৎ, যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করার প্রকৃত উদ্দেশ্য যুদ্ধ-বিগ্রহ করা নয়, বরং কুফর ও শিরককে পরাভূত ও প্রভাবিত করে দেয়া। তা কখনো মুখ ও

কলমের মাধ্যমেও হতে পারে। আবার অনেক সময় যুদ্ধেরও প্রয়োজন হয়। কাজেই পরিস্থিতি অনুযায়ী প্রতিরোধ করা ফরয।

অতঃপর বলা হয়েছে, যুদ্ধ ও প্রতিরক্ষা প্রস্তুতিতে কাফেরকে প্রভাবিত করা উদ্দেশ্য হয়, তাদের অনেককে মুসলমানরা জানে। আর তারা হল সেসব লোক যাদের সাথে মুসলমানদের মোকাবেলা চলছে। অর্থাৎ মক্কার কাফের ও মদীনার ইহুদীরা। এছাড়াও কিছু লোক রয়েছে যাদেরকে এখনও মুসলমানরা জানেনা। এর মর্ম হল– সারা দুনিয়ার কাফের ও মুশরিকগণ, যারা এখনও মুসলমানদের মোকাবেলায় আসেনি। কিন্তু ভবিষ্যতে তাদের সাথেও সংঘর্ষ বাধতে পারে। কুরআনে কারীমের এ আয়াতটিতে বলে দেয়া হয়েছে যে, মুসলমানগণ যদি নিজেদের উপস্থিত শত্রুর মোকাবেলার প্রস্তুতি নিয়ে নেয়, তবে এর প্রভাব শুধু তাদের উপরই পড়বে না, বরং দূর-দূরান্তের কাফের সম্প্রদায়; কিসরা ও কায়সার প্রভৃতির উপরেও পড়বে। বস্তুতঃ হয়েছেও তাই। খোলাফায়ে রাশেদীনের আমলে এরা সবাই পরাজিত ও প্রভাবিত হয়ে যায়।

যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ করতে গিয়ে এবং যুদ্ধ পরিচালনার জন্য অর্থেরও প্রয়োজন হয়; বরং যুদ্ধের সাজ-সরঞ্জাম অর্থ-সম্পদের দ্বারাই তৈরী করা যেতে পারে। সেজন্যই আয়াতের শেষাংশে আল্লাহর রাহে মাল বা অর্থ-সম্পদ ব্যয় করার ফযীলত এবং তার মহা প্রতিদানের বিষয়টি এভাবে বলা হয়েছে যে, এ পথে তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে তার বদলা পুরোপুরিভাবে তোমাদেরকে দেয়া হবে। কোন কোন সময় দুনিয়াতেই গণীমতের মাল দ্বারা এ বদলা মিলে যায়, না হয় আখেরাতের বদলা তো নির্ধারিত রয়েছেই। বলাবাহুল্য, সেটিই অধিকতর মূল্যবান। (মা'আরেফুল কুরআন ৪/৩৪৪)

মুসলমানদেরকে জিহাদের জন্য উৎসাহিত করুন

ইরশাদ হয়েছে–

يَٰٓأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ حَرِّضِ ٱلْمُؤْمِنِينَ عَلَى ٱلْقِتَالِ ط إِن يَكُن مِّنكُمْ
عِشْرُونَ صَٰبِرُونَ يَغْلِبُوا۟ مِائَتَيْنِ ج وَإِن يَكُن مِّنكُم مِّائَةٌ

يَّغْلِبُوْا اَلْفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِاَنَّهُمْ قَوْمٌ لَّايَفْقَهُوْنَ (٦٥) اَلْئٰنَ خَفَّفَ
اللّٰهُ عَنْكُمْ وَعَلِمَ اَنَّ فِيْكُمْ ضَعْفًا ط فَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ مِّائَةٌ صَابِرَةٌ
يَّغْلِبُوْا مِائَتَيْنِ وَاِنْ يَّكُنْ مِّنْكُمْ اَلْفٌ يَّغْلِبُوْا اَلْفَيْنِ بِاِذْنِ اللّٰهِ ط
وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ (٦٦) (انفال: ٦٥-٦٦)

তরজমাঃ (৬৫) হে নবী! আপনি মুসলমানগণকে উৎসাহিত করুন জিহাদের জন্য। তোমাদের মধ্যে যদি বিশজন দৃঢ়পদ ব্যক্তি বর্তমান থাকে, তবে জয়ী হবে দু'শর মোকাবেলায়। আর যদি তোমাদের মধ্যে থাকে একশ' লোক, তবে জয়ী হবে এক হাজার কাফেরের উপর। তার কারণ ওরা জ্ঞানহীন। (৬৬) এখন বোঝা হালকা করে দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা তোমাদের উপর থেকে এবং তিনি জেনে নিয়েছেন যে, তোমাদের মধ্যে দুর্বলতা রয়েছে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যদি দৃঢ়চিত্ত একশ' লোক বিদ্যমান থাকে, তবে জয়ী হবে দু'শর উপর। আর যদি তোমরা এক হাজার হও, তবে আল্লাহর হুকুম অনুযায়ী জয়ী হবে দু' হাজারের উপর। আর আল্লাহ রয়েছেন দৃঢ়চিত্ত লোকদের সাথে। (আনফাল ৬৫–৬৬)

তাফসীরঃ উক্ত আয়াতদ্বয়ের মধ্যে মুসলমানদের জন্য একটি যুদ্ধ নীতির আলোচনা করা হয়েছে যে, যুদ্ধ ক্ষেত্রে প্রতিপক্ষের মোকাবেলায় তাদেরকে কতটা দৃঢ়তা অবলম্বন করা ফরয এবং কোন পর্যায়ে পশ্চাদপসরণ করা পাপ। পূর্ববর্তী আয়াত ও ঘটনার বিবরণে এর বিশদ আলোচনা এসে গেছে যে, আল্লাহর গায়েবী সাহায্য মুসলমানদের সাথে থাকে বলে তাদের ব্যাপারটি পৃথিবীর সাধারণ জাতি সম্প্রদায়ের মত নয়; এদের অল্প সংখ্যক ও অধিক সংখ্যকের উপর বিজয় অর্জন করতে পারে। যেমন, কুরআন কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

كَمْ مِنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةً بِاِذْنِ اللّٰهِ

অর্থাৎ, বহু স্বল্পসংখ্যক দল আল্লাহর হুকুমে অধিক সংখ্যক প্রতিপক্ষের উপর বিজয় অর্জনে সক্ষম হয়ে যায়।

সেজন্যই ইসলামের সর্বপ্রথম জেহাদ বদর যুদ্ধে দশজন মুসলমানকে একশ' লোকের সমান সাব্যস্ত করে এই নির্দেশ দেয়া হয়েছে যে, "তোমাদের মধ্যে যদি বিশজন দৃঢ়চিত্ত লোক থাকে, তাহলে দু'শ শত্রুর উপর জয়ী হয়ে যাবে। আর তোমরা যদি একশ' জন হও, তবে এক হাজার কাফেরের বিরুদ্ধে জয়ী হবে।"

এতে সংবাদ আকারে বর্ণনা করা হয়েছে যে, একশ' মুসলমান এক হাজার কাফেরের বিরুদ্ধে জয় অর্জন করবে। কিন্তু এর উদ্দেশ্য হল এই নির্দেশ দান যে, একশ' মুসলমানকে এক হাজার কাফেরের মোকাবেলা করতে গিয়ে পালিয়ে যাওয়া জায়েয নয়। এর কারণ, যাতে মুসলমানদের মন এ সুসংবাদে দৃঢ় হয়ে যায় যে, আল্লাহ্ আমাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও বিজয়ের ওয়াদা করেছেন। যদি নির্দেশাত্মক বাক্যের মাধ্যমে এ হুকুম দেয়া হতো, তবে প্রকৃতিগতভাবেই তা ভারী বলে মনে হতে পারত।

ইসলামের প্রাথমিক পর্যায়ের যুদ্ধ-গযওয়ায়ে বদর এমন এক অবস্থায় সংঘটিত হয়েছিল, যখন মুসলমানদের সংখ্যা ছিল নিতান্ত অল্প। তাও আবার সবাই যুদ্ধ ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিলেন না। বরং জরুরী ভিত্তিতে যারা তৈরী হতে পেরেছিলেন শুধু তারাই এ যুদ্ধে সৈনিক হয়েছিলেন। কাজেই এ যুদ্ধে একশ' মুসলমানকে এক হাজার কাফেরের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করার নির্দেশ দেয়া হয় এবং এমনই ভঙ্গিতে দেয়া হয়, যার সাথে সাহায্যের ওয়াদাও বিদ্যমান থাকে।

দ্বিতীয় আয়াতে পরবর্তীকালের জন্য এ নির্দেশ রহিত করে দ্বিতীয় নির্দেশ জারী করা হয় যে–

'এখন আল্লাহ তাআলা হালকা করে দিয়েছেন এবং তিনি জেনেছেন যে, তোমাদের মধ্যে সাহসের কমতি দেখা দিয়েছে। কাজেই তোমাদের মধ্যে যদি একশ লোক দৃঢ়চিত্ত থাকে, তবে তারা দু'শ লোকের উপর জয়ী হবে।'

এখানেও উদ্দেশ্য হল এই যে, একশ' মুসলমানের পক্ষে দু'শ কাফেরের মোকাবেলা করতে গিয়ে পালিয়ে আসা জায়েয নয়। প্রথম

আয়াতে একজন মুসলমানের জন্য দশজন কাফেরের মোকাবেলা থেকে পালিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ বলে সাব্যস্ত করা হয়েছিল। আর এ আয়াতে একজন মুসলমানকে দু'জন কাফেরের মোকাবেলা থেকে পালিয়ে আসা নিষিদ্ধ ঘোষনা করা হয়েছে। বস্তুতঃ এটাই হল এ প্রসঙ্গে সর্বশেষ নির্দেশ, যা সর্বকালেই বলবৎ থাকবে।

এখানেও নির্দেশকে নির্দেশ আকারে নয়; বরং সংবাদ ও সুসংবাদ আকারে বর্ণনা করা হয়েছে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, একজন মুসলমানের জন্য দু'জন কাফেরের বিরুদ্ধে অটল থাকার নির্দেশ দান (নাউযুবিল্লাহ) কোন রকম অন্যায় কিংবা জবরদস্তিমূলক নয়; বরং আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের মধ্যে তাদের ঈমানের বদৌলতে এমন শক্তি দিয়ে রেখেছেন যে, তারা একজনই দুজনের সমান হয়ে থাকে।

কিন্তু উভয় ক্ষেত্রেই সাহায্য-সহায়তা দানের সুসংবাদটি এই শর্তের সাথে সংযুক্ত করে দেয়া হয়েছে যে, এসব মুসলমান্‌কে দৃঢ়চিত্ত হতে হবে। বলা বাহুল্য যুদ্ধ ক্ষেত্রে নিজের প্রাণকে বিপদের সম্মুখিন করে দিয়ে দৃঢ়চিত্ত থাকা শুধুমাত্র তাদেরই পক্ষে সম্ভব যাদের পরিপূর্ণ ঈমান থাকবে। কারণ, পরিপূর্ণ ঈমান মানুষকে শাহাদাতের প্রেরণায় অনুপ্রাণিত করে। আর এই অনুপ্রেরণা তাদের শক্তিকে বহু গুণে বাড়িয়ে দেয়। আয়াতের শেষ ভাগে সাধারণ নীতি আকারে বলা হয়েছে—

اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ

অর্থাৎ, আল্লাহ তাআলা দৃঢ়চিত্ত লোকদের সাথে রয়েছেন। এতে যুদ্ধ ক্ষেত্রে দৃঢ়তা অবলম্বনকারীও অন্তর্ভুক্ত এবং শরী'অতের সাধারণ হুকুম-আহকামের অনুবর্তিতায় দৃঢ়তা অবলম্বনকারীরাও শামিল। তাদের সবার জন্যই আল্লাহ তাআলার সঙ্গ দানের এ প্রতিশ্রুতি। আর এই খোদায়ী সঙ্গই প্রকৃতপক্ষে তাদের কৃতকার্যতা ও বিজয়ের মূল রহস্য। কারণ, যে ব্যক্তি একক ক্ষমতার অধিকারী পরওয়ারদেগারের সঙ্গ লাভে সমর্থ হবে, তাকে সারা বিশ্বের সমবেত শক্তিও নিজের জায়গা থেকে এক বিন্দু নাড়াতে পারে না। (মাআরেফুল কুরআন ৪/৩৫২)

কুফর প্রধানদের সাথে যুদ্ধ কর

ইরশাদ হয়েছে–

وَإِنْ نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ لا إِنَّهُمْ لاَأَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ (١٢) أَلاَ تُقَاتِلُونَ قَوْمًا نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ وَهَمُّوا بِإِخْرَاجِ الرَّسُولِ وَهُمْ بَدَءُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ ط أَتَخْشَوْنَهُمْ ج فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (١٣) قَاتِلُوهُمْ يُعَذِّبْهُمُ اللَّهُ بِأَيْدِيكُمْ وَيُخْزِهِمْ وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ (١٤) وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ ط وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ (١٥) أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلاَ رَسُولِهِ وَلاَ الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً ط وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ (١٦) (التوبة: ١٢-١٦)

তরজমাঃ (১২) আর যদি ভঙ্গ করে তারা তাদের শপথ-প্রতিশ্রুতির পর এবং বিদ্রূপ করে তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে, তবে কুফর প্রধানদের সাথে যুদ্ধ কর। কারণ, এদের কোন শপথ নেই, যাতে তারা ফিরে আসে। (১৩) তোমরা কি সেই দলের সাথে যুদ্ধ করবে না; যারা ভঙ্গ করেছে নিজেদের শপথ এবং সংকল্প নিয়েছে রাসূলকে বহিষ্কারের? আর এরাই প্রথমে তোমাদের সাথে বিবাদের সূত্রপাত করেছে। তোমরা কি তাদের ভয় কর? অথচ তোমাদের ভয়ের অধিকতর যোগ্য হলেন আল্লাহ। যদি তোমরা মুমিন হও। (১৪) যুদ্ধ করো ওদের সাথে, আল্লাহ তোমাদের হস্তে তাদের শাস্তি দিবেন। তাদের লাঞ্ছিত করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয়ী করবেন এবং মুসলমানদের অন্তরসমূহ শান্ত করবেন। (১৫) এবং তাদের মনের ক্ষোভ দূর করবেন। আর আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা ক্ষমাশীল হবেন, আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (১৬) তোমরা কি মনে কর যে, তোমাদের ছেড়ে দেয়া হবে এমনি, যতক্ষণ না আল্লাহ জেনে নেবেন তোমাদের কে যুদ্ধ করেছে এবং কে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল ও মুসলমানদের ব্যতীত অন্য কাউকে অন্তরঙ্গ

বন্ধুরূপে গ্রহণ করা থেকে বিরত রয়েছে। আর তোমরা যা কর সে বিষয়ে আল্লাহ্ সবিশেষ অবহিত। (সূরা তাওবা ১২–১৬ আয়াত)

তাফসীরঃ ষষ্ঠ হিজরীতে হুদায়বিয়ায় মক্কার যে কুরাইশদের সাথে যুদ্ধ স্থগিত রাখার সন্ধি হয়েছিল, তাদের ব্যাপারে সূরা তাওবার শুরুর আয়াতগুলোতে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয় যে, তারা সন্ধি চুক্তির উপর অবিচল থাকবে না। অতঃপর অষ্টম, নবম ও দশম আয়াতে তাদের চুক্তি ভঙ্গের কারণ সমূহ বর্ণিত হয়। একাদশ আয়াতে বলা হয় যে, চুক্তি ভঙ্গের ভীষণ অপরাধে অপরাধী হলেও তারা যদি মুসলমান হয় এবং ইসলামকে নামায ও যাকাতের মাধ্যমে প্রকাশ করে, তবে অতীতের সকল তিক্ততা ভুলে যাওয়া ও তাদের ভ্রাতৃবন্ধনে আবদ্ধ করা মুসলমানদের কর্তব্য।

আলোচ্য দ্বাদশ আয়াতে বলা হচ্ছে যে, উক্ত ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক এরা যখন যুক্তি ভঙ্গ করে দিল, তখন এদের সাথে মুসলমানদের কি ব্যবহার করা উচিত। ইরশাদ হয়েছে–

وَاِنْ نَّكَثُوْا اَيْمَانَهُمْ مِّنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ فَقَاتِلُوْا اَئِمَّةَ الْكُفْرِ

অর্থাৎ, এরা যদি চুক্তি সম্পাদনের পর শপথ ও প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করে এবং ইসলাম গ্রহণ না করে। অধিকন্তু ইসলামকে নিয়ে বিদ্রূপ করে, তবে সেই কুফর প্রধানদের সাথে যুদ্ধ কর।

যিম্মীদের বিদ্রূপ অসহ্য

وَطَعَنُوْا فِىْ دِيْنِكُمْ

'এবং বিদ্রূপ করে তোমাদের দ্বীন সম্পর্কে' বাক্য থেকে কতিপয় আলেম প্রমাণ করেন যে, মুসলমানদের ধর্মের প্রতি বিদ্রূপ করা চুক্তি ভঙ্গের নামান্তর। যে ব্যক্তি ইসলাম ও ইসলামী শরী'অতকে নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে, তাকে চুক্তি রক্ষাকারী বলা যাবে না। তবে মাননীয় ফকীহবৃন্দের ঐক্যমতে আলোচ্য বিদ্রূপ হল তা, যা ইসলাম ও মুসলমানদের হেয় করার উদ্দেশ্য প্রকাশ্যরূপে করা হয়।

আয়াতের শেষ বাক্য হল- لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ 'যাতে তারা ফিরে আসে।' এতে বলা হয়েছে যে, মুসলমানদের যুদ্ধ-বিগ্রহের উদ্দেশ্য অপরাপরজাতির মত শত্রু নির্যাতন ও প্রতিশোধ স্পৃহা নিবারণ, কিংবা সাধারণ রাষ্ট্রনায়কগণের মত নিছক দেশ দখল না হওয়া চাই। বরং তাদের যুদ্ধের উদ্দেশ্য হওয়া চাই শত্রুদের মঙ্গল কামনা ও সহানুভূতি এবং বিপথ থেকে তাদের ফিরিয়ে আনা।

অতঃপর ত্রয়োদশ আয়াতে মুসলমানদের জিহাদের প্রতি উৎসাহ দিয়ে বলা হয়, তোমরা সেই জাতির সাথে যুদ্ধ করবে না কেন? যারা তোমাদের নবীকে দেশান্তরিত করার পরিকল্পনা নিয়েছে। এরা হল মদীনার ইয়াহুদী অধিবাসী। এদের সদম্ভ ঘোষণা-

لَيُخْرِجَنَّ الْاَعَزُّ مِنْهَا الْاَذَلَّ

'সম্মানী ও ক্ষমতাবান লোকেরা অবশ্যই মদীনা থেকে নীচু লোকদের বহিষ্কার করবে।'

এদের দৃষ্টিতে সম্মানী লোক হল তারা নিজেরা আর নীচু ও দুর্বল লোক হল মুসলমান! যার পরিণতি স্বরূপ আল্লাহ তাদেরই দম্ভোক্তিকে অচিরেই এভাবে সত্য করে দেখান যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সাহাবীগণ মদীনা থেকে ইয়াহুদীদের সমূলে উৎখাত করেন। এতে দেখান হয় যে, সম্মানী ও শক্তিবান হল মুসলমান এবং নীচু প্রকৃতির হল ইয়াহুদীরা।

وَهُمْ بَدَءُوكُمْ اَوَّلَ مَرَّةٍ

'তারাই প্রথমে বিবাদের সূত্রপাত করেছে'

বাক্যে যুদ্ধের দ্বিতীয় কারণ প্রদর্শন করা হয়। অর্থাৎ বিবাদের সূত্রপাত যখন তারা করেছে, তখন তোমাদের কাজ হবে প্রতিরোধ ব্যূহ গড়ে তোলা। আর এটা সুস্থ বিবেকেরই দাবী।

এরপর মুসলমানদের অন্তর থেকে কাফেরদের ডর-ভয় দুর করার জন্যে বলা হয়েছে-

اتخشونهم فالله احق ان تخشوه

তোমরা কি তাদের ভয় কর? অথচ একমাত্র আল্লাহ্‌কে ভয় করা উচিত। যাঁর আযাব রোধ করার ক্ষমতা কারো নেই। পরিশেষে إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِيْنَ 'যদি তোমরা মুমিন হও' বাক্য সংযোজন করে বলা হয় যে, শরী'অতের হুকুম তা'মিলে বাধা হয়– গায়রুল্লাহর এমন ভয় অন্তরে স্থান দেয়া মুসলমানের শান নয়।

চতুর্দশ ও পঞ্চদশ আয়াতে ভিন্ন কায়দায় মুসলমানদের প্রতি জেহাদের উৎসাহ দেয়া হয়েছে– এতে কতিপয় জানার বিষয় রয়েছে।

প্রথমতঃ কাফেরদের সাথে যুদ্ধের পূর্ণ প্রস্তুতি নিলে আল্লাহর সাহায্য অবশ্যই এসে পড়বে। আর এই কাফের জাতি নিজেদের কৃত কর্মের ফলে আল্লাহ তাআলার আযাবের উপযুক্ত হয়ে রয়েছে। তবে পূর্ববর্তী উম্মতগণের মত তাদের উপর আসমান বা যমীন থেকে আল্লাহ তাআলার আযাব আসবে না; বরং يُعَذِّبْهُمُ اللّٰهُ بِاَيْدِيْكُمْ তোমাদের হস্তেই আল্লাহ তাদের উপযুক্ত শাস্তি দেবেন।

দ্বিতীয়তঃ এই যুদ্ধের ফলে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের অন্তর থেকে সে সমুদয় চিন্তা-ক্লেশ দূর করবেন যা কাফেরদের দ্বারা প্রতিনিয়ত পৌছতে ছিল।

তৃতীয়তঃ কাফেরদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ ও বিশ্বাসঘাতকতার ফলে মুসলমানদের মনে যে তীব্র ক্রোধের সঞ্চার হয়েছিল, আল্লাহ তা প্রশমিত করবেন, তাদের দ্বারা শাস্তি দিয়ে।

পূর্ববর্তী আয়াতে لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُوْنَ যাতে তারা ফিরে আসে, বাক্য দ্বারা মুসলমানদের হেদায়েত করা হয় যে, প্রতিশোধের নেশার উদ্দেশ্যে যেন কোন জাতির সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ না হয়; বরং উদ্দেশ্য হবে তাদের আত্মশুদ্ধি ও সৎপথ প্রদর্শন। আর এ আয়াতে বলা হয় যে, মুসলমানেরা যদি নিজেদের নিয়তকে আল্লাহর জন্য শুদ্ধ করে নেয় এবং শুধু আল্লাহর ওয়াস্তে যুদ্ধ করে, তবে আল্লাহ নিজ গুণে তাদের ক্রোধ প্রশমনের কোন ব্যবস্থা করবেন।

চতুর্থঃ আয়াতে একটি বাক্য হল– وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ 'আর আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা ক্ষমাশীল হবেন। অর্থাৎ তাদের তাওবা কবুল করবেন। এ বাক্য দ্বারা জিহাদের আর একটি উপকার প্রতীয়মান হয়। তা হল শত্রু দলের অনেকের ইসলাম গ্রহণের তাওফীক হবে এবং তারা মুসলমান হবে। তাই দেখা যায়, মক্কা বিজয় কালে সেখানে অনেক দুষ্ট কাফের লাঞ্ছিত ও অপমানিত হয়েছে।

উপরোক্ত আয়াতসমূহে যে সকল অবস্থা ও ঘটনার ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী একের পর এক সকল ঘটনা বাস্তব সত্যে পরিণত হয়েছে। সেজন্য এ আয়াতগুলো বহু মু'জিযা সম্বলিত রয়েছে, সন্দেহ নেই। (মাআরেফুল কুরআন ৪/৪০৫)

করজোড়ে জিযিয়া প্রদান করা পর্যন্ত তোমরা যুদ্ধ কর

ইরশাদ হয়েছে–

قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صَاغِرُوْنَ (التوبة: ٢٩)

তরজমাঃ তোমরা যুদ্ধ কর আহলে কিতাবের ঐ লোকদের সাথে যারা আল্লাহ ও আখেরাতে ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না করজোড়ে তারা জিযিয়া প্রদান করে। (তাওবা ২৯)

তাফসীরঃ উক্ত আয়াতে আল্লাহ তাআলা আহলে কিতাবের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন। তবে উক্ত নির্দেশ শুধু আহলে কিতাবের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়। বরং এ আদেশ রয়েছে সকল কাফের সম্প্রদায়ের জন্যই। কারণ, যুদ্ধ করার যে সকল হেতু সামনে বর্ণিত হয়েছে, তা সকল কাফেরদের মধ্যে সমভাবে বিদ্যমান। সুতরাং এ আদেশ সকলের জন্যই প্রযোজ্য। তবে বিশেষভাবে আহলে কিতাবের উল্লেখ করা হয়, মুসলমানদের এ দ্বিধা নিবারণ উদ্দেশ্যে যে, ইয়াহুদী-খ্রীষ্টানেরা অন্ততঃ তাওরাত, ইঞ্জিল

এবং হযরত মুসা ও ঈসা (আঃ)-এর প্রতি তো ঈমান রাখে। অতএব পূর্বের আম্বিয়া (আঃ) ও কিতাবের সাথে তাদের সম্পর্ক থেকে মুসলমানের জিহাদী মনোভাবের জন্য বাধা হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। তাই বিশেষভাবে তাদের উল্লেখ করা হয়।

দ্বিতীয়তঃ বিশেষভাবে তাদের উল্লেখ করার মাঝে এ ইঙ্গিতও রয়েছে যে, তারা এক দৃষ্টিকোণে অধিক শাস্তির যোগ্য। কারণ এরা অপেক্ষাকৃত জ্ঞানী। এদের কাছে আছে তাওরাত-ইঞ্জিলের জ্ঞান, যে তাওরাত ও ইঞ্জিলে রয়েছে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পর্কিত ভবিষ্যদ্বাণী। এমনকি তাঁর দৈহিক আকৃতির বর্ণনা। এতদসত্ত্বেও তাদের সাথে যুদ্ধের আদেশ দেয়া হয়।

প্রথম আয়াতে যুদ্ধের চারটি হেতুর বর্ণনা রয়েছে।

প্রথমতঃ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللّٰهِ তারা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখে না।

দ্বিতীয়তঃ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ আখেরাতের প্রতিও তাদের বিশ্বাস নেই।

তৃতীয়তঃ لَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ আল্লাহর হারামকৃত বস্তুকে তারা হারাম মনে করে না।

চতুর্থতঃ لَا يَدِيْنُوْنَ دِيْنَ الْحَقِّ সত্য ধর্ম গ্রহণে তারা অনিচ্ছুক।

এখানে প্রশ্ন জাগে, ইয়াহুদী-খ্রীষ্টানেরাতো বাহ্যতঃ আল্লাহ, পরকাল ও রোজ কিয়ামতের প্রতি বিশ্বাসী নয়। যে ঈমান-বিশ্বাস আল্লাহর অভিপ্রেত, তা না হলে তার কোন মূল্য নেই। ইয়াহুদী-খ্রীষ্টানেরা যদিও প্রকাশ্যে আল্লাহর একত্বকে অস্বীকার করে না, কিন্তু পরবর্তী আয়াতের বর্ণনা মতে ইয়াহুদী কর্তৃক হযরত ওযাইর (আঃ) ও খ্রীষ্টান কর্তৃক হযরত ঈসা (আঃ)কে আল্লাহর পুত্র সাব্যস্ত করে। প্রকারান্তরে শিরক তথা অংশীবাদকে স্বীকার করে নিয়েছে। তাই তাদের তাওহীদ ও ঈমানের দাবী হল অসাড়।

অনুরূপ, আখেরাতের প্রতি যে ঈমান বিশ্বাস রাখা আবশ্যক তা আহলে কিতাবের অধিকাংশের মধ্যে নেই। তাদের অনেকের ধারণা হল, রোজ কিয়ামতে মানুষ জড় দেহ নিয়ে উঠবে না; বরং তা হবে মানুষের এক ধরনের

রূহানী যিন্দেগী। তারা এ ধারণাও পোষণ করে যে, জান্নাত ও জাহান্নাম বিশেষ কোন স্থানের নাম নয়; বরং আত্মার শান্তি হল জান্নাত। তাদের এ বিশ্বাস কুরআনের পেশকৃত ধ্যান-ধারণার বরখেলাফ। সুতরাং আখেরাতের প্রতি ঈমান ও তাদের যথাযোগ্য নয়।

তৃতীয় হেতুর উল্লেখ করে বলা হয় যে, ইয়াহুদী-খ্রীষ্টানেরা আল্লাহর হারামকৃত বস্তুকে হারাম মনে করে না। এ কথার অর্থ হল তাওরাত ও ইঞ্জিলে যে সকল বস্তুকে হারাম করে দেয়া হয়, তারা হারাম বলে গণ্য করে না। যেমন সূদ ও কতিপয় খাদ্য-দ্রব্য যা তাওরাত ও ইঞ্জিলে হারাম ছিল, তারা সেগুলোকে হারাম মনে করত না।

এ থেকে একটি মাসআলা পরিষ্কার হয় যে, আল্লাহর নিষিদ্ধ বস্তুকে হালাল মনে করা যে শুধু পাপ, তা নয় বরং কুফরীও বটে। অনুরূপ কোন হালাল বস্তুকে হারাম সাব্যস্ত করাও কুফরী।

আয়াতে উল্লেখিত– حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ وَّهُمْ صَاغِرُوْنَ 'যতক্ষণ না তারা করজোড়ে জিযিয়া প্রদান করে' বাক্য দ্বারা যুদ্ধ-বিগ্রহের একটি সীমা ঠিক করে দেয়া হয়। অর্থাৎ তাবেদার প্রজারূপে জিযিয়া প্রদান করা পর্যন্ত তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে। (মাআরেফুল কুরআন ৪/৪৪৩)

মুশরিকদের সাথে যুদ্ধ কর

ইরশাদ হয়েছে–

اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ط ذٰلِكَ الدِّيْنُ الْقَيِّمُ لا فَلَا تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ اَنْفُسَكُمْ وَقَاتِلُوا الْمُشْرِكِيْنَ كَآفَّةً كَمَا يُقَاتِلُوْنَكُمْ كَآفَّةً ط وَاعْلَمُوْا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ (التوبة: ٣٦)

তরজমাঃ নিশ্চয়ই আল্লাহর বিধান ও গণণায় মাস বারটি। আসমান সমূহ ও পৃথিবীর সৃষ্টির দিন থেকে। তন্মধ্যে চারটি সম্মানিত। এটিই সুপ্রতিষ্ঠিত বিধান। সুতরাং এর মধ্যে তোমরা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করো না। আর

মুশরিকদের সাথে তোমরা যুদ্ধ কর সমবেতভাবে। যেমন, তারাও তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে যাচ্ছে সমবেতভাবে। আর মনে রেখ আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছে। (তাওবা ৩৬)

তাফসীরঃ আমাদের শরী'অতসহ পূর্ববর্তী সকল নবীর শরী'অতসমূহে বার চন্দ্র মাসে এক বছর গণনা করা হত এবং তন্মধ্যে চারটি মাস– যিলকদ, যিলহজ্জ, মুহাররম ও রজব মাসকে বড়ই বরকতময় ও সম্মানিত মনে করা হত।

সকল নবীর শরী'অত এ ব্যাপারে একমত যে, এ চার মাসে যে কোন ইবাদতের সওয়াব বহু গুণে বৃদ্ধি পায়। তেমনই এ সময়ে পাপাচার করলে তার পরিণাম এবং আযাবও কঠোরভাবে ভোগ করতে হবে। পূর্ববর্তী শরী'অতসমূহে এ চার মাসে যুদ্ধ-বিগ্রহও নিষিদ্ধ ছিল। কিন্তু কাফের-মুশরিকরা মাসের নাম পরিবর্তন-পরিবর্ধন ও অদল-বদল করে নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হত। তাই আল্লাহ তাআলা তাদের নিন্দাববাদের বর্ণনা করে আয়াতের শেষাংশে সূরা তাওবার শুরুতে প্রদত্ত আদেশের পুনরাবৃত্তি করেন। অর্থাৎ চুক্তির মেয়াদ শেষ হওয়ার পর সমস্ত কাফের-মুশরিকদের সাথে জিহাদ করাই ওয়াজিব। (মাআরেফুল কুরআন ৪/৪৫৬)

আল্লাহর পথে জান ও মাল দিয়ে জিহাদ কর

ইরশাদ হয়েছে–

يَاۤأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَالَكُمْ إِذَا قِيْلَ لَكُمُ انْفِرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ
اثَّاقَلْتُمْ إِلَى الْأَرْضِ ط أَرَضِيْتُمْ بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا مِنَ الْاٰخِرَةِ ج
فَمَا مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فِي الْاٰخِرَةِ إِلَّا قَلِيْلٌ (٣٨) إِلَّا تَنْفِرُوْا
يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا لا وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا
تَضُرُّوْهُ شَيْئًا ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (٣٩) إِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ
نَصَرَهُ اللّٰهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ
يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ج فَأَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ

عَلَيْهِ وَاَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلٰى
وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ (٤٠) اِنْفِرُوْا خِفَافًا
وَّثِقَالاً وَّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ
لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (٤١) (التوبة: ٣٨-٤١)

তরজমাঃ (৩৮) হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কি হল, যখন আল্লাহর পথে বের হওয়ার জন্যে তোমাদের বলা হয়, তখন মাটি জড়িয়ে ধর, তোমরা কি আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবনে পরিতুষ্ঠ হয়ে গেলে? অথচ আখেরাতের তুলনায় দুনিয়ার জীবনের উপকরণ অতি অল্প। (৩৯) যদি তোমরা বের না হও, তবে আল্লাহ তোমাদের মর্মন্তুদ আযাব দেবেন এবং অপর জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। (৪০) যদি তোমরা তাকে (রাসূলকে) সাহায্য না কর, তবে মনে রেখো, আল্লাহ তার সাহায্য করেছিলেন, যখন তাকে কাফেররা বহিষ্কার করেছিল। তিনি ছিলেন দু'জনের একজন, যখন তারা গুহার মধ্যে ছিলেন, তখন তিনি আপন সঙ্গীকে বললেন, বিষন্ন হইওনা আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।

অতঃপর আল্লাহ তার প্রতি স্বীয় সান্ত্বনা নাযিল করলেন এবং তাঁর সাহায্যে এমন বাহিনী পাঠালেন, যা তোমরা দেখনি। বস্তুতঃ আল্লাহ কাফেরদের মাথা নীচু করে দিলেন। আর আল্লাহর কথাই সদা সমুন্নত এবং আল্লাহ পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময়। (৪১) তোমরা বের হয়ে পড় স্বল্প বা প্রচুর সরঞ্জামের সাথে এবং জেহাদ কর আল্লাহর পথে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে, এটি তোমাদের জন্যে অতি উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পারে।

(সূরা তাওবা ৩৮–৪১)

তাফসীরঃ উপরোক্ত আয়াতসমূহে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক পরিচালিত এক গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধের বর্ণনা এবং প্রসঙ্গে অনেকগুলো হুকুম ও পথ নির্দেশ উল্লেখ করা হয়েছে। তা হল তাবুক যুদ্ধ, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রায় সর্বশেষ যুদ্ধ।

'তাবুক' মদীনার উত্তর দিকে অবস্থিত সিরিয়া সীমান্তের নিকটবর্তী একটি জায়গার নাম। সিরিয়া ছিল তৎকালে রোমান সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয় ও হুনাইন যুদ্ধ সমাপণ করে যখন মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন, তখন আরব 'ব' দ্বীপের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল এবং মক্কার মুশরিকদের সাথে একটানা আট বৎসর যুদ্ধ চালিয়ে মুসলমানগণ এক স্বস্তির নিঃশ্বাস নেয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু যে রাব্বুল আলামীন ইতিপূর্বে সকল দ্বীনের উপর ইসলামের বিজয় সম্বলিত আয়াত– لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ। নাযিল করে সারা বিশ্বে ইসলামের বিজয় কেতন উড়ানোর সংবাদ দিয়েছেন, তাঁর পক্ষে অবসর যাপনের সময় কোথায়? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা পৌঁছা মাত্র সিরিয়া প্রত্যাগত যয়তুন তৈল ব্যবসায়ী দলের মুখে সংবাদ পেলেন যে, রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস সিরিয়ার সীমান্তবর্তী তাবুকে তার সেনাবাহিনী সমাবেশ করছে এবং এক বছরের অগ্রীম বেতন দিয়ে তাদের পরিতুষ্ঠ রেখেছে। আরও সংবাদ পাওয়া গেল যে, আরবের কতিপয় গোত্রের সাথেও তাদের যোগসাজশ রয়েছে। তাদের পরিকল্পনা হল, মদীনায় অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে সবকিছু তছনছ করে দিবে।

এ সংবাদ পেয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের আক্রমণের আগে ঠিক তাদের অবস্থান ক্ষেত্রে অভিযান পরিচালনার সংকল্প নিলেন।

ঘটনা চক্রে তখন ছিল গ্রীষ্মকাল। মদীনার অধিবাসীরা সাধারণ কৃষিজীবী। তখন তাদের ফসল কাটার সময়– যা ছিল তাদের গোটা বছরের জীবিকা। বলা বাহুল্য, চাকুরী জীবিদের অর্থ-কড়ি যেমন মাস শেষে ফুরিয়ে আসে তেমনই নতুন মওসুমের আগে কৃষি জীবিদের গোলাও খালি হয়ে যায়। তাই একদিকে অভাব-অনটন; অন্যদিকে ঘরে ফসল তোলার আশা, তদুপরি গ্রীষ্মের প্রচণ্ড খরা, দীর্ঘ আট বছরের রণ ক্লান্ত মুসলমানদের জন্যে ছিল এক বিরাট পরীক্ষার বিষয়।

কিন্তু সময়ের দাবী উপেক্ষা করা যায় না। বিশেষতঃ এ যুদ্ধ হল সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের। আগেকার যুদ্ধগুলো সংঘটিত হয়েছিল নিজেদের সাধারণ মানুষের সাথে, কিন্তু বর্তমান যুদ্ধটি হবে রোমান সম্রাটের সুশিক্ষিত সেনাবাহিনীর সাথে। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার সকল মুসলমানকে যুদ্ধে বের হবার আদেশ দেন এবং আশ-পাশের অন্যান্য গোত্রগুলোকে এতে অংশ নেয়ার আহবান জানান।

যুদ্ধে অংশ গ্রহণের এ সাধারণ আহবান ছিল মুসলমানদের জন্যে অগ্নি পরীক্ষা এবং ইসলামের মৌখিক দাবীদার মুনাফিকদের সনাক্ত করার মোক্ষম উপায়। তাই এদের কথা বাদ দিলেও খোদ মুসলমানরাও অবস্থা বিশেষে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। একদল হল যারা কোনরূপ দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত হয়ে যায়। অপর দল ছিল যারা প্রথমে কিছু দ্বিধা-সংকোচের মধ্যে থাকলেও পরে প্রথম দলের সাথে শামিল হয়। এ দু' দল সম্পর্কে কুরআন বলে–

اَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِىْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْۢ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ

অর্থাৎ, 'তারা প্রশংসার যোগ্য, যারা তীব্র সংকটকালে তাঁর আনুগত্য করেছে, তাদের এক দলের অন্তরসমূহ বিচ্যুতির কাছাকাছি হওয়ার পরেও।'

তৃতীয় দল যারা প্রকৃত কোন ওজরের ফলে যুদ্ধে শরীক হতে পারেনি। কুরআন তাদের সম্পর্কে বলে–

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضٰى

অর্থাৎ দুর্বল ও পীড়িত লোকের জন্যে গোনাহের কিছু নেই। একথা বলে তাদের ওজর কবুল হওয়ার কথা প্রকাশ করা হয়।

চতুর্থ দল হল, যারা কোন ওজর-অসুবিধা ছাড়াই নিছক অলসতার দরুণ যুদ্ধ যাত্রা থেকে বিরত থাকে। এদের ব্যাপারে কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়েছে। যেমন– وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ যারা নিজেদের অপরাধ স্বীকার করেছে।

وَاٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِاَمْرِ اللّٰهِ – وَعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا

আয়াতগুলোতে উক্ত দলের অলসতার দরুণ শাস্তির হুমকি এবং পরিশেষে তাদের তাওবা কবুল হওয়ার সুসংবাদ রয়েছে।

পঞ্চম দল হল, মুনাফিকদের। এরা পরীক্ষার এই কঠিন মুহূর্তে নিজেদের আর লুকিয়ে রাখতে পারেনি। এরা যুদ্ধ থেকে দূরে সরে থাকে। কুরআনের আনেকগুলো আয়াতে এদের বর্ণনা রয়েছে।

ষষ্ঠদল মুনাফিকদের সেই উপদল, যারা গোয়েন্দাবৃত্তি ও বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশে মুসলমানদের কাতারে শামিল হয়ে যায়– وَفِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ (আঃ ৪৭) وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا (আয়াত ৬৫) এবং وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ (৭৪ আয়াত) সমূহে এ মুনাফেকদের বর্ণনা দেয়া হয়।

কিন্তু এ সকল প্রতিকূলতা সত্ত্বেও যুদ্ধে অনিচ্ছুক ব্যক্তিদের সংখ্যা ছিল নিতান্ত নগণ্য। সেই মুসলমানদের সংখ্যা ছিল বিপুল, যারা সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। তাই এ যুদ্ধে ইসলামী সৈন্যের সংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজার। যা ইতিপূর্বেকার কোন যুদ্ধে দেখা যায়নি।

এত বিপুল সংখ্যক মুসলমানদের যুদ্ধ যাত্রার সংবাদ রোম সম্রাটের কানে গেলে সে ভীষণভাবে সন্ত্রস্থ হয় এবং যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের নিয়ে কয়েক দিন রণক্ষেত্রে অবস্থান করার পর তাদের মোকাবেলার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

উপরোল্লেখিত আয়াতগুলোর সম্পর্ক বাহ্যতঃ সেই চতুর্থ দলের সাথে যারা ওজর-আপত্তি ছাড়া শুধু অলসতার দরুণ যুদ্ধ যাত্রা থেকে বিরত ছিল। প্রথম আয়াতে অলসতার জন্যে শাস্তি প্রদানের হুমকি, তৎসঙ্গে অলসতার মূল কারণ এবং পরে তার প্রতিকারের উপায় কি, তা বর্ণিত হয়। এ বর্ণনা থেকে যে বিষয়টি বিশেষভাবে পরিষ্কার হয়েছে তা হল, দুনিয়ার মোহ ও আখেরাতের প্রতি উদাসীনতা সকল অপরাধের মূল।

অলসতার যে কারণ ও প্রতিকার উপায় এখানে বর্ণিত হয়েছে, তা এক বিশেষ ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট হলেও চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে, দ্বীনের

ব্যাপারে সকল আলস্য ও নিষ্ক্রিয়তা ও সকল অপরাধ এবং গোনাহের মূলে রয়েছে দুনিয়ার প্রীতি ও আখেরাতের প্রতি উদাসীনতা।

হাদীস শরীফে আছে–

حب الدنيا رأس كل خطيئة

অর্থাৎ, দুনিয়ার মোহ সকল গোনাহের মূল। সেজন্য আয়াতে বলা হয়ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কি হল, আল্লাহর পথে বের হওয়ার জন্য বলা হলে তোমরা মাটি জড়িয়ে ধর (চলাফেরা করতে চাওনা)। আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবন নিয়েই কি পরিতুষ্ট হয়ে গেলে।"

রোগ নির্ণয়ের পর পরবর্তী আয়াতে তার প্রতিকার এই বলে উল্লেখ করা হয়ঃ "দুনিয়ার যিন্দেগীর ভোগের উপকরণ আখেরাতের তুলনায় অতি নগণ্য।"

যার সারকথা হল, আখেরাতের স্থায়ী জীবনের চিন্তা-ভাবনাই মানুষের করা উচিত। বস্তুতঃ আখেরাতের চিন্তা-ফিকিরই সকল রোগের একমাত্র প্রতিকার এবং অপরাধ দমনের স্বার্থক উপায়। (মাআরেফুল কুরআন ৪/৪৬৩)

দ্বিতীয় আয়াতে অলস ও নিষ্ক্রিয় লোকদের ব্যাধি ও তার প্রতিকারের উল্লেখ করে সর্বশেষ ফয়সালা জানিয়ে দেয়া হয়েছে যে, 'তোমরা জিহাদে বের না হলে আল্লাহ তোমাদের মর্মন্তুদ শাস্তি দেবেন এবং তোমাদের স্থলে অন্য জাতির উত্থান ঘটাবেন। আর দ্বীনের আমল থেকে বিরত হয়ে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করতে পারবে না। কেননা আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান।

তৃতীয় আয়াতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের ঘটনা উল্লেখ করে দেখিয়ে দেয়া হয় যে, আল্লাহর রাসূল কোন মানুষের সাহায্য-সহযোগিতার মুখাপেক্ষী নন। আল্লাহ প্রত্যক্ষভাবে গায়েব থেকে তাঁর সাহায্য করতে সক্ষম। যেমন, হিজরতের সময় করা হয়, তখন তাঁর আপন গোত্র ও দেশবাসী তাঁকে দেশত্যাগ করতে বাধ্য করে।

চতুর্থ আয়াতে তাকিদ দানের উদ্দেশ্যে পুনরুল্লেখ করা হয়েছে যে, জিহাদে বের হওয়ার জন্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তোমাদের আদেশ করেন, তখন সর্বাবস্থায় তা তোমাদের জন্যে ফরয হয়ে গেল। আর এ আদেশ পালনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে তোমাদের সমুদয় কল্যাণ।

পঞ্চম আয়াতে অলসতার দরুণ জিহাদ থেকে বিরত রয়েছে এমন লোকদের একটি ওজরকে প্রত্যাখ্যান করে বলা হয় যে, এ ওজর গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, আল্লাহ তাআলা যে শক্তি-সামর্থ্য তাদের দান করেছেন, তা আল্লাহর রাহে সাধ্যমত ব্যয় করেনি। তাই তাদের অসমর্থ থাকার ওজর গ্রহণযোগ্য নয়। (মাআরেফুল কুরআন ৪/৪৬৪)

কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করুন

ইরশাদ হয়েছে−

يَاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ ط وَمَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ ط وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ (التوبة: ٧٣)

তরজমাঃ হে নবী! কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করুন এবং মুনাফিকদের সাথে; তাদের সাথে কঠোরতা অবলম্বন করুন। তাদের ঠিকানা হল দোযখ এবং তা হল নিকৃষ্ট ঠিকানা। (তাওবা ৭৩)

তাফসীরঃ উক্ত আয়াতে কাফের ও মুনাফিক উভয় সম্প্রদায়ের সাথে জিহাদ করতে এবং তাদের ব্যাপারে কঠোর হতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রকাশ্যভাবে যারা কাফের তাদের সাথে জিহাদ করার বিষয়টি তো সুস্পষ্ট। কিন্তু মুনাফিকদের সাথে জিহাদ করার অর্থ স্বয়ং রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কর্ম ধারায় প্রমাণিত হয়েছে যে, তাদের সাথে জিহাদ করার মর্ম হল মৌখিক জিহাদ। অর্থাৎ, তাদেরকে ইসলামের সত্যতা উপলব্ধি করার জন্য আমন্ত্রণ জানাতে হবে, যাতে করে তারা ইসলামের দাবীতে নিষ্ঠাবান হয়ে যেতে পারে।

(কুরতুবী, মাযহারী, মাআরেফুল কুরআন ৪/৫১১)

মুসলমানের জান-মাল আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন

ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ ط يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ قف وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِي التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ ط وَمَنْ اَوْفٰى بِعَهْدِهٖ مِنَ اللّٰهِ فَاسْتَبْشِرُوْا بِبَيْعِكُمُ الَّذِيْ بَايَعْتُمْ بِهٖ ط وَذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ (التوبة: ١١١)

তরজমাঃ আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুসলমানদের থেকে তাদের জান ও মাল এই মূল্যে যে তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা যুদ্ধ করে আল্লাহর পথে, অতঃপর মারে ও মরে। তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা আনন্দিত হও সে লেনদেনের উপর, যা তোমরা করছ তাঁর সাথে। আর এ হল মহান সাফল্য। (তাওবা ১১১)

তাফসীরঃ উক্ত আয়াত নাযিল হয়েছে, বায়আতে আকাবায় অংশগ্রহণকারী লোকদের ব্যাপারে। এ বায়আত নেয়া হয় মক্কায় মদীনার আনসারদের থেকে দু'টি শর্তের উপর।

(১) আল্লাহর ব্যাপারে শর্তারোপ করছি যে, তোমরা সবাই তাঁরই ইবাদত করবে; তাঁকে ছাড়া কারো ইবাদত করবে না।

(২) আর আমার নিজের ব্যাপারে শর্ত হলো যে, তোমরা আমার হেফাযত করবে যেমন নিজের জান-মাল ও সন্তানদের হেফাযত কর। তাঁরা আরয করলেন এ শর্ত দুটি পূরণ করলে এর বিনিময়ে আমরা কি পাব? তিনি বললেন, জান্নাত। তাঁরা পুলকিত হয়ে বললেন, আমরা এর জন্য রাজি, এমন রাজি যে, নিজেদের পক্ষ থেকে এ চুক্তি রহিত করার আবেদন কোন দিন পেশ করব না এবং রহিত করণকে পছন্দও করব না।

বায়আতে আকাবার ব্যাপারটি দৃশ্যতঃ লেন-দেনের মত বিধায় এ সম্পর্কে অবতীর্ণ আয়াতে ক্রয়-বিক্রয় সংক্রান্ত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে।

إِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ

আয়াত শুনে সর্বপ্রথম হযরত বরা বিন মারুর আবুল হায়সম ও আসআদ রাযিয়াল্লাহু আনহুম নিজেদের হাত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হস্ত মুবারকের উপর রেখে বললেন, এ অঙ্গীকার পালনে আমরা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। আপনার হেফাযত করব নিজের পরিবার-পরিজন ও সন্তানদের মত। আর আপনার বিরুদ্ধে সমগ্র দুনিয়ার সাদা-কালো সবাই সমবেত হলেও আমরা সবার সাথে যুদ্ধ করে যাব।

জিহাদের সর্বপ্রথম আয়াত

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মক্কা শরীফে অবস্থান কালে এ পর্যন্ত যুদ্ধ-বিগ্রহ সম্পর্কিত কোন হুকুম নাযিল হয়নি। এটিই সর্বপ্রথম জিহাদ সংক্রান্ত আয়াত, যা মক্কা শরীফে অবতীর্ণ হয়। তবে এর উপর আমল শুরু হয় হিজরতের পরে। এরপর দ্বিতীয় আয়াত নাযিল হয়।

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ط وَإِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ (الحج ٣٩)

(অর্থাৎ, যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হল যাদের সাথে কাফেররা যুদ্ধ করে, কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে সক্ষম।) (সূরা হজ্জঃ ৩৯)

পূর্বে উল্লেখিত আয়াতে বর্ণিত–

يُقَاتِلُوْنَ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ وَعْدًا عَلَيْهِ حَقًّا فِى التَّوْرٰةِ وَالْاِنْجِيْلِ وَالْقُرْاٰنِ

(অর্থাৎ, তারা জিহাদ করে আল্লাহর পথে অতঃপর মারে ও মরে, তাওরাত, ইঞ্জিল ও কুরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল।) থেকে বুঝা যায় যে, জিহাদের হুকুম পূর্ববর্তী উম্মতগণের জন্যও সকল কিতাবে নাযিল হয়েছিল। ইঞ্জিলে (বাইবেলে) জিহাদের হুকুম নেই বলে যে কথা প্রচলিত রয়েছে, তা সম্ভবতঃ এজন্য যে, পরবর্তী খ্রীষ্টানরা ইঞ্জিলের যে বিকৃতি ঘটিয়েছে তার ফলে জিহাদের হুকুম সম্বলিত আয়াতগুলো খারিজ হয়ে যায়। আল্লাহ সর্বজ্ঞ। (মাআরেফুল কুরআন ৪/৫৬৬)

কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও

ইরশাদ হয়েছে–

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْنَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً ط وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُتَّقِيْنَ (التوبة: ١٢٣)

তরজমাঃ হে ঈমানদারগণ! তোমাদের নিকটবতী কাফেরদের সাথে যুদ্ধ চালিয়ে যাও এবং তারা তোমাদের মধ্যে কঠোরতা অনুভব করুক। আর জেনে রেখ আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন। (তাওবা-১২৩)

তাফসীরঃ পূর্ববতী আয়াতসমূহে ছিল জিহাদের প্রেরণা। আলোচ্য আয়াতে– يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قَاتِلُوْا

এর বিস্তারিত বিবরণ দেয়া হচ্ছে যে, কাফেররা দুনিয়ার সর্বত্র রয়েছে। তবে কোন নিয়মে তাদের সাথে জিহাদ করা হবে? এ আয়াতে বলা হচ্ছে যে, কাফেরদের মধ্যে যারা তোমাদের নিকটবর্তী প্রথমে তাদের সাথে জিহাদ করবে। নিকটবর্তী দুরকমের হতে পারে। (এক) অবস্থানের দিক দিয়ে অর্থাৎ, যারা তোমাদের নিকটে অবস্থানকারী, প্রথমে তাদের সাথে জেহাদ কর। (দুই) গোত্র, আত্মীয়তা ও সম্পর্কের দিক দিয়ে যারা নিকটবর্তী অন্যান্যদের আগে তাদের সাথে জিহাদ চালিয়ে যাও। কারণ ওদের কল্যাণ সাধনই ইসলামী জিহাদের উদ্দেশ্য। আর কল্যাণ সাধনের বেলায় আত্মীয়-স্বজন অগ্রগামী। যেমন– কুরআনে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদেশ দেয়া হয়েছে–

وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ

অর্থাৎ, হে রাসূল! নিজের নিকট আত্মীয়গণকে আল্লাহর আযাবের ভয় প্রদর্শন করুন। তাই তিনি এ আদেশ পালনে সর্বাগ্রে স্বগোত্রীয়দের সমবেত করে আল্লাহর বানী শুনিয়ে দেন। অনুরূপ, তিনি স্থান হিসাবে প্রথমে মদীনার আশ-পাশের কাফের তথা বনু-কুরাইযা, বনু নযীর ও খায়বর বাসীদের সাথে বুঝা-পড়া করেন। তারপর দূরবর্তী লোকদের সাথে জিহাদ করেন এবং

সবশেষে রোমানদের সাথে জিহাদের আদেশ আসে, যার ফলে তাবুক যুদ্ধ সংঘঠিত হয়।

وَلْيَجِدُوْا فِيْكُمْ غِلْظَةً

غلظة অর্থ কঠোরতা, শক্তিমত্তা। বাক্যের মর্ম হলো, কাফেরদের সাথে এমন ব্যবহার কর, যাতে তোমাদের কোন দুর্বলতা তাদের চোখে ধরা না পড়ে। (মাআরেফুল কুরআন-৪/৫৯৯)

আল্লাহর সাহায্য লাভের শর্ত

ইরশাদ হয়েছে–

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقٰتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا ط وَاِنَّ اللّٰهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ (٣٩) اَلَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِن دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ اِلَّآ اَنْ يَّقُوْلُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ط وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَّهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوٰتٌ وَّمَسٰجِدُ يُذْكَرُ فِيْهَا اسْمُ اللّٰهِ كَثِيْرًا ط وَلَيَنْصُرَنَّ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ ط اِنَّ اللّٰهَ لَقَوِيٌّ عَزِيْزٌ (٤٠) (الحج: ٣٩-٤٠)

তরজমাঃ (৩৯) যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হল তাদেরকে যাদের সাথে কাফেররা যুদ্ধ করে, কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম। (৪০) যাদেরকে তাদের ঘরবাড়ী থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে শুধু এই অপরাধে যে, তারা বলে আমাদের পালনকর্তা আল্লাহ। আল্লাহ যদি মানব জাতির একদলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন, তবে (খ্রীষ্টানদের) নির্জন গীর্জা, ইবাদত খানা, (ইয়াহুদীদের) উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত, যেগুলোতে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয়। আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন, যারা আল্লাহর সাহায্য করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, শক্তিধর। (হজ্জ ৩৯–৪০)

কাফেরদের বিরুদ্ধে জিহাদের প্রথম আদেশ

তাফসীর ঃ মক্কায় মুসলমানদের উপর কাফেরদের নির্যাতন চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। এমন কোন দিন যেত না যে, কোন না কোন মুসলমান

তাদের নিষ্ঠুর হাতে আহত ও প্রহৃত হয়ে না আসত। মক্কায় অবস্থানের শেষ দিনগুলোতে মুসলমানদের সংখ্যাও যথেষ্ট বৃদ্ধি পেয়েছিল। তারা কাফেরদের জুলুম ও অত্যাচার দেখে তাদের মোকাবিলায় যুদ্ধ করার অনুমতি চাইতেন। কিন্তু রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জওয়াবে বলতেনঃ সবর কর, আমাকে এখনও যুদ্ধের অনুমতি দেওয়া হয়নি। দীর্ঘ দশ বছর পর্যন্ত এমনিতর পরিস্থিতি অব্যাহত রইল। (কুরতুবী)

যখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা ত্যাগ করতে ও হিজরত করতে বাধ্য হন এবং হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁর সঙ্গী ছিলেন, তখন মক্কা থেকে বের হওযার সময় তাঁর মুখে এই বাক্য উচ্চারিত হয়–

اَخْرَجُوْا نَبِيَّهُمْ لَيَهْلِكُنَّ

অর্থাৎ এরা তাদের পয়গম্বরকে বহিষ্কার করেছে। এখন তাদের ধ্বংস অনিবার্য। এরই পরিপ্রেক্ষিতে মদিনায় পৌঁছার পর আলোচ্য আয়াত অবতীর্ণ হয়। (কুরতুবী)

তিরমিযী, নাসায়ী, ইবনে মাজাহ, ইবনে হাইয়্যান, হাকেম প্রমুখের রেওয়ায়েতে হযরত ইবনে আব্বাস বলেনঃ **এই প্রথম** আয়াত কাফেরদের সাথে যুদ্ধের ব্যাপারে অবতীর্ণ হল। ইতিপূর্বে সত্তরেরও বেশী আয়াতে যুদ্ধ নিষিদ্ধ করা হয়েছিল।

জিহাদের একটি হেকমত

وَلَوْ لَا دَفْعُ اللّٰهِ النَّاسَ এতে জিহাদ ও যুদ্ধের রহস্য এবং এটা যে নতুন নির্দেশ নয়, তা বর্ণনা করা হয়েছে। পূর্ববর্তী উম্মত ও পয়গম্বরদেরকে কাফেরদের মোকাবিলায় যুদ্ধের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এরূপ না করা হলে কোন মাযহাব ও ধর্মের অস্তিত্ব থাকত না এবং ধর্ম ও উপাসনালয় বিধ্বস্ত হয়ে যেত।

لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَّصَلَوَاتٌ وَّمَسَاجِدُ বিগত যামানায় যত ধর্মের ভিত্তি আল্লাহর পক্ষ থেকে এবং ওহীর মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এরপর রহিত হয়ে গেছে এবং পরিবর্তিত হয়ে কুফর ও শিরকে পরিণত হয়েছে,

সেই সব ধর্মের উপাসনালয় সমূহের নাম এই আয়াতে উল্লেখ করা হয়েছে। কেননা স্ব স্ব যামানায় তাদের উপাসনালয়গুলোর সম্মান ও সংরক্ষণ ফরয ছিল। আয়াতে সেই সব ধর্মের উপাসনালয়ের কথা উল্লেখ করা হয়নি, যেগুলোর ভিত্তি কোন সময়ই নবুওয়ত ও ওহীর উপর প্রতিষ্ঠিত ছিল না। যেমন, অগ্নি পূজারী অথবা মূর্তি পূজারী হিন্দু। কেননা তাদের ইবাদতখানা কোন সময়ই সম্মানার্হ ছিল না। صَوَامِعُ শব্দটি صَوْمَعَةٌ এর বহুবচন। এটা খ্রীষ্টানদের সংসার ত্যাগী দরবেশদের বিশেষ ইবাদতখানা। بِيَعٌ শব্দটি بِيْعَةٌ এর বহুবচন। খ্রীষ্টানদের সাধারণ গীর্জাকে بِيْعَةٌ বলা হয়। صَلَوَاتٌ শব্দটি صَلٰوتٌ এর বহুবচন। ইয়াহুদীদের ইবাদত খানাকে صَلَوَاتٌ এবং মুসলমানদের ইবাদত খানাকে مَسَاجِدُ বলা হয়।

আয়াতের উদ্দেশ্য এই যে, কাফেরদের সাথে জিহাদের আদেশ অবতীর্ণ না হলে কোন সময়েই কোন ধর্মের নিরাপত্তা থাকত না। মূসা (আঃ)-এর আমলে صَلَوَاتٌ, ঈসা (আঃ)-এর আমলে صَوَامِعُ ও بِيَعٌ এবং শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যামানায় মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত।

(কুরতুবী, মাআরেফুল কুরআন ৬/৩২৯)

আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ কর

ইরশাদ হয়েছে–

وَجَاهِدُوْا فِى اللّٰهِ حَقَّ جِهَادِهٖ (الحج ٧٨)

তরজমাঃ এবং তোমরা জিহাদ কর আল্লাহর পথে যেভাবে জেহাদ করা উচিত। (সূরা হজ্জ ৭৮)

তাফসীরঃ جِهَادٌ ও مُجَاهَدَةٌ অর্থ কোন লক্ষ্য অর্জনের জন্য পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করা এবং তজ্জন্য কষ্ট স্বীকার করা। কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও মুসলমানরা তাদের কথা, কর্ম ও সর্বপ্রকার সম্ভাব্য শক্তি ব্যয় করে। তাই এই যুদ্ধকেও জিহাদ বলা হয়। حَقَّ-جِهَادِهٖ এর অর্থ সম্পূর্ণ আল্লাহর ওয়াস্তে জিহাদ করা, তাতে জাগতিক নাম-যশ ও গনীমতের অর্থ লাভের লালসা না

থাকা। হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেনঃ حَقَّ جِهَادِهٖ এর অর্থ জিহাদে পূর্ণ শক্তি ব্যয় করা এবং কোন তিরস্কারকারীর তিরস্কারে কর্ণপাত না করা।

(মাআরেফুল কুরআন ৬/৩৫২)

যে ব্যবসা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দেয়

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُمْ مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ (١٠) تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ اِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ (١١) يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ وَمَسٰكِنَ طَيِّبَةً فِىْ جَنّٰتِ عَدْنٍ ط ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ (١٢) وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ ط وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِيْنَ (١٣) (الصف: ١٠-١٣)

তরজমাঃ (১০) হে মুমিনগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিব? যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দিবে। (১১) তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর পথে নিজেদের ধন-সম্পদ ও জীবন পণ করে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্যে উত্তম। যদি তোমরা বুঝ। (১২) তিনি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং জান্নাতে দাখেল করবেন। যার পাদদেশে ঝর্ণাসমূহ প্রবাহিত এবং বসবাসের জান্নাতে উত্তম বাসগৃহে। এটা মহা সাফল্য। (১৩) এবং আরও একটি অনুগ্রহ দিবেন, যা তোমরা পছন্দ কর। আল্লাহর পক্ষ থেকে সাহায্য ও আসন্ন বিজয়। মুমিনদেরকে সুসংবাদ দান করুন। (সূরা সফফ ১০–১৩)

তাফসীরঃ আল্লাহ্ পাকের ঘোষণা–

تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ

এই আয়াতে ঈমান এবং ধন-সম্পদ ও জীবন পণ করে জিহাদ করাকে বাণিজ্য আখ্যা দেয়া হয়েছে। কারণ বাণিজ্যে যেমন কিছু ধন-সম্পদ ও শ্রম

ব্যয় করার বিনিময়ে মুনাফা অর্জিত হয়, তেমনি ঈমান সহকারে আল্লাহর পথে জান ও মাল ব্যয় করার বিনিময়ে আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালের চিরস্থায়ী নে'আমত অর্জিত হয়। পরবর্তী আয়াতে তাই বলা হয়েছে, যে এই বাণিজ্য অবলম্বন করবে, আল্লাহ্ তাআলা তার গোনাহসমূহ মাফ করবেন এবং জান্নাতে উৎকৃষ্ট বাসগৃহ দান করবেন। এসব বাসগৃহে সর্বপ্রকার আরাম ও বিলাস-ব্যসনের সরঞ্জাম বিদ্যমান থাকবে। অতঃপর পরকালীন নি'আমতের সাথে কিছু ইহকালীন নে'আমতেরও ওয়াদা করা হয়েছে–

وَاُخْرٰى تُحِبُّوْنَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ

اُخْرٰى শব্দটি نِعْمَةٌ এর বিশেষণ। অর্থ এই যে, পরকালীন নে'আমত ও বাসগৃহ তো পাওয়া যাবেই; ইহকালেও একটি নগদ নে'আমত পাওয়া যাবে, তা হচ্ছে আল্লাহর সাহায্য ও আসন্ন বিজয়। অর্থাৎ, শত্রু দেশ বিজিত হওয়া। এখানে قَرِيْبٌ শব্দটি পরকালের বিপরীতে ধরা হলে ইসলামের সকল বিজয়ই এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আর যদি প্রচলিত قَرِيْبٌ ধরা হয়, তবে এর প্রথম অর্থ হবে খায়বর বিজয় এবং এরপর মক্কা বিজয়। تُحِبُّوْنَهَا অর্থাৎ, তোমরা এই নগদ নে'আমত খুব পছন্দ কর। কারণ, মানুষ স্বভাবগতভাবে নগদকে পছন্দ করে।

কুরআনে বলা হয়েছে– وَكَانَ الْاِنْسَانُ عَجُوْلاً অর্থাৎ মানুষ তড়িঘড়ি পছন্দ করে। এর অর্থ এই নয় যে, পরকালীন নে'আমত তাদের কাছে প্রিয় নয়। বরং অর্থ এই যে, পরকালের নে'আমততো তাদের প্রিয় কাম্যই, কিন্তু স্বভাবগতভাবে কিছু নগদ নে'আমতও তারা দুনিয়াতে চায়। তাও দেয়া হবে। (মাআরেফুল কুরআন ৬/৫০৪)

তাদের গর্দান মার

ইরশাদ হয়েছে–

فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ط حَتّٰى اِذَا اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ لا فَاِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا

ۚ ذٰلِكَ ۛ وَلَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ۗ وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ (محمد: ٤)

তরজমাঃ অতঃপর তোমরা যখন কাফেরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের গর্দান মার, অবশেষে যখন তাদেরকে পূর্ণরূপে পরাভূত কর তখন তাদেরকে শক্ত করে বেঁধে ফেল। অতঃপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর, না হয় তাদের নিকট থেকে মুক্তিপণ নাও। তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে যে পর্যন্ত না শত্রু পক্ষ অস্ত্র সমর্পণ করবে। এটাই বিধান, এটা এই জন্য যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের কতককে কতকের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান। যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়, আল্লাহ কখনই তাদের কর্ম বিনষ্ট করবেন না।

(সূরা মুহাম্মাদ ৪)

জিহাদ সিদ্ধ হওয়ার একটি হেকমত

তাফসীরঃ وَلَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ এ আয়াতে আল্লাহ তাআলা বলেছেন যে, মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে জিহাদের সিদ্ধতা প্রকৃত পক্ষে একটি রহমত। কেননা জিহাদকে আসমানী আযাবের স্থলাভিষিক্ত করা হয়েছে। কারণ কুফর, শিরক ও খোদাদ্রোহীতার শাস্তি পূর্ববর্তী উম্মতদেরকে আসমান ও যমীনের আযাব দ্বারা দেওয়া হয়েছে। উম্মতে মুহাম্মাদীর মধ্যে এরূপ হতে পারত, কিন্তু রাহমাতুল্লিল আলামীনের কল্যাণে এই উম্মতকে এ ধরনের আযাব থেকে মুক্ত রাখা হয়েছে এবং এর স্থলে জিহাদ সিদ্ধ করে দেয়া হয়েছে। এতে ব্যাপক আযাবের তূলনায় অনেক নমনীয়তা ও কল্যাণ নিহিত রয়েছে। জিহাদের প্রথম উপকারিতা এই যে, ব্যাপক আযাবে নারী-পুরুষ, আবাল-বৃদ্ধ-বণিতা নির্বিশেষে সমগ্র জাতি ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। পক্ষান্তরে জিহাদে নারী-শিশুরা নিরাপদে থাকেই, পরন্তু পুরুষ ও তারাই আক্রান্ত হয়, যারা আল্লাহর দ্বীনের হেফাযতকারীদের মোকাবিলায় যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবতরন করে। তাদের মধ্যেও সবাই নিহত হয় না, বরং অনেকের ইসলাম গ্রহণ করার তাওফীক হয়ে যায়। জিহাদের দ্বিতীয় উপকারিতা এই যে, এর মাধ্যমে

উভয়পক্ষের অর্থ্যাৎ মুসলমান ও কাফেরদের পরীক্ষা হয়ে যায় যে, কে আল্লাহ্র নির্দেশে নিজের জান ও মাল উৎসর্গ করতে প্রস্তুত হয় এবং কে অবাধ্যতা ও কুফরে অটল থাকে কিংবা ইসলামের উজ্জল প্রমাণাদি বুঝে ইসলাম কবুল করে। (মাআরেফুল কুরআনঃ ৮/১৪)

وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ

সূরার প্রারম্ভে বলা হয়েছে যে, যারা কুফরী ও শিরক করে এবং অপরকেও ইসলাম থেকে বিরত রাখে, আল্লাহ তাআলা তাদের সৎকর্ম সমূহ বিনষ্ট করে দিবেন। অর্থাৎ, তারা যেসব সদকা-খয়রাত ও জনহিতকর কাজ করে, শিরক ও কুফরের কারণে সেগুলোর কোন সাওয়াব তারা পাবে না। এর বিপরীতে আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয়, তাদের কর্ম বিনষ্ট হয় না; অর্থাৎ তারা কিছু গোনাহ করলেও সেই গোনাহের কারণে তাদের সৎকর্ম হ্রাস পায় না। বরং অনেক সময় তাদের সৎকর্ম তাদের গোনাহের কাফফারা হয়ে যায়।

سَيَهْدِيْهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ

এতে শহীদের জন্য দুটি নি'আমতের কথা বর্ণিত হয়েছে। (এক) আল্লাহ তাকে হেদায়েত করবেন। (দুই) তার সমস্ত অবস্থা ভাল করে দেবেন। অবস্থা বলে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের অবস্থা বোঝানো হয়েছে। দুনিয়াতে এই যে, যে ব্যক্তি জিহাদে যোগদান করে, সে শহীদ না হলেও শহীদের সাওয়াবের অধিকারী হবে। আখেরাতে এই যে, সে কবরের আযাব থেকে এবং হাশরের পেরেশানী থেকে মুক্তি পাবে। কিছু লোকের হক তার যিম্মায় থেকে গেলে আল্লাহ তাআলা হকদারদেরকে তার প্রতি রাজি করিয়ে তাকে মুক্ত করে দেবেন। (মাযহারী)

শহীদ হওয়ার পর হেদায়েত করা অর্থ এই যে, তাদেরকে 'মনযিলে মকসূদ' অর্থাৎ জান্নাতে পৌছে দেবেন। যেমন, কুরআনে জান্নাতীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা জান্নাতে পৌছে একথা বলবে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِى هَدَانَا لِهٰذَا

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলারই সমস্ত প্রশংসা, যিনি আমাদিগকে এ পর্যন্ত পৌছে দিয়েছেন।

وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ

এ হচ্ছে একটি তৃতীয় নি'আমত। অর্থাৎ, তাদেরকে কেবল জান্নাতেই পৌছানো হবে না; বরং তাদের অন্তরে আপনা-আপনি জান্নাতে নিজ নিজ স্থান ও জান্নাতের নি'আমত তথা হুর ও গেলমানের এমন পরিচয় সৃষ্টি হয়ে যাবে, যেমন তারা চিরকাল তাদের মধ্যেই বসবাস করত এবং তাদের সাথে পরিচিত ছিল। এরূপ না হলে অসুবিধা ছিল। কারণ, জান্নাত একটি নতুন জগৎ। সেখানে নিজ নিজ স্থান খুঁজে নেয়ার মধ্যেও সেখানকার বস্তু সমূহের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার মধ্যে সময় লাগত এবং বেশ কিছু কাল পর্যন্ত অপরিচিতির অনুভূতির কারণে মন অশান্ত থাকত।

হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ সেই আল্লাহর কসম! যিনি আমাকে সত্যধর্ম সহ প্রেরণ করেছেন। তোমরা দুনিয়াতে যেমন তোমাদের স্ত্রী ও গৃহকে চিন, তার চেয়েও বেশী জান্নাতে তোমাদের স্থান ও স্ত্রীদেরকে চিনবে এবং তাদের সাথে অন্তরঙ্গ হবে। (মাযহারী)

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, প্রত্যেক জান্নাতীর জন্যে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করা হবে। সে জান্নাতে তার স্থান বলে দেবে এবং সেখানকার সঙ্গিনীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দিবে। (মাআরেফুল কুরআন ৮/১৫)

পৃষ্ঠ প্রদর্শন করলে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পাবে

ইরশাদ হয়েছে–

قُلْ لِّلْمُخَلَّفِيْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ اِلٰى قَوْمٍ اُولِىْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَ ج فَاِنْ تُطِيْعُوْا يُؤْتِكُمُ اللّٰهُ اَجْرًا حَسَنًا ج وَاِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا (الفتح: ١٦)

তরজমাঃ গৃহে অবস্থানকারী মরুবাসীদেরকে বলে দিন, আগামীতে তোমরা এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতির সাথে যুদ্ধ করতে আহূত হবে। তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তারা মুসলমান হয়ে যায়। তখন যদি তোমরা নির্দেশ পালন কর, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম পুরস্কার দিবেন। আর যদি পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর যেমন ইতিপূর্বে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করেছ, তবে তিনি তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন। (সূরা ফাতাহ ১৬)

হুদায়বিয়ার সফর থেকে পশ্চাতে অবস্থানকারীদের কেউ কেউ পরে তাওবা করে খাঁটি মুসলমান হয়ে গিয়েছিল

তাফসীর ঃ হুদায়বিয়ার সফর থেকে যারা পশ্চাতে রয়ে গিয়েছিল, তাদের সবাইকে খায়বারের জিহাদে অংশগ্রহণ থেকে বিরত রাখা হয়েছিল। অথচ তাদের মধ্যে সবাই মুনাফিক ছিল না। কেউ কেউ মুসলমানও ছিল। কেউ কেউ যদিও মুনাফিক ছিল, কিন্তু পরবর্তীকালে তারা সাচ্চা ঈমানদার হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিল। তাই এ ধরনের লোকদের সন্তুষ্টির জন্যে পরবর্তী আয়াতসমূহ অবতীর্ণ হয়েছে। এসব আয়াতে তাদেরকে সান্ত্বনা দেয়া হয়েছে যে, আল্লাহর ওয়াদা অনুযায়ী খায়বর যুদ্ধ হুদায়বিয়ায় অংশ গ্রহণকারীদের জন্যই বিশেষভাবে নির্দিষ্ট করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু যারা খাঁটি মুসলমান এবং মনে-প্রাণে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে ইচ্ছুক, তাদের জন্যেও ভবিষ্যতে আরও সুযোগ-সুবিধা আসবে। এসব সুযোগের কথা কুরআন পাক একটি বিশেষ ভবিষ্যদ্বাণীর আকারে বর্ণনা করেছে। যা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর প্রকাশ পেয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

سَتُدْعَوْنَ اِلٰى قَوْمٍ اُولِىْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ

অর্থাৎ, এক সময় আসবে, যখন তোমাদেরকে জিহাদের দাওয়াত দেয়া হবে। এই জিহাদ একটি শক্তিশালী যোদ্ধা জাতির সাথে হবে। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে, এই জিহাদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় সংঘটিত হয়নি।

তাই কোন কোন তাফসীরবিদ বলেছেন যে, আয়াতে পারস্য ও রোম অর্থাৎ কেসরা ও কায়সারের জাতিসমূহ বোঝানো হয়েছে, যাদের বিরুদ্ধে হযরত ওমর ফারূক রাযিয়াল্লাহু আনহুর আমলে জেহাদ হয়েছে।

(কুরতুবী, মাআরেফুল কুরআন ৮/৭৫)

تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ يُسْلِمُوْنَ

অর্থাৎ সেই জাতির সাথে যুদ্ধ অব্যাহত থাকবে, যে পর্যন্ত না তারা আনুগত্যশীল হয়ে যায়, ইসলাম গ্রহণ করে অথবা ইসলামী রাষ্ট্রের বশ্যতা স্বীকার করে। (মাআরেফুল কুরআন ৮/৭৬)

কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ

ইরশাদ হয়েছে–

يٰاَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنٰفِقِيْنَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ وَمَأْوٰهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ (تحريم: ٩)

তরজমাঃ হে নবী! কাফের ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন। তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। সেটা কতইনা নিকৃষ্ট স্থান। (তাহরীম ৯)

তাফসীরঃ অর্থাৎ কাফেরদেদর সাথে তরবারীর মাধ্যমে এবং মুনাফিকদের সাথে মুখে ও বর্ণের মাধ্যমে জেহাদ করুন এবং তাদের প্রতি কঠোর হোন। দুনিয়াতে তারা এই শাস্তির যোগ্য হয়েছে এবং পরকালের তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। (মাআরেফুল কুরআন ৮/৫৯৮)

দ্বিতীয় অধ্যায়

জিহাদের ফযীলত ও মুজাহিদের মর্যাদা

আল্লাহ মুজাহিদদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন

ইরশাদ হয়েছে–

لَا يَسْتَوِى الْقٰعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ غَيْرُ اُولِى الضَّرَرِ وَالْمُجٰهِدُوْنَ
فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ط فَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ
بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ دَرَجَةً ط وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ط
وَفَضَّلَ اللّٰهُ الْمُجٰهِدِيْنَ عَلَى الْقٰعِدِيْنَ اَجْرًا عَظِيْمًا (٩٥) دَرَجٰتٍ مِّنْهُ
وَمَغْفِرَةً وَّرَحْمَةً ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا (٩٦) (النساء: ٩٥-٩٦)

তরজমাঃ (৯৫) গৃহে উপবিষ্ট মুসলমান যাদের কোন সঙ্গত ওজর নেই এবং ঐ মুসলমান যারা জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে সমান নয়। যারা জান ও মাল দ্বারা জিহাদ করে, আল্লাহ তাদের পদমর্যাদা বাড়িয়ে দিয়েছেন গৃহে উপবিষ্টদের তুলনায় এবং প্রত্যেকের সাথেই আল্লাহ কল্যাণের ওয়াদা করেছেন। আল্লাহ মুজাহিদদেরকে উপবিষ্টদের উপর মহান প্রতিদানে শ্রেষ্ঠ করেছেন। (৯৬) এগুলো তাঁর পক্ষ থেকে পদমর্যাদা, ক্ষমা ও করুণা! আল্লাহ ক্ষমাশীল ও করুণাময়। (সূরা নিসা ৯৫–৯৬)

জিহাদ সম্পর্কিত কতিপয় বিধান

তাফসীরঃ لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ উক্ত আয়াতে জিহাদের কতিপয় বিধান বর্ণিত হয়েছে– যারা কোনরূপ ওজর ব্যতিরেকে জিহাদে অংশ গ্রহণ করে না, তারা সেসব লোকের সমান হতে পারে না, যারা আল্লাহর পথে জান-মাল দিয়ে জিহাদ করে। আল্লাহ মুজাহিদদেরকে অমুজাহিদদের উপর পদমর্যাদায় শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। আয়াতে আরও বলা

হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা মুজাহিদ ও অমুজাহিদ উভয় পক্ষের কাছে উত্তম প্রতিদানের ওয়াদা করেছেন। জান্নাত ও মাগফেরাত উভয় পক্ষই লাভ করবে। তবে পদমর্যাদায় পার্থক্য থাকবে।

তাফসীরবিদগণ বলেন, এ আয়াত থেকে জানা গেল যে, সাধারণ অবস্থায় জিহাদ করা ফরজে কেফায়া। কিছু লোক এ ফরয আদায় করলে অবশিষ্ট সমস্ত মুসলমান দায়িত্বমুক্ত হয়ে যায়। তবে শর্ত এই যে, যারা জিহাদে লিপ্ত আছে, তাঁরা সে জিহাদের জন্যে যথেষ্ট হতে হবে। যদি যথেষ্ট না হয়, তবে পার্শ্ববর্তী মুসলমানদের উপর তাদের সাহায্য করা ফরযে আইন হয়ে যাবে।

আয়াতে كُلًّا وَعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى বলে যারা জিহাদ ছাড়া অন্যান্য ধর্মীয় কাজে নিয়োজিত থাকে, তাদেরকেও আশ্বস্ত করা হয়েছে। কিন্তু এ বিধান সাধারণ অবস্থার জন্যে। যখন কিছু সংখ্যক লোকের জেহাদ শত্রুদেরকে হটিয়ে দেওয়ার জন্যে যথেষ্ট হয়। যদি তাদের জিহাদ যথেষ্ট না হয়, সাহায্যকারী সৈন্যের প্রয়োজন হয়, তবে প্রথমে পার্শ্ববর্তী এলাকার মুসলমানদের উপর জিহাদ ফরযে আইনে পরিণত হয়ে যায়। তারাও যথেষ্ট না হলে তাদের পার্শ্ববর্তী মুসলমানদের উপর ফরযে-আইন হয়ে যায়। যদি তারাও যথেষ্ট না হয়, তবে অন্যান্য মুসলমান এমনকি পূর্ব ও পশ্চিমের প্রত্যেকটি মুসলমানের উপর জিহাদে অংশগ্রহণ করা ফরযে আইন হয়ে যায়। (মাআরেফুল কুরআন ২/৫৯৭)

শত্রুর পশ্চাদ্ধাবনে শৈথিল্য করো না

ইরশাদ হয়েছে−

وَلَا تَهِنُوْا فِى ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ؕ اِنْ تَكُوْنُوْا تَأْلَمُوْنَ فَاِنَّهُمْ يَأْلَمُوْنَ كَمَا تَأْلَمُوْنَ ۚ وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللّٰهِ مَا لَا يَرْجُوْنَ ؕ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا (النساء ١٠٤)

তরজমাঃ শত্রু সম্প্রদায়ের পশ্চাদ্ধাবনে শৈথিল্য করো না। যদি তোমরা আঘাত প্রাপ্ত হও, তবে তারাও তো তোমাদের মতই হয়েছে আঘাতপ্রাপ্ত এবং তোমরা আল্লাহর কাছে আশা কর, যা তারা আশা করে না। আল্লাহ মহাজ্ঞানী-প্রজ্ঞাময়। (নিসা ১০৪)

তাফসীরঃ হে মুসলমানগণ! শত্রু সম্প্রদায়ের পশ্চাদ্ধাবনে তোমরা সাহস হারিও না। যদি তোমরা জখমের কারণে কষ্টে থাক তবে তাতে কি হল? তারাও তো জর্জরিত। সুতরাং তারা তোমাদের চেয়ে বেশী শক্তিশালী নয়। কাজেই ভয় কিসের? তোমাদের মধ্যে অতিরিক্ত বিষয় এই যে, তোমরা আল্লাহর কাছ থেকে এমন বিষয়ের ভরসা রাখ, তারা যার ভরসা রাখে না অর্থাৎ সাওয়াব। অতএব মনের শক্তিতে তোমরা বেশী। কাজেই তোমাদের কর্মঠ হওয়া উচিত। কাফেররা দুর্বল দেহ ও দুর্বলমনা আল্লাহ্ তা জানেন।

(মাআরেফুল কুরআন ২/৬০৮)

তিনি তোমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন

ইরশাদ হয়েছে–

وَاذْكُرُوْا اِذْ اَنْتُمْ قَلِيلٌ مُّسْتَضْعَفُوْنَ فِى الْاَرْضِ تَخَافُوْنَ اَنْ يَّتَخَطَّفَكُمُ النَّاسُ فَاٰوٰكُمْ وَاَيَّدَكُم بِنَصْرِهٖ وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبٰتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (انفال ٢٦)

তরজমাঃ আর স্মরণ কর, যখন তোমরা ছিলে অল্প পরাজিত অবস্থায় পড়েছিলে দেশে; ভীত-সন্ত্রস্থ ছিলে যে, তোমাদের না অন্যেরা ছোঁ মেরে নিয়ে যায়। অতঃপর তিনি তোমাদিগকে আশ্রয়ের ঠিকানা দিয়েছেন। স্বীয় সাহায্যের দ্বারা তোমাদিগকে শক্তি দান করেছেন এবং পরিচ্ছন্ন জীবিকা দিয়েছেন যাতে তোমরা শুকরিয়া আদায় কর। (আনফাল ২৬)

তাফসীরঃ উক্ত আয়াতে খোদায়ী নির্দেশের আনুগত্যকে সহজ করার জন্য এবং তার প্রতি উৎসাহিত করার উদ্দেশ্যে মুসলমানগণকে তাদের বিগত দিনের দুরাবস্থা, দুর্বলতা ও অসহায়ত্ব এবং পরে স্বীয় অনুগ্রহ ও নে'আমতের মাধ্যমে অবস্থার পরিবর্তন ঘটিয়ে তাদেরকে শক্তি ও শান্তি দানের কথা উল্লেখ করা হয়েছে।

এরশাদ হয়েছে– হে মুসলমানগণ! তোমরা সে অবস্থার কথা স্মরণ কর, যা হিজরতের পূর্বে মক্কা মুআযযমায় ছিল। তখন তোমরা সংখ্যায় যেমন অল্প ছিলে তেমনি শক্তিতেও। সর্বক্ষণ আশঙ্কা লেগেই থাকত যে, শত্রুরা তাদের

ছিন্নভিন্ন করে ফেলবে। আল্লাহ তাআলা মদীনায় উত্তম অবস্থান দান করেছেন। শুধু অবস্থান বা আশ্রয় দান করেননি, বরং স্বীয় সমর্থন ও সাহায্যের মাধ্যমে তাদেরকে দান করেছেন শক্তি শত্রুর উপর বিজয় এবং বিপুল মালামাল। আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে– لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ অর্থাৎ তোমাদের অবস্থার এহেন পরিবর্তন, খোদার উপঢৌকন এবং নে'আমত রাজি দানের উদ্দেশ্য হল, তোমরা যেন কৃতজ্ঞ বান্দা হয়ে যাও। সুতরাং একথা সুস্পষ্ট যে, শুকরিয়া ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ ও তাঁর নির্দেশ বা হুকুম-আহকাম পালনের উপরেই নির্ভরশীল। (মাআরেফুল কুরআন ৪/২৬৩)

যখন শত্রুর সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হও

ইরশাদ হয়েছে–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ (٤٥) وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ (٤٦) وَلَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَّرِئَآءَ النَّاسِ وَيَصُدُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ بِمَا يَعْمَلُوْنَ مُحِيْطٌ (٤٧) (انفال: ٤٥-٤٧)

তরজমাঃ (৪৫) হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন কোন বাহিনীর সাথে সংঘাতে লিপ্ত হও, তখন সুদৃঢ় থাক এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর যাতে তোমরা উদ্দেশ্যে কৃতকার্য হতে পার। (৪৬) আর আল্লাহ তাআলার নির্দেশ মান্য কর এবং তার রাসূলের। তাছাড়া তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হইও না। যদি কর, তবে তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে। আর তোমরা ধৈর্যধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাআলা ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। (৪৭) আর তাদের মত হয়ে যেয়ো না যারা বেরিয়েছে নিজেদের অবস্থান থেকে গর্বিতভাবে এবং লোকদেরকে দেখানোর উদ্দেশ্যে। আর আল্লাহর পথে তারা বাধা দান করত। বস্তুতঃ আল্লাহর আয়ত্বে রয়েছে সে সমস্ত বিষয় যা তারা করে। (আনফাল ৪৫–৪৭)

যুদ্ধ-জিহাদে কৃতকার্যতা লাভের জন্য কুরআনের হেদায়েত

তাফসীরঃ প্রথম দুই আয়াতে আল্লাহ তাআলা মুসলমানগণকে যুদ্ধক্ষেত্র এবং শত্রুর মোকাবেলার জন্য একটি বিশেষ হেদায়েতনামা দান করেছেন, যা তাদের জন্য পার্থিব জীবনে কৃতকার্যতা এবং পরকালীন নাজাতের অমোঘ ব্যবস্থা। প্রাথমিক যুগের যুদ্ধসমূহে মুসলমানদেরর কৃতকার্যতা ও বিজয়ের রহস্যও এতেই নিহিত ছিল।

প্রথমত দৃঢ়তা ঃ অর্থাৎ দৃঢ়তা অবলম্বন করা ও স্থির-অটল থাকা। মনের দৃঢ়তা ও সংকল্পের অটলতা উভয়টি এর অন্তর্ভুক্ত। মুমিন ও কাফের নির্বিশেষে সবাই জানে, উপলব্ধি করে এবং পৃথিবীর প্রতিটি জাতি নিজেদের যুদ্ধে এরই উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে থাকে। কারণ অভিজ্ঞ লোকদের কাছে এ বিষয়টি গোপন নেই যে, সমরক্ষেত্রে সর্বপ্রথম এবং সবচাইতে কার্যকর অস্ত্রই হচ্ছে মন ও পদক্ষেপের দৃঢ়তা। এর অবর্তমানে অন্যান্য সমস্ত উপায়-উপকরণই অকেজো, বেকার।

দ্বিতীয়তঃ আল্লাহর যিকির ঃ এটি সেই বিশেষ ধরনের আধ্যাত্মিক হাতিয়ার যার ব্যাপারে ঈমানদারগণ ব্যতীত সাধারণ পৃথিবী গাফেল। সমগ্র পৃথিবী যুদ্ধের জন্য সর্বোত্তম অস্ত্র-শস্ত্র, আধুনিকতম সাজ-সরঞ্জাম ও উপায়-উপকরণ সংগ্রহ করার জন্য এবং সেনাবাহিনীকে সুদৃঢ় রাখার জন্য পরিপূর্ণ চেষ্টা নেয়। কিন্তু মুসলমানদের আধ্যাত্মিক ও পার্থিব এ হাতিয়ার সম্পর্কে তারা অপরিচিত ও অজ্ঞ। সে কারণেই এই হেদায়েত, এই নির্দেশনামা। এই নির্দেশনামা মোতাবেক যে কোন অঙ্গনে যে কোন জাতির সাথে মোকাবেলা হয়েছে, প্রতিপক্ষের সমস্ত শক্তি ও চেষ্টা-তদবীর পুরোপুরি নিস্ফল হয়ে পড়েছে। আল্লাহর যিকিরে নিজস্বভাবে যে বরকত ও কল্যাণ রয়েছে তা তো যথাস্থানে আছেই, তদুপরি এটাও একটি বাস্তব সত্য যে, দৃঢ়তার জন্যও এর চেয়ে পরীক্ষিত কোন ব্যবস্থা নেই। আল্লাহকে স্মরণ করা এবং তাতে বিশ্বাস রাখা এমন এক বিদ্যুৎ শক্তি যা একজন দুর্বলতর মানুষকেও পাহাড়ের সাথে মোকাবেলা করতে উদ্বুদ্ধ করে তোলে। বিপদ যত কঠিনই হোক না কেন, আল্লাহর স্মরণ সে সমস্ত বিপদকে হাওয়ায় উড়িয়ে দেয় এবং মানুষের মন-মানসকে বলিষ্ঠ ও পদক্ষেপকে সুদৃঢ় করে রাখে।

কুরআনে কারীম এহেন শঙ্কাপূর্ণ পরিবেশে মুসলমানদেরকে আল্লাহ তাআলাকে স্মরণ করার শিক্ষা দিয়েছে, তাও আবার অধিক পরিমাণে স্মরণ করার তাকীদসহ।

এখানে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, সমগ্র কুরআনে আল্লাহর যিকির ব্যতীত অন্য কোন ইবাদতই এত অধিক পরিমাণে করার হুকুম কোথাও উল্লেখ নেই। তার কারণ এই যে, আল্লাহর যিকির তথা স্মরণ এমন সহজ একটি ইবাদত যে, তাতে না তেমন কোন বিরাট সময় ব্যয় হয়, না পরিশ্রম এবং না অন্য কোন কাজের কোন রকম ব্যাঘাত ঘটে। তদুপরি আল্লাহ রাব্বুল আলামীন একান্ত অনুগ্রহ করে আল্লাহর যিকিরের জন্য কোন শর্তাশর্ত, কোন বাধ্যবাধকতা, উযূ কিংবা পবিত্র পোশাকাশাক এবং কেবলামুখী হওয়া প্রভৃতি কোন নিয়মই আরোপ করেননি। যে কোন মানুষ যে কোন অবস্থায় উযূর সাথে, বিনা উযূতে, দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে যেভাবে ইচ্ছা আল্লাহকে স্মরণ করতে পারে। এরপরেও যদি ইমাম জাযারীর গবেষণার বিষয়টি তুলে ধরা যায়, যা তিনি হিসনে হাসীন গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে, আল্লাহর যিকির শুধু মুখে কিংবা মনে মনে যিকির করাকেই বলা হয় না বরং প্রতিটি জায়েয বা বৈধ কাজ আল্লাহ-রাসূলের আনুগত্যের আওতায় থেকে করা হলে সে সবই যিকরুল্লাহর অন্তর্ভুক্ত, তবে এই পর্যালোচনা অনুযায়ী যিকরুল্লাহর মর্ম এত ব্যাপক ও সহজ হয়ে যায় যে, নিদ্রিত মানুষকেও যাকের বলা যেতে পারে। যেমন কোন কোন রেওয়ায়েতে উল্লেখ রয়েছে– "আলেম ব্যক্তির ঘুমও ইবাদতেরই অন্তর্ভুক্ত।" কারণ, যে আলেম তার ইলমের চাহিদা অনুযায়ী আমল করেন তার জন্য তাঁর নিদ্রা, তাঁর জাগরণ সবই আল্লাহর আনুগত্যের আওতাভুক্ত হওয়া অপরিহার্য।

যুদ্ধক্ষেত্রে আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ করার নির্দেশটিতে যদিও বাহ্যিক দৃষ্টিতে মুজাহিদীনের জন্য একটি কাজ বাড়িয়ে দেয়া হল বলে মনে হয় যা স্বভাবতঃই কষ্ট ও পরিশ্রমসাধ্য হবে, কিন্তু আল্লাহর যিকিরের এটা এক বিস্ময়কর বৈশিষ্ট্য যে, তাতে কখনও কোন পরিশ্রম তো হয়ই না, বরং এতে একটা সুখকর অনুভূতি, একটা শক্তি এবং একটা পৃথক স্বাদ অনুভূত হতে থাকে যা মানুষের কাজ-কর্মে অধিকতর সহায়ক হয়। তাছাড়া

এমনিতেও কষ্ট-পরিশ্রমের কাজ যারা করে থাকে তাদের অভ্যাস থাকে কোন একটা বাক্য কিংবা কোন গানের কলি কাজের ফাঁকেও গুনগুনিয়ে পড়তে বা গাইতে থাকার। সুতরাং কুরআনে কারীম মুসলমানদেরকে তার একটি উত্তম বিকল্প দিয়েছে যা হাজারো উপকারিতা ও তাৎপর্য মণ্ডিত। সে কারণেই আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে– لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ অর্থাৎ তোমরা যদি দৃঢ়তা এবং আল্লাহর যিকিরের দু'টি গোপন রহস্য স্মরণ রাখ এবং কর্মক্ষেত্রে সেগুলো প্রয়োগ কর, তবে বিজয় ও কৃতকার্যতা তোমাদেরই হবে।

যুদ্ধক্ষেত্রের একটি যিকির তো হলো তাই, যা সাধারণতঃ 'না'রায়ে তাকবীর শ্লোগানের মাধ্যমে করা যায়। এছাড়া আল্লাহ্ তাআলার উপর ভরসার খেয়াল রাখা, তাঁরই উপর নির্ভর করতে থাকা, তাঁর কথা মনে রাখা প্রভৃতি সবই যিকরুল্লাহ'-এর অন্তর্ভুক্ত।

৪৬ তম আয়াতে তৃতীয় আরেকটি বিষয়ের শিক্ষা দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে– وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ অর্থাৎ "আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্যকে অপরিহার্যভাবে পালন কর"। কারণ আল্লাহর সাহায্য-সমর্থন শুধুমাত্র তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমেই অর্জন করা যেতে পারে। পক্ষান্তরে পাপকর্ম ও আনুগত্যহীনতা আল্লাহ্ তাআলার অসন্তুষ্টি ও বঞ্চিতির কারণ হয়ে থাকে। এভাবে যুদ্ধক্ষেত্রের জন্য কুরআনী হেদায়েতনামার তিনটি ধারা সাব্যস্ত হয়ে যায়। তা হল, দৃঢ়চিত্ততা, আল্লাহর যিকির ও আনুগত্য। অতঃপর وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا আয়াতে ক্ষতিকর দিকগুলোর উপর আলোকপাত করে তা থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেয়া হয়েছে। তাই বলা হয়েছে– وَلَا تَنَازَعُوْا অর্থাৎ তোমরা পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদে লিপ্ত হয়ো না। তাহলে তোমাদের মাঝে সাহসহীনতা বিস্তার লাভ করবে এবং তোমাদের মনোবল ভেঙ্গে যাবে, তোমরা হীনবল হয়ে পড়বে।

তারপর وَاصْبِرُوْا (অবশ্যই ধৈর্যধারণ কর।) বাক্যের বিন্যাসধারায় প্রতীয়মান হয় যে, এতে বিবাদ-বিসম্বাদ থেকে রক্ষা পাবার একান্ত কার্যকর

ব্যবস্থা বাতলে দেয়া হয়েছে। এর বিশ্লেষণ এই যে, কোন দলের মত ও উদ্দেশ্যে যত ঐক্যই থাক না কেন, কিন্তু ব্যক্তি মানুষের স্বভাবগত বৈশিষ্ট্য অবশ্যই বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে। তাছাড়া কোন উদ্দেশ্য লাভের প্রচেষ্টার ক্ষেত্রেও অভিজ্ঞ, বুদ্ধিজীবীদের মতপার্থক্য থাকা অপরিহার্য। কাজেই অন্যের সাথে চলতে গিয়ে এবং অন্যকে সঙ্গে রাখতে গিয়ে মানুষকে স্বভাব বিরুদ্ধ বিষয়েও ধৈর্যধারণ ও সহনশীলতার মনোভাব গড়ে তোলা এবং নিজের মতের উপর এত অধিক দৃঢ়তা ও অনমনীয়তা না থাকা উচিত যা গৃহীত না হলে খেপে যায়। এই গুণের অপর নামই হল 'সবর'। ইদানীং এ কথাটি সবাই জানে এবং বলেও থাকে যে, নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক বিবাদ-বিসম্বাদ সৃষ্টি করা অত্যন্ত মন্দ কাজ। কিন্তু তা থেকে বেঁচে থাকার মূল কথা 'সবর' অবলম্বনে অভ্যস্ত হওয়া এবং নিজের মত মানবার ফিকিরে খেপে না যাওয়ার গুণটি অতি অল্প লোকের মধ্যেই পাওয়া যায়। সে কারণেই ঐক্য ও একতার যাবতীয় ওয়াজ-নসীহতই নিস্ফল হয়ে যায়।

এখানে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, এক্ষেত্রে কুরআনে কারীমে وَلَا تَنَازَعُوْا বলেছে। অর্থাৎ পারস্পরিক বিবাদ-দ্বন্দ্ব থেকে বিরত করেছে, মতের পার্থক্য কিংবা তা প্রকাশ করতে বাধা দেয়নি। যে ক্ষেত্রে মতপার্থক্যের সাথে সাথে নিজের মত অন্যকে মানাবার প্রেরণা কার্যকর থাকে তাকেই বলা হয় বিবাদ ও বিসম্বাদ। আর এটিই হল সে প্রেরণা যাকে কুরআনে কারীম وَاصْبِرُوْا শব্দে ব্যক্ত করেছে এবং সবশেষে 'সবর' অবলম্বনে এক বিরাট উপকারিতার কথা বলে এর তিক্ততা দূর করে দিয়েছে যে, اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ (যারা সবর তথা ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ তাদের সঙ্গে রয়েছেন)। এটি এমন এক মহাসম্পদ যে, ইহ-পরকালের যাবতীয় সম্পদ এর মোকাবেলায় নগণ্য।

সত্যিকারের মুসলমান

ইরশাদ হয়েছে–

وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا

وَّنَصَرُوْٓا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ط لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ (٧٤)
وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا مَعَكُمْ فَاُولٰٓئِكَ مِنْكُمْ ط
وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِيْ كِتٰبِ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيْمٌ (٧٥) (انفال: ٧٤-٧٥)

তরজমাঃ (৭৪) আর যারা ঈমান এনেছে, নিজেদের ঘর-বাড়ী ছেড়েছে এবং আল্লাহর রাহে জিহাদ করেছে এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে সাহায্য-সহযোগিতা করেছে তাঁরাই হলো সত্যিকার মুসলমান। তাদেরজন্যে রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রুযী। (৭৫) আর যারা ঈমান এনেছে পরবর্তী পর্যায়ে এবং ঘর-বাড়ী ছেড়েছে এবং তোমাদের সাথে সম্মিলিত হয়ে জিহাদ করেছে, তারাও তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত। বস্তুতঃ যারা আত্মীয় আল্লাহর বিধান মতে তারা পরস্পর বেশী হকদার। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ যাবতীয় বিষয়ে অবগত।

(আনফাল ৭৪–৭৫)

তাফসীরঃ উক্ত আয়াতে মক্কা থেকে হিজরত ও জিহাদকারী সাহাবায়ে কেরাম এবং তাঁদের সাহায্যকারী মদীনাবাসী আনসারদের প্রশংসা, তাঁদের সত্যিকার মুসলমান হওয়ার সাক্ষ্য ও তাঁদের মাগফেরাত ও সম্মানজনক উপার্জন দানের ওয়াদার কথা বলা হয়েছে। এরশাদ হয়েছে–

اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا

অর্থাৎ, তারাই হচ্ছেন সত্যিকারভাবে মুসলমান। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যারা হিজরত করতে পারেনি যদিও তাঁরা মুসলমান, কিন্তু তাদের ইসলাম পরিপূর্ণ নয় এবং নিশ্চিতও নয়। কারণ তাতে এমন সম্ভাবনাও রয়েছে যে, হয়তোবা তারা প্রকৃতপক্ষে মুনাফেক হয়ে প্রকাশ্যে ইসলামের দাবী করছে। তারপরেই বলা হয়েছে– لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ অর্থাৎ, তাদের জন্য মাগফেরাত নির্ধারিত। যেমন, হাদীস শরীফে বর্ণিত হয়েছেঃ

الاسلام يهدم ماكان قبله والهجرة تهدم ماكان قبلها

অর্থাৎ, ইসলাম গ্রহণ যেমন তার পূর্ববর্তী সমস্ত পাপকে নিঃশেষ করে দেয়, তেমনিভাবে হিজরত তার পূর্ববর্তী সমস্ত পাপকে নিঃশেষ করে দেয়।

(মাআরেফুল কুরআন ৪/৩৭৭)

জান্নাতের সুসংবাদ

ইরশাদ হয়েছে–

اَجَعَلْتُمْ سِقَايَةَ الْحَاجِّ وَعِمَارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَجٰهَدَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط لَا يَسْتَوٗنَ عِنْدَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ لَايَهْدِى الْقَوْمَ الظّٰلِمِيْنَ (١٩) اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ط وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ (٢٠) يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَّجَنّٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ (٢١) خَالِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ط اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ (٢٢) (التوبة ١٩-٢٢)

তরজমাঃ (১৯) তোমরা কি হাজীদের পানি সরবরাহ ও মসজিদুল হারাম আবাদ করণকে সেই লোকের সমান মনে কর, যে ঈমান রাখে আল্লাহ ও শেষ দিনের প্রতি এবং জিহাদ করেছে আল্লাহ রাহে। এরা আল্লাহর দৃষ্টিতে সমান নয়, আর আল্লাহ জালেম লোকদের হেদায়েত করেন না। (২০) যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহর রাহে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে জিহাদ করেছে, তাদের বড় মর্যাদা রয়েছে আল্লাহর কাছে, তারাই সফলকাম। (২১) তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন তাদের পরওয়ারদেগার স্বীয় দয়া ও সন্তোষের এবং জান্নাতের, সেখানে আছে তাদের জন্য স্থায়ী শান্তি। তথায় তারা থাকবে চিরদিন। নিঃসন্দেহে আল্লাহর কাছে আছে মহা পুরস্কার।

(তাওবা ১৯–২২)

তাফসীরঃ মুসলিম শরীফে নুমান বিন বশীর (রাযিঃ) থেকে বর্ণিত হাদীসে ঘটনাটি ভিন্ন রূপে উদ্ধৃত হয়। এক জুম'আর দিন তিনি কতিপয় সাহাবাগণের সাথে মসজিদে নববী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বরের পাশে বসা ছিলেন। উপস্থিত একজন বললেন, ইসলাম ও ঈমানের পর

আমার দৃষ্টিতে হাজীদের পানি সরবরাহ করার মত মর্যাদা সম্পন্ন আর কোন আমল নেই এবং এর মোকাবেলায় আর কোন আমলের ধার আমি ধারি না। তাঁর উক্তি খণ্ডন করে অপর জন বললেন, আল্লাহর রাহে জিহাদ করার মত উত্তম আমল আর নেই। এভাবে দু'জনের মধ্যে বাদানুবাদ চলতে থাকে। হযরত উমর ফারূক রাযিয়াল্লাহু আনহু তাদের ধমক দিয়ে বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মিম্বরের কাছে শোরগোল বন্ধ কর। জুম'আর নামাযের পর স্বয়ং হযরতের কাছে বিষয়টি পেশ কর। কথা মত প্রশ্নটি তাঁর কাছে রাখা হয়। এর প্রেক্ষিতেই উপরোক্ত আয়াত নাযিল হয় এবং এতে মসজিদের রক্ষণাবেক্ষণ ও হাজীদের পানি সরবরাহের ওপর জিহাদকে প্রাধান্য দেয়া হয়। (মাআরেফুল কুরআন ৪/৪১৪)

আল্লাহর পথের তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধা

ইরশাদ হয়েছে–

مَاكَانَ لِاَهْلِ الْمَدِيْنَةِ وَمَنْ حَوْلَهُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ اَنْ يَّتَخَلَّفُوْا عَنْ رَّسُوْلِ اللّٰهِ وَلَا يَرْغَبُوْا بِاَنْفُسِهِمْ عَنْ نَفْسِهٖ ط ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ لَايُصِيْبُهُمْ ظَمَاٌ وَّلَانَصَبٌ وَّلَا مَخْمَصَةٌ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَطَئُوْنَ مَوْطِئًا يَّغِيْظُ الْكُفَّارَ وَلَايَنَالُوْنَ مِنْ عَدُوٍّ نَّيْلًا اِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهٖ عَمَلٌ صَالِحٌ ط اِنَّ اللّٰهَ لَايُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ - (التوبة ١٢)

তরজমাঃ মদীনাবাসী ও পার্শ্ববর্তী পল্লীবাসীদের উচিত নয় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গ ত্যাগ করে পিছনে থেকে যাওয়া এবং রাসূলের প্রাণ থেকে নিজেদের প্রাণকে অধিক প্রিয় মনে করা। এটি এজন্য যে, আল্লাহর পথে যে তৃষ্ণা, ক্লান্তি ও ক্ষুধা তাদের স্পর্শ করে এবং তাদের এমন পদক্ষেপ যা কাফেরদের মনে ক্রোধের কারণ হয় আর শত্রুদের পক্ষ থেকে তারা যা কিছু প্রাপ্ত হয়– তার প্রত্যেকটির পরিবর্তে তাদের জন্য লিখিত হয় নেক আমল। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সৎকর্মশীল লোকদের হক নষ্ট করেন না। (তাওবা ১২০)

তাফসীরঃ আলোচ্য আয়াতে জিহাদ থেকে পেছনে পড়ে থাকার নিন্দা, জিহাদকারীদের ফযীলত এবং জিহাদের ব্যাপারে প্রতিটি পদক্ষেপ, প্রতি কথা ও কর্মে এবং যাবতীয় পরিশ্রমের সর্বোত্তম বিনিময়ের উল্লেখ রয়েছে। ফলে জিহাদকালে শত্রুর প্রতি কোন আঘাত হানা এবং শত্রুকে ক্রোধান্বিত করার ভঙ্গিতে চলা প্রভৃতি সব বিষয়েই নেক আমলের সওয়াব হয়।

(মাআরেফুল কুরআন ৪/৫৮৯)

আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালবাসেন

ইরশাদ হয়েছে–

لَا يَسْتَأْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالْمُتَّقِيْنَ (٤٤) اِنَّمَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوْبُهُمْ فَهُمْ فِىْ رَيْبِهِمْ يَتَرَدَّدُوْنَ - (التوبة ٤٥-٤٤)

তরজমাঃ (৪৪) আল্লাহ ও রোজ কেয়ামতের প্রতি যাদের ঈমান রয়েছে, তারা মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করা থেকে আপনার কাছে অব্যাহতি কামনা করবে না, আর আল্লাহ মুত্তাকীদের ভালবাসেন। (৪৫) নিঃসন্দেহে তারাই আপনার কাছে অব্যাহতি চায়, যারা আল্লাহ ও রোজ কেয়ামতে ঈমান রাখে না এবং তাদের অন্তর সন্দেহগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। সুতরাং সন্দেহের আবর্তে তারা ঘুরপাক খেয়ে চলছে। (তাওবা ৪৪-৪৫)

তাফসীরঃ উক্ত আয়াতদ্বয়ে মুমিন ও মুনাফেকের পার্থক্য দেখানো হয়েছে যে, মুমিনগণ জান ও মালের মোহে পড়ে জিহাদ থেকে বাঁচার জন্যে আপনার কাছে অব্যাহতি কামনা করে না, বরং এ হল তাদের কাজ, আল্লাহ ও রোজ কেয়ামতের প্রতি যাদের ঈমান বিশুদ্ধ নয়। আর আল্লাহ মুত্তাকী লোকদের ভাল করে জানেন। (মাআরেফুল কুরআন– ৪/৪৬৯)

তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য কর!

ইরশাদ হয়েছে–

يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ تَنْصُرُوا اللّٰهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ اَقْدَامَكُمْ (محمد ٧)

তরজমাঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে সাহায্য কর; আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করবেন এবং তোমাদের পা দৃঢ় প্রতিষ্ঠা করবেন।

(মুহাম্মদ ৭)

তাফসীরঃ তোমরা যদি তাঁর দ্বীন প্রচারে সাহায্য কর তবে তিনি তোমাদেরকে সাহায্য করবেন যার পরিণতি দুনিয়াতে শত্রুর বিরুদ্ধে জয়লাভ করা– প্রথমেই হোক কিংবা কিছুদিন পর হোক। কোন মুমিনের নিহত হওয়া কিংবা কোন যুদ্ধে সাময়িক পরাজয় বরণ করা এর পরিপন্থী নয় এবং শত্রুর মোকাবেলায় তোমাদের পা দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত রাখবেন এবং কাফেরদের বিরুদ্ধে বিজয়ী করবেন। (মাআরেফুল কুরআন ৮/১৩)

অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব

ইরশাদ হয়েছে–

وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجٰهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصّٰبِرِيْنَ
وَنَبْلُوَا اَخْبَارَكُمْ (محمد ٣١)

তরজমাঃ আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব যে পর্যন্ত না ফুটিয়ে তুলি তোমাদের জিহাদকারীদেরকে এবং সবরকারীদেরকে এবং যতক্ষণ না আমি তোমাদের অবস্থাসমূহ যাচাই করি। (মুহাম্মদ ৩১)

তাফসীরঃ অর্থাৎ আমি কঠিন বিধানাবলীর নির্দেশ দিয়ে অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষা করব, যাতে আমি বাহ্যতঃ তাদেরকে জেনে ও পৃথক করে নেই; যারা জিহাদ করে এবং যারা জিহাদে দৃঢ়পদ থাকে এবং যাতে তোমাদের অবস্থা যাচাই করে নেই। যাতে জিহাদের নির্দেশের মধ্যে অন্য নির্দেশাবলীও এবং মোজাহাদা ও সবরের অবস্থার মধ্যে অন্যান্য অবস্থাও দাখিল হয়ে যায়। (মাআরেফুল কুরআন ৮/২৮)

যারা আল্লাহর পথে খরচ করে ও জিহাদ করে

ইরশাদ হয়েছে–

وَمَا لَكُمْ اَلَّا تُنْفِقُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلِلّٰهِ مِيْرَاثُ السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ ط لَايَسْتَوِىْ مِنْكُمْ مَّنْ اَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ ط اُولٰٓئِكَ

أَعْظَمُ دَرَجَةً مِّنَ الَّذِيْنَ أَنْفَقُوْا مِنْۢ بَعْدُ وَقَاتَلُوْا ط وَكُلًّا وَّعَدَ اللّٰهُ الْحُسْنٰى ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرٌ - (حديد ١٠)

তরজমাঃ তোমাদের আল্লাহর পথে ব্যয় করতে কিসে বাধা দেয়, যখন আল্লাহই নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের উত্তরাধিকারী? তোমাদের মধ্যে যে মক্কা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে, সে সমান নয়। এরূপ লোকদের মর্যাদা বড় তাদের অপেক্ষা যারা পরে ব্যয় করেছে ও জিহাদ করেছে। তবে আল্লাহ উভয়কে কল্যাণের ওয়াদা দিয়েছেন। তোমরা যা কর আল্লাহ তা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞাত। (হাদীদ ১০)

তাফসীরঃ উক্ত আয়াতে মক্কা বিজয়ের পূর্বে বিশ্বাস স্থাপনকারী, জিহাদকারী ও ব্যয়কারীদের মর্যাদা অপর শ্রেণী তথা মক্কা বিজয়ের পর যারা এসব কিছু করেছে তাদের অপেক্ষা বেশী তা বর্ণনা করা হয়েছে।

(মাআরেফুল কুরআন ৮/৩৪৫)

আল্লাহ ভালবাসেন যারা সারিবদ্ধভাবে জিহাদ করে

ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الَّذِيْنَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِهٖ صَفًّا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَّرْصُوْصٌ (صف ٤)

তরজমাঃ আল্লাহ তাদেরকে ভালবাসেন যারা তাঁর পথে সারিবদ্ধভাবে জিহাদ-লড়াই করে, যেন তারা সীসা ঢালা প্রাচীর। (সাফফ ৪)

তাফসীরঃ যুদ্ধের সেই কাতার আল্লাহর কাছে প্রিয় যা আল্লাহর শত্রুদের মোকাবিলায় তাঁর বাণী সমুন্নত করার জন্যে কায়েম করা হয় এবং মুজাহিদদের অসাধারণ দৃঢ়তা ও সাহসিকতার তা একটি সীসা ঢালা দুর্ভেদ্য প্রাচীরের রূপ পরিগ্রহ করে। (মাআরেফুল কুরআন ৮/৫০১)

আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট

ইরশাদ হয়েছে–

اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْۢ بَعْدِ مَآ أَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ط

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ (١٧٢) اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا صلے وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ (١٧٣) (ال عمران: ١٧٢-١٧٣)

তরজমাঃ (১৭২) যারা আহত হয়ে পড়ার পরেও আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য করেছে, তাদের মধ্যে যারা সৎ ও পরহেযগার, তাদের জন্য রয়েছে মহান সওয়াব। (১৭৩) যাদেরকে লোকেরা বলেছে যে, তোমাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য লোকেরা সমাবেশ করেছে বহু সাজ-সরঞ্জাম, তাদের ভয় কর। তখন তাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হয়ে যায় এবং তারা বলে, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট এবং তিনি কতই না চমৎকার কামিয়াবী দানকারী। (সূরা ইমরান ১৭২-১৭৩)

তাফসীরঃ প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, গাযওয়ায়ে উহুদে আহত হওয়া সত্ত্বেও এবং কঠিন কষ্ট ভোগ করা সত্ত্বেও যখন তাদেরকে আরেক জিহাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আহবান জানালেন, তখন তাঁরা তার জন্যেও তৈরী হয়ে গেলেন। এখানে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয়, এখানে যেসব মুসলমানের প্রশংসা করা হয়েছে তাদের দুটি বৈশিষ্ট্যের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর একটি হল– مِنْۢ بَعْدِ مَا اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আহবানে তারাই সাড়া দিয়েছেন, যারা উহুদের যুদ্ধে জখমী হয়েছিলেন। তাদের সত্তর জন বীর যোদ্ধা শহীদ হয়েছিলেন। তাদের নিজেদের শরীরও আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যখন তাদেরকে অন্য আরেক জিহাদের আহবান জানানো হল, অমনি তৈরী হয়ে গেলেন।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে–

لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا

আয়াতে বলা হয়েছে যে, এরা বাস্তব ও কার্যকর প্রচেষ্টা ও আত্মবিসর্জনের মহান কীর্তি স্থাপনের সাথে সাথে অনুগ্রহ ও পরহেযগারীর বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়েও পরাকাষ্ঠা সম্পন্ন ছিলেন। আর এই সমন্বিত বৈশিষ্ট্যই তাঁদের মহাপ্রতিদান প্রাপ্তির কারণ। (মাআরেফুল কুরআন ২/২৬৪)

তৃতীয় অধ্যায়

যুদ্ধের নিয়মাবলী

হে ঈমানদারগণ! অস্ত্র তুলে নাও

ইরশাদ হয়েছে–

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ اَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا (نساء ٧١)

তরজমাঃ হে ঈমানদারগণ! নিজেদের অস্ত্র তুলে নাও এবং পৃথক পৃথক সৈন্যদলে কিংবা সমবেতভাবে (অভিযানে) বেরিয়ে পড়। (নিসাঃ ৭১)

তাফসীর ঃ আয়াতের প্রথমাংশে জিহাদের জন্য অস্ত্র সংগ্রহের এবং দ্বিতীয় অংশে জিহাদে অংশ গ্রহণের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। এতে বুঝা যাচ্ছে যে, কোন ব্যাপারে বাহ্যিক উপকরণ অবলম্বন করা তাওয়াক্কুল বা আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতার পরিপন্থী নয়। আরো বোঝা যাচ্ছে যে, এখানে অস্ত্র সংগ্রহের নির্দেশ দেয়া হলেও কিন্তু এমন প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়নি যে, অস্ত্রের কারণে তোমরা নিশ্চিতভাবেই নিরাপদ হতে পারবে। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, বাহ্যিক উপকরণ অবলম্বন করাটা মূলতঃ মানসিক স্বস্তি লাভের জন্যই হয়ে থাকে। বাস্তবে এগুলো লাভ-ক্ষতির ব্যাপারে কোন প্রভাব বিস্তার করতে পারে না।

তোমরা যখন আল্লাহর পথে সফর কর

ইরশাদ হয়েছে–

يَاأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِذَا ضَرَبْتُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَتَبَيَّنُوْا وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا ج تَبْتَغُوْنَ عَرَضَ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا فَعِنْدَ اللّٰهِ مَغَانِمُ كَثِيْرَةٌ ط كَذٰلِكَ كُنْتُمْ مِّنْ قَبْلُ فَمَنَّ اللّٰهُ عَلَيْكُمْ فَتَبَيَّنُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ خَبِيْرًا (نساء ٩٤)

তরজমাঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন আল্লাহর পথে সফর কর, তখন যাচাই করে নিও এবং যে তোমাদেরকে সালাম করে তাকে বলো না যে তুমি মুসলমান নও। তোমাদের পার্থিব জীবনের সম্পদ অন্বেষণ কর, বস্তুতঃ আল্লাহর কাছে অনেক সম্পদ রয়েছে। তোমরাও তো এমনি ছিলে ইতিপূর্বে; অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। অতএব এখন অনুসন্ধান করে নিও। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তোমাদের কাজকর্মের খবর রাখেন।

(সূরা নিসা ৯৪)

তাফসীরঃ আলোচ্য আয়াতে বলা হচ্ছে যে, শরীঅতের বিধানাবলী প্রয়োগের ক্ষেত্রে বাহ্যিক ইসলামই বিশ্বাসী হওয়ার জন্যে যথেষ্ট। যে কেউ ইসলাম প্রকাশ করে, তাকে হত্যা করা থেকে নিবৃত্ত থাকা ওয়াজিব। শুধু সন্দেহ বশতঃ আন্তরিক অবস্থা যাচাই করা এবং ইসলামী বিধান প্রয়োগের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির নিশ্চিত বিশ্বাসী হওয়ার প্রমাণের অপেক্ষা করা বৈধ নয়। উদাহরণতঃ কয়েকটি যুদ্ধে কোন কোন সাহাবী থেকে এ জাতীয় ভুল সংঘটিত হয়েছে। মুসলমান বলে পরিচয় দেওয়ার পরও কোন কোন সাহাবী ইসলামী লক্ষণাদিকে মিথ্যা মনে করে পরিচয় দানকারীকে হত্যা করেছেন এবং তার অর্থ-সম্পদ হস্তগত করেছেন। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহ্ তাআলা এ ভ্রান্ত পদ্ধতির দ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছেন। সাহাবীরা তখন পর্যন্ত এ মাসআলাটি পরিষ্কাররূপে জানতেন না। তাই শুধু আদেশ দানকে যথেষ্ট মনে করা হয়েছে এবং এ কর্মের জন্য তাদের প্রতি কোনরূপ শাস্তি বাণী অবতীর্ণ হয়নি। (বয়ানুল কুরআন, মাআরেফুল কুরআন ২/৫৯২)

হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে একটি রেওয়ায়েত বর্ণিত আছে। রেওয়ায়েতটি বুখারী শরীফে সংক্ষেপে এবং বাযযার (রহঃ) বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করেছেন। একবার রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদল মুজাহিদ প্রেরণ করেন। তাদের মধ্যে মেকদাদ ইবনে আসওয়াদও ছিলেন। মুজাহিদ দল ঘটনাস্থলে পৌঁছলে প্রতিপক্ষের সবাই পলায়ন করল। শুধু এক ব্যক্তি থেকে গেল। তার কাছে অনেক ধন-সম্পদ ছিল। সে মুজাহিদ দলকে দেখে اَشْهَدُ اَنْ لَّآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ উচ্চারণ করল।

কিন্তু হযরত মেকদাদ মনে করলেন যে, সে প্রাণ ও ধন-সম্পদ রক্ষা করার উদ্দেশ্যে কালেমা পাঠ করেছে। অতঃপর তিনি তাকে হত্যা করলেন। অপর একজন মুজাহিদ বললেন, আপনি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুর সাক্ষ্য দানকারী ব্যক্তিকে হত্যা করে অন্যায় করেছেন। মদীনা প্রত্যাবর্তনের পর আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ সম্পর্কে অবহিত করব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ সম্পর্কে অবহিত করলে তিনি মেকদাদকে ডেকে কঠোর ভাষায় সতর্ক করে বললেন, কেয়ামতের দিন যখন কালেমা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগকারী হবে, তখন তুমি কি জওয়াব দিবে? এ ঘটনার প্রেক্ষিতেই لَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ اَلْقٰى اِلَيْكُمُ السَّلٰمَ لَسْتَ مُؤْمِنًا। আয়াত অবতীর্ণ হয়। (মাআরেফুল কুরআন ২/৫৯৩)

যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তাদের শাস্তি

ইরশাদ হয়েছে–

اِنَّمَا جَزٰٓؤُا الَّذِيْنَ يُحَارِبُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَيَسْعَوْنَ فِى الْاَرْضِ فَسَادًا اَنْ يُّقَتَّلُوْٓا اَوْ يُصَلَّبُوْٓا اَوْ تُقَطَّعَ اَيْدِيْهِمْ وَاَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ اَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْاَرْضِ ؕ ذٰلِكَ لَهُمْ خِزْىٌ فِى الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيْمٌ (٣٣) اِلَّا الَّذِيْنَ تَابُوْا مِنْ قَبْلِ اَنْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهِمْ ج فَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (٣٤) (المائدة ٣٣-٣٤)

তরজমাঃ (৩৩) যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে এবং দেশে হাঙ্গামা সৃষ্টি করতে সচেষ্ট হয়, তাদের শাস্তি হচ্ছে এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলে চড়ানো হবে অথবা তাদের হস্তপদসমূহ বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া হবে অথবা দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এটি হল তাদের পার্থিব লাঞ্ছনা আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। (৩৪) কিন্তু যারা তোমাদের গ্রেফতারের পূর্বে তাওবা করে; জেনে রাখ আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। (মায়েদা ৩৩–৩৪)

তাফসীরঃ প্রথম আয়াতে যারা আল্লাহ্ ও রাসূলের সাথে সংগ্রাম ও মোকাবেলা করে এবং দেশে অশান্তি সৃষ্টি করে, তাদের শাস্তি বর্ণিত হয়েছে।

এখানে প্রথমে প্রণিধানযোগ্য যে, আল্লাহ্ ও রাসূলের সাথে সংগ্রাম এবং দেশে অনর্থ সৃষ্টি করার অর্থ কি এবং এরা কারা? مُحَارَبَةٌ শব্দটি حَرْبٌ মূল ধাতু থেকে উদ্ভুত। এর আসল অর্থ ছিনিয়ে নেয়া। বাচন পদ্ধতিতে এ শব্দটি سَلْمٌ অর্থাৎ শান্তি ও নিরাপত্তার বিপরীত অর্থে ব্যবহৃত হয়। অতএব حَرْبٌ এর অর্থ হচ্ছে অশান্তি বিস্তার করা। একথা জানা যে, বিক্ষিপ্ত চুরি, হত্যা ও লুণ্ঠনের ঘটনায় জননিরাপত্তা বিঘ্নিত হয় না, বরং কোন সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী দল ডাকাতি, হত্যা ও লুটতরাজে প্রবৃত্ত হলেই জননিরাপত্তা ব্যাহত হয়। এ কারণেই ফিকাহবিদগণ ঐ দল অথবা ব্যক্তিবর্গকে এ শাস্তির যোগ্য বলে সাব্যস্ত করেছেন, যারা অস্ত্র-সজ্জিত হয়ে ডাকাতি করে এবং শক্তির জোরে সরকারের আইন ভঙ্গ করতে চায়। শব্দান্তরে তাদেরকে ডাকাত দল অথবা বিদ্রোহীদল বলা যায়। সাধারণ চোর, পকেটমার ইত্যাদি এর অন্তর্ভুক্ত নয়।

(তাফসীরে মাযহারী)

এখানে প্রণিধানযোগ্য দ্বিতীয় বিষয়টি এই যে, আলোচ্য আয়াতে مُحَارَبَةٌ অর্থাৎ সংগ্রাম করাকে আল্লাহ্ ও রাসূলের সাথে সম্বন্ধ করা হয়েছে, অথচ ডাকাত অথবা বিদ্রোহীদের সংগ্রাম ও সংঘর্ষ হয় জনগণের সাথে। এর কারণ এই যে, কোন শক্তিশালী দল যখন শক্তির জোরে আল্লাহ্ ও রাসূলের আইন ভঙ্গ করতে চায়, তখন বাহ্যতঃ জনগণের সাথে সংঘর্ষ হলেও প্রকৃতপক্ষে তা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধেই হয়ে থাকে। রাষ্ট্রে যখন আল্লাহ্ ও রাসূলের আইন কার্যকরী থাকবে, তখন এ সংঘর্ষও আল্লাহ্ ও রাসূলের বিপক্ষেই গণ্য হবে।

সারকথা এই যে, প্রথম আয়াতে বর্ণিত শাস্তি ঐসব ডাকাত ও বিদ্রোহীদের বেলায় প্রযোজ্য, যারা সংঘবদ্ধ শক্তির জোরে আক্রমণ চালিয়ে জননিরাপত্তা ব্যাহত করে এবং প্রকাশ্যে সরকারের আইন অমান্য করার চেষ্টা করে। এর অর্থ বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। অর্থ লুণ্ঠন করা, শ্লীতাহানী করা

ইত্যাদি থেকে শুরু করে হত্যা ও রক্তপাত পর্যন্ত সবই এর অন্তর্ভুক্ত। এ থেকেই مُقَاتَلَةٌ ও مُحَارَبَةٌ শব্দদ্বয়ের পার্থক্য ফুটে উঠেছে। مُقَاتَلَةٌ শব্দটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের অর্থে ব্যবহৃত হয়– তাতে কেউ নিহত হোক বা না হোক এবং অর্থ-সম্পদ লুণ্ঠন করা হোক বা না হোক। পক্ষান্তরে مُحَارَبَةٌ শব্দের অর্থ হচ্ছে শক্তি সহকারে অশান্তি ছড়ানো এবং নিরাপত্তা ব্যাহত করা।

এ অপরাধের শাস্তি কুরআন পাক স্বয়ং নির্ধারিত করে দিয়েছে এবং আল্লাহর হক অর্থাৎ গভর্ণমেন্টবাদী অপরাধ হিসেবে প্রয়োগ করেছে। শরীঅতের পরিভাষায় একেই 'হদ' বলা হয়। এবার শুনুন ডাকাতি ও রাহাজানির শাস্তি। আয়াতে চারটি শাস্তির উল্লেখ করা হয়েছেঃ

أَنْ يُّقَتَّلُوْا أَوْ يُصَلَّبُوْآ أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيْهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ

অর্থাৎ তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শূলীতে চড়ানো হবে অথবা তাদের হাত ও পা বিপরীত দিক থেকে কেটে দেয়া হবে অথবা তাদেরকে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। প্রথমোক্ত তিন শাস্তিতে باب تفعيل থেকে مبالغة -এর শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, যা ক্রিয়ার পৌনঃপুনিকতা ও তীব্রতা বোঝায়। ক্রিয়াপদ বহুবচন ব্যবহার করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তাদের হত্যা অথবা শূলীতে চড়ানো অথবা হস্তপদ কেটে দেয়া সাধারণ শাস্তির মত নয় যে, যে লোক অপরাধী প্রমাণিত হবে, তাকেই শাস্তি দেয়া হবে; বরং এ অপরাধ দলের মধ্য থেকে একজনে করলেও গোটা দলকে হত্যা অথবা শূলীতে চড়ানো হবে অথবা গোটা দলেরই হস্তপদ কেটে দেয়া হবে।

এ ছাড়া এতে এদিকেও ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এ শাস্তি কিসাস হিসেবে নয় যে, নিহত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী মাফ করে দিলেই মাফ হয়ে যাবে, বরং তা আল্লাহ তাআলার হক হিসেবে প্রয়োগ করা হবে। যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তারা মাফ করলেও তা মাফ হবে না। باب تفعيل থেকে ক্রিয়াপদ ব্যবহার করার কারণে এ দু'টি ইঙ্গিতই বোঝা যাচ্ছে। (তাফসীরে মাযহারী)

বন্দীদেরকে নিজের কাছে রাখা উচিত নয়

ইরশাদ হয়েছে–

مَاكَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗٓ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ ؕ تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ (٦٧) لَوْ لَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَآ اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ (٦٨) (انفال ٦٧-٦٨)

তরজমাঃ (৬৭) নবীর পক্ষে উচিত নয় বন্দীদিগকে নিজের কাছে রাখা, যতক্ষণ না দেশময় প্রচুর রক্তপাত ঘটাবে। তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা কর, অথচ আল্লাহ চান আখেরাত। আর আল্লাহ হচ্ছেন পরাক্রমশালী, হেকমতওয়ালা। (৬৮) যদি একটি বিষয় না হত যা পূর্ব থেকেই আল্লাহ লিখে রেখেছেন, তাহলে তোমরা যা গ্রহণ করছ সে জন্য বিরাট আযাব এসে পৌঁছত। (সূরা আনফাল ৬৭–৬৮)

তাফসীর ঃ ১৬০, ১৬১, ১৬২ ও ১৬৩ নং পৃষ্ঠায় বর্ণিত হয়েছে।

আল্লাহ বিশ্বাস ভঙ্গকারীকে পছন্দ করেন না

ইরশাদ হয়েছে–

وَاِمَّا تَخَافَنَّ مِنْ قَوْمٍ خِيَانَةً فَانْۢبِذْ اِلَيْهِمْ عَلٰى سَوَآءٍ ؕ اِنَّ اللّٰهَ لَايُحِبُّ الْخَائِنِيْنَ (انفال ٥٨)

তরজমাঃ আর যদি তুমি কোন সম্প্রদায়ের বিশ্বাস ভঙ্গের আশংকা কর, তবে তোমার চুক্তি ও তুমি যথাযথভাবে বাতিল করে দাও, নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বাস ভঙ্গকারীদেরকে পছন্দ করেন না। (আনফাল ৫৮)

সন্ধি চুক্তি বাতিল করার উপায়

তাফসীর ঃ উক্ত আয়াতে রাসূলে মকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যুদ্ধ ও সন্ধির আইন সংক্রান্ত কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ধারা বাতলে দেয়া হয়েছে। এতে চুক্তির অনুবর্তিতার গুরুত্ব বর্ণনার সাথে সাথে একথাও

বলা হয়েছে যে, কোন সময় যদি চুক্তির দ্বিতীয় পক্ষের দিক থেকে বিশ্বাসঘাতকতা, অর্থাৎ চুক্তি লংঘনের আশঙ্কা সৃষ্টি হয়ে যায়, তবে চুক্তির বাধ্যবাধকতাকে অক্ষুণ্ন রাখা অপরিহার্য নয়। কিন্তু চুক্তিকে সম্পূর্ণভাবে বাতিল করে দেয়ার পূর্বে তাদের বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করাও জায়েয নয়। বরং এর বিরুদ্ধে পন্থা হল এই যে, প্রতিপক্ষকে শান্ত পরিস্থিতিতে এবং অবকাশের অবস্থায় এ ব্যাপারে অবহিত করে দিতে হবে যে, তোমাদের কুটিলতা ও বিরুদ্ধাচরণের বিষয়টি আমাদের নিকট প্রকাশ হয়ে পড়েছে কিংবা তোমাদের আচার-আচরণ আমাদের সন্দেহজনক বলে মনে হচ্ছে। তাই আমরা আগামীতে এই চুক্তি পালনে বাধ্য থাকব না; তোমাদেরও সব রকম অধিকার থাকবে যে, তোমরা আমাদের বিরুদ্ধে যা ইচ্ছা করতে পার। কিন্তু ঘোষণাটি এমনভাবে হতে হবে যেন মুসলমান ও অপর পক্ষ এতে সমান সমান হয়। অর্থাৎ এমন অবস্থা যেন সৃষ্টি করা না হয় যে, এই ঘোষণা ও সতর্কীকরণের পূর্ব থেকেই তাদের বিরুদ্ধে মোকাবেলা করার প্রস্তুতি নিয়ে নেবে এবং তারা চিন্তামুক্ত হয়ে থাকার দরুন প্রস্তুতি নিতে পারবে না। বরং যে কোন প্রস্তুতি নিতে হয়, তা এই ঘোষনা ও সতর্কীকরণের পরেই নেবেন।

এই হল ইসলামের ন্যায় ও সুবিচার যে, এতে বিশ্বাসঘাতক শত্রুদেরও হক বা অধিকারের হেফাযত করা হয় এবং মুসলমানদের উপরও তাদের মোকাবেলার ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা আরোপ করা হয় যে, চুক্তি প্রত্যাহারের পূর্বে তাদের বিরুদ্ধে কোন রকম প্রস্তুতিও যেন গ্রহন না করে।

(মাযহারী, মাআরেফুল কুরআন ৪/৩৩৭-৩৩৮)

আল্লাহর উপর ভরসা কর

ইরশাদ হয়েছে-

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ط إِنَّهُ هُوَ
السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (٦١) وَإِنْ يُرِيدُوا أَنْ يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ ط هُوَ

الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ (٦٢) وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ ط لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَّا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (٦٣) يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ وَمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ (٦٤) (انفال ٦١ - ٦٤)

তরজমাঃ (৬১) আর যদি তারা সন্ধি করতে আগ্রহ প্রকাশ করে তাহলে তুমিও সেদিকে আগ্রহী হও এবং আল্লাহর উপর ভরসা কর। নিঃসন্দেহে তিনি শ্রবণকারী, পরিজ্ঞাত। (৬২) পক্ষান্তরে তারা যদি তোমাদেরকে প্রতারণা করতে চায়, তবে তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট, তিনিই তোমাকে শক্তি যুগিয়েছেন স্বীয় সাহায্যে ও মুসলমানদের মাধ্যমে। (৬৩) আর প্রীতি সঞ্চার করেছেন তাদের অন্তরে। যদি তুমি সেসব কিছু ব্যয় করে ফেলতে যা কিছু যমীনের বুকে রয়েছে, তাদের মনে প্রীতি সঞ্চার করতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ তাদের মনে প্রীতি সঞ্চার করেছেন। নিঃসন্দেহে তিনি পরাক্রমশালী, সুকৌশলী। (৬৪) হে নবী! আপনার জন্য এবং যেসব মুসলমান আপনার সাথে রয়েছে তাদের সবার জন্য আল্লাহ যথেষ্ট। (সূরা আনফাল ৬১-৬৪)

তাফসীরঃ প্রথম আয়াতে সন্ধির বিধি-বিধান এবং সে সম্পর্কিত বর্ণনা রয়েছে। বলা হয়েছে–

وَإِنْ جَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ

সীন বর্ণের উপর যবর (–) এবং সীন বর্ণের নীচে যের (–) উভয় উচ্চারণেই সন্ধি অর্থে ব্যবহৃত হয়। তাহলে আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় এই যে, যদি কাফেররা কোন সময় সন্ধির প্রতি আগ্রহী হয়, তবে আপনাকেও তাই করা উচিত। এখানে নির্দেশ বাচক পদ উত্তমতা বুঝাবার জন্য ব্যবহার করা হয়েছে। মর্মার্থ এই যে, কাফেররা যদি সন্ধির প্রতি আগ্রহী হয়, তবে সেক্ষেত্রে আপনার এ অধিকার রয়েছে যে, সন্ধি করায় যদি মুসলমানদের কল্যাণ মনে করেন, তাহলে সন্ধি করতে পারেন। আর إِنْ جَنَحُوا এর শর্ত আরোপ করাতে বুঝা যাচ্ছে, সন্ধি তখনই করা যেতে পারে, যখন

কাফেরদের পক্ষ থেকে সন্ধির আগ্রহ প্রকাশ পাবে। কারণ তাদের আগ্রহ ব্যতীত যদি স্বয়ং মুসলমানগণ সন্ধির উদ্যোগ করে, তবে এতে দুর্বলতা প্রকাশ পাবে। তবে যদি এমন কোন পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, মুসলমানগণ অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে এবং নিজেদের প্রাণের নিরাপত্তার জন্য একমাত্র সন্ধি ছাড়া অন্য কোন পন্থা দেখা না যায়, তবে সেক্ষেত্রে ফেকাহ শাস্ত্রবিদদের মতে সন্ধির উদ্যোগ গ্রহণ করাও জায়েয। আর যদি শত্রুদের পক্ষ থেকে সন্ধির আগ্রহ প্রকাশে এমন কোন সম্ভাবনা বিদ্যমান থাকে যে, তারা মুসলমানদেরকে ধোঁকা দিয়ে, শৈথিল্যে ফেলে হঠাৎ আক্রমণ করে বসবে, সেজন্য আয়াতের শেষাংশে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হেদায়েত দান করা হয়েছে–

وَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْعَلِيْمُ

অর্থাৎ আপনি আল্লাহ তাআলার উপর ভরসা করুন। কারণ তিনিই যথার্থ শ্রবণকারী পরিজ্ঞাত। তিনি তাদের কথাবার্তাও শোনেন এবং তাদের মনের গোপন ইচ্ছাও জানেন। তিনি আপনার সাহায্যের জন্য যথেষ্ট। কাজেই আপনি এহেন প্রমাণহীন আশঙ্কা-সম্ভাবনার উপর নিজ কাজের ভীত রাখবেন না। এসব আশঙ্কার বিষয়গুলোকে আল্লাহর উপর ছেড়ে দিন। তারপর দ্বিতীয় আয়াতে বিষয়টিকে আরো কিছুটা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে এভাবে বর্ণনা করেছেন।

وَاِنْ يُّرِيْدُوْٓا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ ۔ هُوَ الَّذِىْٓ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ

অর্থাৎ এ সম্ভাবনা যদি বাস্তবায়িত হয়ে যায়, সন্ধি করতে গিয়ে তাদের নিয়ত যদি খারাপ থাকে এবং আপনাকে যদি এভাবে ধোঁকা দিতে চায়, তবুও আপনি কোন পরোয়া করবেন না। আল্লাহ তাআলা আপনার জন্য যথেষ্ট। পূর্বেও আল্লাহর সাহায্য-সমর্থনেই আপনার কার্যসিদ্ধি হয়েছে। তিনি তাঁর বিশেষ সাহায্যে আপনার সহায়তা করেছেন, যা আপনার বিজয় ও কৃতকার্যতার ভিত্তি ও বাস্তব সত্য। আবার বাহ্যিকভাবে মুসলমানদের জামাআতকে আপনার সাহায্যে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন, যা ছিল বাহ্যিক উপকরণ। সুতরাং যিনি প্রকৃত মালিক ও মহান শক্তিমান, যিনি বিজয় ও

কৃতকার্যতার যাবতীয় উপকরণকে বাস্তবতায় রূপায়িত করেছেন। তিনি আজও শত্রুদের ধোঁকা-প্রতারণার ব্যাপরে আপনার সাহায্য করবেন। এ খোদায়ী ওয়াদার প্রেক্ষাপটেই এ আয়াত অবতরণের পর থেকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্র জীবনে এমন কোন ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়নি, যাতে শত্রুদের ধোঁকা-প্রতারণার দরুণ তাঁর কোন রকম কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে। সে কারণেই তাফসীরবিদগণ বলেছেন, ওয়াদাটি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য– وَاللّٰهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ ওয়াদারই অনুরূপ। কাজেই এ আয়াত নাযিল হওয়ার পর তাঁর রক্ষণাবেক্ষণে নিয়োজিত সাহাবায়ে কেরামকে নিশ্চিতভাবেই অব্যাহতি দিয়ে দেন। এতে একথাও বুঝা যায় যে, এ ওয়াদাটি বিশেষভাবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যই নির্দিষ্ট ছিল। অন্যান্য লোকদের পক্ষে বাহ্যিক ব্যবস্থা ও অগ্র-পশ্চাৎ অবস্থা অনুযায়ী কাজ করা উচিত।

(বয়ানুল কুরআন, মাআরেফুল কুরআন ৪/৩৪৪–৩৪৫)

চতুর্থ অধ্যায়
যুদ্ধের সময় নামায

ইরশাদ হয়েছেঃ

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِى الْاَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ اَنْ تَقْصُرُوْا مِنَ الصَّلٰوةِ صلے اِنْ خِفْتُمْ اَنْ يَّفْتِنَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ط اِنَّ الْكٰفِرِيْنَ كَانُوْا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِيْنًا (١٠١) وَاِذَا كُنْتَ فِيْهِمْ فَاَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ فَلْتَقُمْ طَآئِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوْآ اَسْلِحَتَهُمْ فَاِذَا سَجَدُوْا فَلْيَكُوْنُوْا مِنْ وَّرَآئِكُمْ وَلْتَأْتِ طَآئِفَةٌ اُخْرٰى لَمْ يُصَلُّوْا فَلْيُصَلُّوْا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوْا حِذْرَهُمْ وَاَسْلِحَتَهُمْ ج وَدَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوْ تَغْفُلُوْنَ عَنْ اَسْلِحَتِكُمْ وَاَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيْلُوْنَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَّاحِدَةً ط وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِنْ كَانَ بِكُمْ اَذًى مِّنْ مَّطَرٍ اَوْ كُنْتُمْ مَّرْضٰى اَنْ تَضَعُوْآ اَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوْا حِذْرَكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ اَعَدَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابًا مُّهِيْنًا (١٠٢) فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ج فَاِذَا اطْمَاْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ج اِنَّ الصَّلٰوةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ كِتٰبًا مَّوْقُوْتًا (١٠٣) (نساء ١٠١ - ١٠٣)

তরজমাঃ (১০১) আর যখন তোমরা কোন দেশে সফর কর তখন নামাযে কিছুটা হ্রাস করলে তোমাদের কোন গোনাহ নেই। যদি তোমরা আশঙ্কা কর যে, কাফেররা তোমাদেরকে উত্যক্ত করবে। নিশ্চয়ই কাফেররা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (১০২) যখন আপনি তাদের মধ্যে থাকেন,

অতঃপর নামাযে দাঁড়ান তখন যেন একদল দাড়ায় আপনার সাথে এবং তারা যেন স্বীয় অস্ত্র সাথে নেয়। অতঃপর যখন তারা সেজদা সম্পন্ন করে, তখন আপনার কাছ থেকে যেন সরে যায় এবং অন্য দল যেন আসে, যারা নামায পড়েনি। অতঃপর তারা যেন আপনার সাথে নামায পড়ে এবং আত্মরক্ষার হাতিয়ার সাথে নেয়। কাফেররা চায় যে, তোমরা কোনরূপে অসতর্ক থাক, যাতে তারা একযোগে তোমাদেরকে আক্রমণ করে বসে। যদি বৃষ্টির কারণে তোমাদের কষ্ট হয় অথবা তোমরা অসুস্থ হও, তবে স্বীয় অস্ত্র পরিত্যাগ করায় তোমাদের কোন গোনাহ নাই এবং সাথে নিয়ে নাও তোমাদের আত্মরক্ষার অস্ত্র। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ কাফেরদের জন্যে অপমানকর শাস্তি প্রস্তত করে রেখেছেন। (১০৩) অতঃপর যখন তোমরা নামায সম্পন্ন কর, তখন দণ্ডায়মান, উপবিষ্ট ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহ্কে স্মরণ কর। অতঃপর যখন বিপদ মুক্ত হয়ে যাও, তখন নামায ঠিক করে পড়। নিশ্চয়ই নামায মুসলমানদের উপর ফরয নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে। (নিসা ১০১-১০৩)

তাফসীরঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রে জিহাদ ও হিজরতের জন্যে সফর করতে হয় এবং এ জাতীয় সফরে শত্রুদের পক্ষ থেকে বিপদাশঙ্কাও থাকে। তাই সফর ও আতঙ্কাবস্থার প্রতি লক্ষ্য রেখে নামাযে প্রদত্ত বিশেষ লঘুতা ও সংক্ষিপ্ততা আলোচ্য আয়াতসমূহে বর্ণিত হয়েছে।

সফর ও কসরের বিধান

ট তিন মনযিল থেকে কম দূরত্বের সফরে পূর্ণ নামায পড়া হয়।

ট সফর শেষ করে গন্তব্য স্থলে পৌঁছার পর যদি সেখানে পনের দিনের কম সময় অবস্থান করার ইচ্ছা থাকে, তবে সে অবস্থানও সফরের অন্তর্ভুক্ত। এমতাবস্থায় চার রাকাত বিশিষ্ট ফরয নামায অর্ধেক পড়তে হবে। একে শরীঅতের পরিভাষায় 'কসর' বলা হয়। পক্ষান্তরে যদি একই জনপদে পনের দিন অথবা তদুর্ধ্ব সময় অবস্থান করার ইচ্ছা থাকে, তবে তা সাময়িক বাসস্থান' হিসেবে গণ্য হবে। এমন জায়গায় স্থায়ী বাসস্থানের মত কসর পড়তে হবে না- পূর্ণ নামায পড়তে হবে।

ট কসর শুধু তিন ওয়াক্তের ফরয নামাযে হবে। মাগরিব, ফজর এবং সুন্নাত ও বেতের নামাযে কসর নেই।

ট পূর্ণ নামাযের স্থলে অর্ধেক পড়ার মধ্যে কারও মনে এরূপ ধারণা আনাগোনা করে যে, বোধ হয় এতে নামায পূর্ণ হলো না, এটা ঠিক নয়। কারণ, কসরও শরীঅতেরই নির্দেশ। এ নির্দেশ পালনে গোনাহ হয় না; বরং সওয়াব পাওয়া যায়।

ট আয়াতে وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلٰوةَ বলা হয়েছে। অর্থাৎ (আপনি যখন তাদের মধ্যে থাকেন) এতে এরূপ মনে করার অবকাশ নেই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তিরোধানের পর এখন 'সালাতুল খওফ' এর বিধান নেই। কেননা তখনকার অবস্থা অনুযায়ী আয়াতে এ শর্ত বর্ণিত হয়েছে– নবী বিদ্যমান থাকলে ওজর ব্যতীত অন্য কেউ নামাযে ইমাম হতে পারে না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর এখন যে ইমাম হবেন, তিনিই তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন এবং 'সালাতুল খওফ' পড়াবেন। সব ফিকাহবিদদের মতে সালাতুল খওফের বিধান এখনও অব্যাহত রয়েছে, রহিত হয়নি।

ট মানুষের পক্ষ থেকে বিপদাশঙ্কার কারণে 'সালাতুল খওফ' পড়া যেমন জায়েয; তেমনিভাবে যদি বাঘ-ভাল্লুক কিংবা অজগর ইত্যাদির ভয় থাকে এবং নামাযের সময়ও সংকীর্ণ হয়, তাহলে তখনও 'সালাতুল খওফ' পড়া জায়েয।

ট আয়াতে উভয় দলের এক এক রাকাআত পড়ার নিয়ম বর্ণিত হয়েছে। দ্বিতীয় রাকাআতের নিয়ম হাদীসে উল্লেখিত রয়েছে। (বিস্তারিত বিবরণ হাদীসে দ্রষ্টব্য) [মাআরেফুল কুরআন ২/৬০৮–৬০৯)

পঞ্চম অধ্যায়

জিহাদ বিমুখতা এবং রণাঙ্গন থেকে ফেরার হওয়ার পরিণতি

সব কিছুই আল্লাহর হাতে

ইরশাদ হয়েছে–

ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً نُّعَاسًا يَّغْشٰى طَآئِفَةً مِّنْكُمْ
وَطَآئِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ
الْجَاهِلِيَّةِ ط يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ شَيْءٍ ط قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ
لِلّٰهِ ط يُخْفُوْنَ فِيْ اَنْفُسِهِمْ مَّا لَا يُبْدُوْنَ لَكَ ط يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ
الْاَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا ط قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ فِيْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ
كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ ج وَلِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ
وَلِيُمَحِّصَ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ (١٥٤) اِنَّ
الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ لا اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ
بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا ج وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ عَنْهُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ
(١٥٥) يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ
اِذَا ضَرَبُوْا فِي الْاَرْضِ اَوْ كَانُوْا غُزًّى لَّوْ كَانُوْا عِنْدَنَا مَا مَاتُوْا وَمَا
قُتِلُوْا ج لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِيْ قُلُوْبِهِمْ ط وَاللّٰهُ يُحْيٖ وَيُمِيْتُ
وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ (١٥٦) (ال عمران: ١٥٤-١٥٦)

তরজমাঃ (১৫৪) অতঃপর তিনি তোমাদের উপর শোকের পর শান্তি অবতীর্ণ করলেন, যা ছিল তন্দ্রার মত। সে তন্দ্রায় তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ ঝিমোচ্ছিল আর কেউ কেউ প্রাণের ভয়ে ভাবছিল। আল্লাহ সম্পর্কে তাদের মিথ্যা ধারণা হচ্ছিল মুর্খদের মত। তারা বলছিল আমাদের হাতে কি

কিছুই করার নেই? তুমি বল, সবকিছুই আল্লাহর হাতে। তারা যা কিছু মনে লুকিয়ে রাখে তোমার নিকট প্রকাশ করে না সে সবও। তারা বলে আমাদের হাতে যদি কিছু করার থাকত, তাহলে আমরা এখানে নিহত হতাম না। তুমি বল, তোমরা যদি নিজেদের ঘরেও থাকতে, তারা অবশ্যই বেরিয়ে আসত নিজেদের অবস্থান থেকে যাদের মৃত্যু লিখে দেয়া হয়েছে। তোমাদের বুকে যা রয়েছে তার পরীক্ষা করা ছিল আল্লাহর ইচ্ছা, আর তোমাদের অন্তরে যা কিছু রয়েছে তা পরিষ্কার করা ছিল তাঁর কাম্য। আল্লাহ্ মনের গোপন বিষয় জানেন। (১৫৫) তোমাদের যে দুটি দল লড়াইয়ের দিনে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল শয়তান তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল, তাদেরই পাপের দরুন। অবশ্য আল্লাহ্ তাদেরকে মাফ করেছেন। নিশ্চয়ই– আল্লাহ্ ক্ষমাপরায়ণ ও পরম সহনশীল। (১৫৬) হে ঈমানদারগণ! তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা কাফের হয়েছে এবং নিজেদের ভাই-বন্ধুরা যখন কোন অভিযানে বের হয় কিংবা জিহাদে যায়, তখন তাদের সম্পর্কে বলে– তারা যদি আমাদের সাথে থাকত, মরতোও না, নিহতও হতো না। যাতে তারা এ ধারণা সৃষ্টির মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের মনে অনুতাপ সৃষ্টি করতে পারে। অথচ আল্লাহই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন। তোমাদের সমস্ত কাজই তোমরা যা কিছুই কর না কেন, আল্লাহ্ সবকিছুই দেখেন। (সূরা আলে-ইমরান ১৫৪–১৫৬)

তাফসীরঃ উল্লেখিত আয়াতসমূহে কিছু সংখ্যক সাহাবী উহুদের যুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে যাওয়া এবং স্বয়ং হুযূরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আহবান করার পরও ফিরে না আসা আর সেজন্য হুযূরের দুঃখিত হওয়া এবং সে কারণে শেষ পর্যন্ত সাহাবায়ে কেরামের দুঃখিত হওয়ার বিষয় আলোচিত হয়েছে।

তাফসীরে রূহুল মাআনী প্রণেতা এই ঘটনার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, প্রথমে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহবান করেন যা সাহাবায়ে কেরাম শুনতে পাননি এবং তারা বহু দুরে চলে যান। শেষ পর্যন্ত

হযরত কাআব ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহুর ডাক শুনতে পেয়ে সবাই এসে সমবেত হন।

তাফসীরে বয়ানুল কুরআনে হযরত হাকীমুল উম্মত বলেন, সাহাবীগনের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে পড়ার মূল কারণ ছিল হুযূর আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাহাদতের সংবাদ। পক্ষান্তরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ডাকলেন, তখন তাতে একেতো এ দুঃসংবাদের কোন খণ্ডন ছিল না, তদুপরি আওয়াজ যদি পৌছেও থাকে, তাঁরা চিনতে পারেনি। তারপর যখন হযরত কাআব ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু ডাকলেন তখন তাতে সে সংবাদের খণ্ডন এবং সাথে সাথে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেঁচে থাকার কথাও বলা হয়েছিল। কাজেই একথা শুনে সবাই শান্ত হলেন এবং ফিরে এসে একত্রে সমবেত হলেন। তবে প্রশ্ন থাকে যে, এতে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ভর্ৎসনা এবং রাসূলে কারীমসাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুঃখিত হলেন কেন? তার কারণ এ হতে পারে যে, সাহাবায়ে কেরাম যদি সে সময়টা মনের দিক দিয়ে দৃঢ় থাকতেন, তাহলে হুযূরের ডাকের শব্দ চিনতে পারতেন।

لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا

(যদি কিছু করার থাকতো তাহলে আমরা এখানে নিহত হতাম না)।

উপরোক্ত আয়াতে মুনাফেকদের উক্তি বর্ণিত হয়েছে যে, অর্থাৎ আমাদের যদি কোন ক্ষমতা থাকত, কিংবা আমাদের মতামত যদি গ্রহণ করা হত, তাহলে আমরা এখানে (এভাবে) নিহত হতাম না' পরেও বিষয়টি উদ্ধৃত করা হয়েছে। এমন ধরনের উক্তি শোনার কারণে নিষ্ঠাবান মুসলমানদের মনেও কিছুটা দুর্বলতা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। কাজেই উপরোল্লেখিত আয়াতসমূহে এ ধরনের উক্তি ও অবস্থা থেকে বেঁচে থাকার জন্য এবং হায়াত-মওতের ব্যাপারে একান্তভাবে আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত নিয়তি বা তাকদীরের উপর ভরসা করার জন্য মুসলমানদের হেদায়েত প্রদান করা হয়েছে। (মাআরেফুল কুরআন- ২/২৩০)

এসো আল্লাহর রাহে লড়াই কর

ইরশাদ হয়েছে–

وَمَآ اَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ - وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا وَقِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِ ادْفَعُوْا ط قَالُوْا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّا اتَّبَعْنٰكُمْ ط هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاِيْمَانِ ج يَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَالَيْسَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ ط وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُوْنَ (١٦٧) اَلَّذِيْنَ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوْا لَوْ اَطَاعُوْنَا مَاقُتِلُوْا ط قُلْ فَادْرَئُوْا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (١٦٨) (ال عمران ١٦٦-١٦٨)

তরজমাঃ (১৬৬) আর যেদিন দু দল সৈন্যের মোকাবিলা হয়েছে, সেদিন তোমাদের যা আপত্তি হয়েছে তা আল্লাহর হুকুমেই হয়েছে এবং এজন্য যে, যাতে ঈমানদারদিগকে জানা যায় (১৬৭) এবং তাদেরকে যাতে সনাক্ত করা যায় যারা মুনাফিক ছিল। আর তাদেরকে বলা হল এসো আল্লাহর রাহে লড়াই কর কিংবা শত্রুদিগকে প্রতিহত কর। তারা বলেছিল আমরা যদি জানতাম যে, লড়াই হবে, তাহলে অবশ্যই তোমাদের সাথে থাকতাম। সেদিন তারা ঈমানের তুলনায় কুফরীর কাছাকাছি ছিল। যা তাদের অন্তরে নেই তারা নিজের মুখে সে কথাই বলে। বস্তুতঃ আল্লাহ ভালভাবে জানেন তারা যা কিছু গোপন করে থাকে। (১৬৮) ওরা হলো সেসব লোক, যারা বসে থেকে নিজেদের ভাইদের সম্বন্ধে বলল যে, তারা যদি আমাদের কথা শুনত তবে নিহত হতো না। তাদেরকে বলে দিন এবার তোমাদের নিজেদের উপর থেকে মৃত্যুকে সরিয়ে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক।

(আলে-ইমরান ১৬৬–১৬৮)

তাফসীরঃ উহুদের যুদ্ধে মুসলমানদের উপর যত বিপদ এসেছে আসলে

তা শত্রুর শক্তি ও সংখ্যাধিক্যের কারণে আসেনি, বরং তোমাদের নিজেদেরই কোন কোন ত্রুটি-বিচ্যুতির দরুণ এসেছে। যেমন– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশ পালনে তোমাদের শৈথিল্য হয়ে যাওয়া। অতঃপর فَبِاِذْنِ اللّٰهِ আয়াতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, এসব যাই কিছু হয়েছে, সবই আল্লাহর ইচ্ছা ও সমর্থনে হয়েছে, যাতে নিহিত রয়েছে বহু হেকমত ও রহস্য। যেসব রহস্যের কিছু কিছু ইতিপূর্বেও বর্ণিত হয়েছে। তবে একটি রহস্য হচ্ছে এই যে, এভাবে আল্লাহ নিঃস্বার্থ মুমিনগণকেও দেখে নিবেন। অর্থাৎ যাতে মুমিনদের নিঃস্বার্থতা এবং মুনাফিকদের প্রতারণা এমনভাবে প্রকৃষ্ট হয়ে যায় যাতে যে কোন লোক তা দেখে নিতে পারে।

এখানে আল্লাহর দেখে নেয়ার অর্থ হল এই যে, পৃথিবীতে দেখার যেসব উপায় প্রচলিত রয়েছে, সে অনুযায়ী দেখে নেয়া। অন্যথায় আল্লাহ তো সর্বক্ষণই প্রত্যেক বস্তু ও বিষয় দেখছেন। বস্তুতঃ এই রহস্যটি এভাবে প্রকাশ পেয়েছে যে, কঠিন বিপদের সময় মুনাফিকরা সরে দাঁড়িয়েছে আর নিঃস্বার্থ মুমিনরা যুদ্ধে অনড়-অটল রয়েছেন। (মাআরেফুল কুরআন ২/২৫৮)

বাহানা করো না

ইরশাদ হয়েছে–

وَلَا تَتَّخِذُوْٓا اَيْمَانَكُمْ دَخَلًاۢ بَيْنَكُمْ فَتَزِلَّ قَدَمٌۢ بَعْدَ ثُبُوْتِهَا وَتَذُوْقُوا السُّوْٓءَ بِمَا صَدَدْتُّمْ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ۚ وَلَكُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ

(نحل ٩٤)

তরজমাঃ তোমরা স্বীয় কসম সমূহকে পারস্পরিক কলহ-দ্বন্দ্বের বাহানা করো না। তাহলে দৃঢ়রূপে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পা ফসকে যাবে এবং তোমরা শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করবে, এ কারণে যে, তোমরা আল্লাহর পথে বাধা দান করেছ এবং তোমাদের কঠোর শাস্তি হবে। (নাহলঃ ৯৪)

তাফসীরঃ তোমরা স্বীয় কসমসমূহকে পারস্পারিক অনাস্থা সৃষ্টির কারণ করো না (অর্থাৎ তোমরা অঙ্গীকার ও কসমসমূহ ভঙ্গ করো না)। কখনো (তা দেখে) অন্য কারও পা ফসকে না যায় দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর।

(অর্থাৎ, অন্যরাও তোমাদের অনুসরণ করবে এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ করতে থাকবে) অতঃপর তোমাদেরকে আল্লাহর পথে (অপরকে) বাধা দান করার কারণে কষ্ট ভোগ করতে হবে। কেননা, অঙ্গীকার পালন করা হচ্ছে আল্লাহর পথ। অথচ তোমরা তা ভঙ্গ করার কারণ হয়েছো। এ অবস্থায় তোমাদের কঠোর শাস্তি হবে।

সে আল্লাহর গযব নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে

ইরশাদ হয়েছে–

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْۤا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ (١٥) وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗۤ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰىهُ جَهَنَّمُ ؕ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ (١٦) (انفال ١٦-١٥)

তরজমাঃ (১৪) হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন কাফেরদের সাথে মুখোমুখি হবে, তখন পশ্চাদপসরণ করবে না। (১৬) আর যে লোক সেদিন তাদের থেকে পশ্চাদপসরণ করবে, অবশ্যই সে লড়াইয়ের কৌশল পরিবর্তন কল্পে কিংবা যে নিজ সৈন্যদের নিকট আশ্রয় নিতে আসে সে ব্যতীত অন্যরা আল্লাহর গযব সাথে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। আর তার ঠিকানা হল জাহান্নাম। বস্তুতঃ সেটা হল নিকৃষ্ট অবস্থান। (আনফাল ১৫–১৬)

তাফসীরঃ উক্ত আয়াতদ্বয়ের প্রথমটিতে ইসলামের একটি সমর নীতি বাতলে দেয়া হয়েছে। প্রথম আয়াতে زَحْفٌ শব্দের মর্মার্থ হল উভয় বাহিনীর মোকাবেলা ও মুখোমুখি সংঘর্ষ। অর্থাৎ এভাবে যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে যাওয়ার পর পশ্চাদপসরণ এবং যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পালিয়ে যাওয়া মুসলমানদের জন্যে জায়েয নয়। দ্বিতীয় আয়াতে এই হুকুমের আওতা থেকে একটি অব্যাহতি এবং নাজায়েয পন্থায় পালনকারীদের সুকঠিন আযাবের বিষয় বর্ণনা করা হয়েছে।

দুটি অবস্থার ক্ষেত্রে অব্যাহতি রয়েছে–

اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ

অর্থাৎ যুদ্ধাবস্থায় পশ্চাদপসরণ করা দুই অবস্থায় জায়েয রয়েছে। প্রথমতঃ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে এ পশ্চাদপসরণ হবে শুধুমাত্র একটি যুদ্ধের কৌশল স্বরূপ, শত্রুকে দেখানোর জন্য। প্রকৃত পক্ষে এতে যুদ্ধ ছেড়ে পলায়নের কোন উদ্দেশ্য থাকবে না। বরং প্রতিপক্ষকে অসতর্ক অবস্থায় ফেলে হঠাৎ আক্রমণ করাই থাকবে এর প্রকৃত উদ্দেশ্য। এটা হল اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ এর অর্থ। কারণ تَحَرُّفٌ অর্থ হয় কোন একদিকে ঝুঁকে পড়া। (রূহুল মাআনী)

দ্বিতীয়তঃ বিশেষ কোন অবস্থা যাতে সমর ক্ষেত্র থেকে পশ্চাদপসরণের অনুমতি রয়েছে, তাহল এই যে, নিজেদের উপস্থিত সৈন্যদের দুর্বলতা বোধ করে সেজন্যে পেছনের দিকে সরে আসা যাতে মুজাহিদগণ অতিরিক্ত শক্তি অর্জন করে নিয়ে পুণরায় আক্রমণ করতে সমর্থ হয়। اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ এর অর্থ তাই। কারণ تَحَيُّزٌ এর আভিধানিক অর্থ হল মিলিত হওয়া এবং فِئَةٌ অর্থ দল। কাজেই এর মর্মার্থ হচ্ছে এই যে, নিজেদের দলের সাথে মিলিত হয়ে শক্তি অর্জন করে নিয়ে পুণরায় আক্রমণ করার উদ্দেশ্যে সমরাঙ্গন থেকে পেছনের দিকে সরে আসলে তা জায়েয। এই স্বতন্ত্রতার বর্ণনার পর সেসব লোকের শাস্তির কথা বলা হয়েছে, যারা এই স্বতন্ত্রবস্থা ছাড়াই অবৈধভাবে যুদ্ধ ক্ষেত্র ত্যাগ করেছে কিংবা পশ্চাদপসরণ করেছে।

ইরশাদ হয়েছে–

فَقَدْ بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰهُ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ

অর্থাৎ যুদ্ধ ক্ষেত্র ছেড়ে যারা পালিয়ে যায় তারা আল্লাহ তাআলার গযব নিয়ে ফিরে যায় এবং তাদের ঠিকানা জাহান্নাম। আর সেটি হল নিকৃষ্ট অবস্থান।

এ আয়াত দুটির দ্বারা এই নির্দেশ বুঝা যাচ্ছে যে, প্রতিপক্ষ সংখ্যা, শক্তি ও আড়ম্বরের দিক দিয়ে যত বেশীই হোক না কেন, মুসলমানদের জন্য

তাদের মোকাবেলা থেকে পশ্চাদপসরণ করা হারাম। দুটি স্বতন্ত্র অবস্থা ব্যতীত। তা হল এই যে, এই পশ্চাদপসরণ পলায়নের উদ্দেশ্যে হবে না। বরং তা হবে পাঁয়তারা, পরিবর্তন কিংবা শক্তি অর্জনের মাধ্যমে পুনরাক্রমনের উদ্দেশ্যে। (মাআরেফুল কুরআন ৪/২৪৩-২৪৪)

পলায়ন করা তোমাদের কাজে আসবে না

ইরশাদ হয়েছে-

قُلْ لَّنْ يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ وَاِذًا لَّاتُمَتَّعُوْنَ اِلَّا قَلِيْلاً (١٦) قُلْ مَنْ ذَا الَّذِىْ يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ اِنْ اَرَادَ بِكُمْ سُوْٓءًا اَوْ اَرَادَبِكُمْ رَحْمَةً ط وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا (١٧) قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَالْقَآئِلِيْنَ لِاِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ اِلَيْنَا ج وَلَا يَأْتُوْنَ الْبَأْسَ اِلَّا قَلِيْلاً (١٨) اَشِحَّةً عَلَيْكُمْ فَاِذَا جَآءَ الْخَوْفُ رَاَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ تَدُوْرُ اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِىْ يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ج فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ اَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ط اُولٰٓئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوْا فَاَحْبَطَ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا (١٩) يَحْسَبُوْنَ الْاَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوْا ج وَاِنْ يَّأْتِ الْاَحْزَابُ يَوَدُّوْا لَوْ اَنَّهُمْ بَادُوْنَ فِى الْاَعْرَابِ يَسْاَلُوْنَ عَنْ اَنْبَآئِكُمْ ط وَلَوْ كَانُوْا فِيْكُمْ مَّا قٰتَلُوْٓا اِلَّا قَلِيْلاً (٢) (احزاب ١٦ - ٢)

তরজমাঃ (১৬) বলুন, তোমরা যদি মৃত্যু অথবা হত্যা থেকে পলায়ন কর, তবে এ পলায়ন তোমাদের কাজে আসবে না। তখন তোমাদেরকে সামান্যই ভোগ করতে দেয়া হবে। (১৭) বলুন! কে তোমাদেরকে আল্লাহ থেকে রক্ষা করবে যদি তিনি তোমাদের অমঙ্গল ইচ্ছা করেন অথবা তোমাদের প্রতি অনুকম্পার ইচ্ছা করেন? তারা আল্লাহ ব্যতীত নিজেদের

কোন অভিভাবক ও সাহায্যদাতা পাবে না। (১৮) আল্লাহ খুব জানেন তোমাদের মধ্যে কারা তোমাদেরকে বাধা দেয় এবং কারা তাদের ভাইদেরকে বলে আমাদের কাছে এস। তারা কমই যুদ্ধ করে। (১৯) তারা তোমাদের প্রতি কুণ্ঠাবোধ করে। যখন বিপদ আসে, তখন আপনি দেখবেন মৃত্যু ভয়ে অচেতন ব্যক্তির মত চোখ উল্টিয়ে তারা আপনার প্রতি তাকায়। অতঃপর যখন বিপদ টলে যায়, তখন তারা ধন-সম্পদ লাভের আশায় তোমাদের সাথে বাক চাতুরীতে অবতীর্ণ হয়। তারা মুমিন নয়। তাই আল্লাহ তাদের কর্মসমূহ নিস্ফল করে দিয়েছেন। এটা আল্লাহর জন্য সহজ। (২০) তারা মনে করে শত্রু বাহিনী চলে যায়নি। যদি শত্রু বাহিনী আবার এসে পড়ে, তবে তারা কামনা করবে যে, যদি তারা গ্রামবাসীদের মধ্য থেকে তোমাদের সংবাদাদি জেনে নিত, তবেই ভাল হত। তারা তোমাদের মধ্যে অবস্থান করলেও যুদ্ধ সামান্যই করত। (সূরা আহযাব ১৬-২০)

তাফসীরঃ আল্লাহ্ পাক বলেন– اِنْ يُّرِيْدُوْنَ اِلَّا فِرَارًا অর্থাৎ তারা কেবল পালিয়ে থাকতে চায়, তবে তোমাদের এরূপ পালানো কোন উপকারে আসবে না যদি তোমরা এর মাধ্যমে মৃত্যু বা হত্যা থেকে পালাতে চাও। এ পালানোর ফলে সামান্য কয়েক দিন ব্যতীত নির্ধারিত অবশিষ্ট আয়ুষ্কাল জীবনে আর অধিক লাভবান হতে পারবে না। অর্থাৎ পালানোর ফলে আয়ু বৃদ্ধি পাবে না। কেননা এর সময় নির্ধারিত তা যখন নির্ধারিত তখন না পালালেও নির্ধারিত সময়ের আগে মৃত্যুবরণ করতে পারবে না। সুতরাং অবস্থান করলে কোন ক্ষতি নেই; আর পালালেও কোন লাভ নেই। সুতরাং পলায়ন করা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ও নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। বস্তুতঃ এই তাকদীরের মাসআলা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে তাদেরকে আপনি বলে দিন যে, যদি আল্লাহ্ তোমাদের কোন ক্ষতি সাধন করতে চান, তবে তোমাদেরকে তাঁর থেকে কে রক্ষা করতে পারবে। উদাহরণতঃ যদি তোমাদেরকে তিনি ধ্বংস করতে চান, তবে তোমাদের কেউ রক্ষা করতে সক্ষম হবে কি? যেমন তোমরা পালানোকে লাভজনক হবে মনে কর। অথবা সে কে যে, তোমাদের উপর থেকে আল্লাহর অনুগ্রহকে রোধ করতে পারে। যদি তিনি তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে চান? কথা হল যদি তিনি জীবন্ত রাখতে চান– যা পার্থিব অনুগ্রহের অন্তর্গত, তবে কেউ তাতে প্রতিবন্ধকতা আরোপ করতে পারবে

না। যেমন তোমরা যুদ্ধ ক্ষেত্রে অবস্থানকে তোমাদের জীবন হরণকারী ও আয়ুহ্রাসকারী বলে মনে কর এবং তারা যেন স্মরণ রাখে যে, আল্লাহ ভিন্ন নিজেদের কোন সাহায্যকারী পাবে না যে, তাদের কোন উপকার সাধন করতে পারে আর কোন সহায়কও পাবে না যে তাদেরকে ক্ষতি ও দুঃখ-যন্ত্রণা থেকে রক্ষা করতে পারে। (মাআরেফুল কুরআন– ৭/৯৩–৯৪)

তাদের জন্য জিহাদ মঙ্গলজনক হবে

ইরশাদ হয়েছে–

وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا لَوْ لَا نُزِّلَتْ سُورَةٌ فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأَوْلَى لَهُمْ (٢) طَاعَةٌ وَقَوْلٌ مَعْرُوفٌ فَإِذَا عَزَمَ الْأَمْرُ فَلَوْ صَدَقُوا اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ (٢١) (محمد ٢ - ٢١)

তরজমাঃ (২০) যারা মুমিন তারা বলে, একটি সূরা নাযিল হয় না কেন? অতঃপর যখন কোন দ্ব্যর্থহীন সূরা নাযিল হয় এবং তাতে জিহাদের উল্লেখ করা হয়, তখন যাদের অন্তরে রোগ আছে, আপনি তাদেরকে মৃত্যু ভয়ে মুর্ছা প্রাপ্ত মানুষের মত আপনার দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখবেন। সুতরাং ধ্বংস তাদের জন্যে। (২১) তাদের আনুগত্য ও মিষ্ট বাক্য জানা আছে। অতএব জিহাদ সিদ্ধান্ত হলে যদি তারা আল্লাহর প্রতি প্রদত্ত অঙ্গীকার পূর্ণ করে, তবে তাদের জন্য মঙ্গলজনক হবে। (সূরা মুহাম্মাদ ২০–২১)

তাফসীরঃ যারা মুমিন, তারা তো সর্বদা উৎসুক থাকে যে, আরও কালাম নাযিল হোক যাতে ঈমান তাজা হয় এবং নতুন নতুন নির্দেশ আসলে তারও সওয়াব হাসিল করা যায়; আর সাবেক নির্দেশের তাকীদ আসলে আরও দৃঢ়তা অর্জিত হয়। এই উৎসুক্যের কারণে বলে কোন নতুন সূরা নাযিল হয় না কেন? নাযিল হলে আমাদের আশা পূর্ণ হত। অতঃপর যখন কোন দ্ব্যর্থহীন বিষয়বস্তুর সূরা নাযিল হয় এবং ঘটনাক্রমে তাতে জিহাদেরও পরিষ্কার উল্লেখ থাকে, তখন যাদের অন্তরে মুনাফেকীর রোগ আছে আপনি তাদেরকে মৃত্যু ভয়ে মুর্ছা প্রাপ্ত মানুষের মত ভয়ানক দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে দেখবেন।

এরূপ তাকানোর কারণ ভয় ও কাপুরুষতা। কারণ, এখন ঈমানের দাবী সপ্রমানের জন্যে তাদের জিহাদে যেতে হবে। তারা যে এভাবে আল্লাহর নির্দেশ থেকে গা বাঁচিয়ে চলে। অতএব আসল কথা এই যে, সত্ত্বরই তাদের দুর্ভোগ আসবে। দুনিয়াতেও কোন বিপদে গ্রেফতার হবে, নতুবা পরকালে তো অবশ্যই হবে। অবসর সময়ে যদিও তারা আনুগত্য ও খোশামোদের অনেক কথাবার্তা বলে, কিন্তু তাদের আনুগত্য ও মিষ্ট বাক্য অর্থাৎ মিষ্ট বাক্যের স্বরূপ জানা আছে। জিহাদের নির্দেশ নাযিল হওয়ার সময় তাদের অবস্থা দেখে এখন সবার কাছেই তা প্রকাশ হয়ে পড়েছে। অতঃপর জিহাদের নির্দেশ অবতীর্ণ হওয়ার পর যখন জিহাদের প্রস্তুতি হয়েই যায়, তখনও যদি তারা ঈমানের দাবীতে আল্লাহর কাছে সাচ্চা থাকে অর্থাৎ ঈমানের দাবী অনুযায়ী সাধারণভাবে সব নির্দেশ এবং বিশেষভাবে জিহাদের নির্দেশ পালন করে এবং খাঁটি মনে জিহাদ করে তবে তাদের জন্যে মঙ্গলজনক হবে। অর্থাৎ প্রথমে মুনাফিক থাকলে শেষেও যদি তাওবা করত; তবু তাদের ঈমান গ্রহণীয় হত।

অতঃপর জিহাদের তাকীদ এবং যারা জিহাদে যোগদান না করে গৃহে রয়ে গিয়েছিল, তাদেরকে সম্বোধন করে বলা হয়েছে, তোমরা যে জিহাদকে পছন্দ কর না, তাতে তো একটি পার্থিব ক্ষতিও আছে। সেমতে যদি তোমরা এমনিভাবে সবাই জিহাদ থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখ তবে সম্ভবতঃ তোমরা অর্থাৎ সব মানুষ পৃথিবীতে অনর্থ সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। অর্থাৎ জিহাদের বড় উপকারিতা হচ্ছে ন্যায়বিচার ও শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। যদি জিহাদ ত্যাগ করা হয়, তবে অনর্থকারীদের বিজয় হবে এবং সব মানুষের স্বার্থ সংরক্ষণের কোন ব্যবস্থা থাকবে না। এরূপ ব্যবস্থা না থাকার কারণে ব্যাপক দাঙ্গা-হাঙ্গামা ও অধিকার হরণ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়বে। সুতরাং যে জিহাদে পার্থিব উপকারও আছে তা থেকে পশ্চাতে সরে যাওয়া আরেক আশ্চর্যজনক ব্যাপার। (মাআরেফুল কুরআন ৮/২৫-২৬)

তারা আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না

ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَشَآقُّوا الرَّسُوْلَ مِنْۢ بَعْدِ

مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْهُدٰى لَنْ يَّضُرُّوا اللّٰهَ شَيْئًا ط وَسَيُحْبِطُ اَعْمَالَهُمْ

(محمد ٣٢)

তরজমাঃ নিশ্চয়ই যারা কাফের এবং আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে এবং নিজেদের জন্যে সৎপথ ব্যক্ত হওয়ার পর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরোধিতা করে, তারা আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না এবং তিনি ব্যর্থ করে দিবেন তাদের কর্মসমূহকে। (মুহাম্মদ ৩২)

তাফসীরঃ اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ আলোচ্য আয়াত মুনাফিক এবং ইয়াহুদী বনী-কুরাইযা ও বনু নুযায়ের সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, এই আয়াত সেসব মুনাফিকদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে, যারা বদর যুদ্ধের সময় কুরাইশ কাফেরদের সাহায্য করেছে এবং তাদের বারজন লোক সমগ্র কুরাইশ বাহিনীর পানাহারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। প্রত্যহ একজন লোক গোটা কাফের বাহিনীর পানাহারের ব্যবস্থা করত।

وَسَيُحْبِطُ اَعْمَالَهُمْ এখানে 'কর্ম বিনষ্ট' করার অর্থ এরূপ হতে পারে যে, ইসলামের বিরুদ্ধে তাদের প্রচেষ্টাকে সফল হতে দেবেন না; বরং ব্যর্থ করে দেবেন। এরূপ অর্থও হতে পারে যে, কুফুর ও নিফাকের কারণে তাদের সৎকর্ম সমূহ যেমন সদকা, খয়রাত ইত্যাদি সব নিস্ফল হয়ে যাবে– গ্রহণযোগ্য হবে না। (মাআরেফুল কুরআন ৮/৩৬)

আল্লাহ কখনো তাদেরকে ক্ষমা করবেন না

ইরশাদ হয়েছে–

اِنَّ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْا عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ مَاتُوْا وَهُمْ كُفَّارٌ فَلَنْ يَّغْفِرَ اللّٰهُ لَهُمْ (محمد ٣٤)

তরজমাঃ নিশ্চয়ই যারা কাফের এবং আল্লাহর পথ থেকে মানুষকে ফিরিয়ে রাখে অতঃপর কাফের অবস্থায় মারা যায়, আল্লাহ কখনই তাদেরকে ক্ষমা করবে না। (মুহাম্মদ ৩৪)

তাফসীরঃ উক্ত আয়াতে কাফেরদের পারলৌকিক ক্ষতি বর্ণনা করা হয়েছে যে, যারা মৃত্যু পর্যন্ত কুফর ও শিরককে আঁকড়ে ধরে রেখেছে তাদের বিধান এই যে, পরকালে কিছুতেই তাদের ক্ষমা করা হবে না।

(মাআরেফুল কুরআন ৮/৩৮–৩৯)

তারা সামান্য বোঝে

ইরশাদ হয়েছে–

سَيَقُوْلُ الْمُخَلَّفُوْنَ اِذَا انْطَلَقْتُمْ اِلٰى مَغَانِمَ لِتَأْخُذُوْهَا ذَرُوْنَا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّبَدِّلُوْا كَلٰمَ اللّٰهِ ط قُلْ لَّنْ تَتَّبِعُوْنَا كَذٰلِكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُوْلُوْنَ بَلْ تَحْسُدُوْنَنَا بَلْ كَانُوْا لَايَفْقَهُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا (فتح ١٥)

তরজমাঃ তোমরা যখন যুদ্ধলব্ধ ধন-সম্পদ সংগ্রহের জন্যে যাবে, তখন যারা পশ্চাতে থেকে গিয়েছিল, তারা বলবে, আমাদেরকেও তোমাদের সঙ্গে যেতে দাও। তারা আল্লাহর কালাম পরিবর্তন করতে চায়। বলুন, তোমরা কখনও আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে না। আল্লাহ্ পূর্ব থেকেই এরূপ বলে দিয়েছেন। তারা বলবে, বরং তোমরা আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করছ। পরন্ত তারা সামান্য বুঝে। (সূরা ফাতাহ ১৫)

তাফসীরঃ তোমরা সত্ত্বরই যখন খায়বরের যুদ্ধলব্ধ ধন-সম্পদ সংগ্রহের জন্যে যাবে, তখন যারা হুদায়বিয়ার সফর থেকে পশ্চাতে থেকে গিয়েছিল, তারা বলবে, আমাদেরকেও তোমাদের সাথে যাওয়ার অনুমতি দাও। এই আবেদনের কারণ ছিল যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহ্ করা। লক্ষণাদি দৃষ্টে এই সম্পদ লাভের বিষয় তাদের জানা ছিল এবং তারা তা প্রত্যাশাও করত। কিন্তু হুদায়বিয়ার সফরে কষ্ট ও ধ্বংসই অধিক প্রত্যাশিত ছিল। এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন, তারা আল্লাহর আদেশ পরিবর্তন করতে চায়। অর্থাৎ আল্লাহর আদেশ ছিল এই যে, এই যুদ্ধে তারাই যাবে, যারা হুদায়বিয়া ও বাইআতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণ করেছিল। তাদের ব্যতীত অন্য কেউ যাবে না; বিশেষতঃ তারা যাবে না যারা হুদায়বিয়ার সফরে অংশগ্রহণ করেনি এবং তাল-বাহানার আশ্রয়

নিয়েছে। অতএব বলে দিন তোমরা কিছুতেই আমাদের সাথে যেতে পারবে না। অর্থাৎ তোমাদের আবেদন আমরা মঞ্জুর করতে পারিনা। কারণ, এতে আল্লাহর আদেশ পরিবর্তন করার গোনাহ্ আছে। কেননা আল্লাহ্ প্রথম থেকেই এই কথা বলে দিয়েছেন। অর্থাৎ হুদায়বিয়া থেকে ফিরে আসার পথেই আল্লাহ্ তাআলা আদেশ দিয়েছেন যে, খায়বার যুদ্ধে হুদায়বিয়ায় অংশগ্রহণকারীদের ব্যতীত কেউ যাবে না। আপনার এই কথা শুনে উত্তরে তখন তারা বলবে, বাহ্যতঃ এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখের উপর বলা উদ্দেশ্য নয়, বরং তারা অন্যদেরকে বলবে যে, আমাদেরকে সাথে না নেয়ার ব্যাপারটি খোদায়ী আদেশ নয়। বরং তোমরা আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করছ। তাই আমাদের অংশগ্রহণ তোমাদের মনোঃপুত নয়। অথচ মুসলমানদের মধ্যে বিদ্বেষের কোন নাম গন্ধও নাই। বরং তারা অল্পই বুঝে। পুরোপুরি বুঝলে আল্লাহর এই আদেশের রহস্য অনায়াসেই বুঝতে পারত যে, হুদায়বিয়ায় মুসলমানেরা একটি বৃহত্তর আশংকার সম্মুখীন হয়েছে এবং অগ্নী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে। আর মুনাফিকরা তাদের পার্থিব স্বার্থকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। এটাই বিশেষভাবে মুসলমানদের খায়বার যুদ্ধে যাওয়ার এবং মুনাফিকদের বঞ্চিত হওয়ার কারণ। (মাআরেফুল কুরআন ৮/৭১-৭২)

ষষ্ঠ অধ্যায়
যুদ্ধক্ষেত্রে সতর্কতা ও গোপনীয়তার প্রয়োজনীয়তা

রটনা নিষিদ্ধ

ইরশাদ হয়েছে–

وَاِذَا جَاۤءَهُمْ اَمْرٌ مِّنَ الْاَمْنِ اَوِ الْخَوْفِ اَذَاعُوْا بِهٖ وَلَوْ رَدُّوْهُ اِلَى الرَّسُوْلِ وَ اِلٰۤى اُولِى الْاَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِيْنَ يَسْتَنْۢبِطُوْنَهٗ مِنْهُمْ ؕ وَلَوْ لَا فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهٗ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطٰنَ اِلَّا قَلِيْلًا

(نساء ٨٣)

তরজমাঃ আর যখন তাদের কাছে পৌঁছে কোন সংবাদ শান্তি সংক্রান্ত কিংবা ভয়ের, তখন তারা সেগুলোকে রটিয়ে দেয়। আর যদি সেগুলো পৌঁছে দিত রাসূল পর্যন্ত কিংবা তাদের শাসকদের পর্যন্ত তখন অনুসন্ধান করে দেখা যেত সেসব বিষয়, যা তাতে রয়েছে অনুসন্ধান করার মত। বস্তুতঃ আল্লাহর অনুগ্রহ ও করুণা যদি তোমাদের উপর বিদ্যমান না থাকত তবে তোমাদের অল্প কতিপয় লোক ব্যতীত সবাই শয়তানের অনুসরণ করতে শুরু করতে! (সূরা নিসা ৮৩)

তাফসীরঃ উক্ত আয়াত মুনাফিক কিংবা দুর্বল ঈমান ও কমজোর মুসলমানদের সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। যখন কোন নতুন বিষয় সম্পর্কিত সংবাদ এসে পৌছে, চাই সে সংবাদ শান্তির হোক কিংবা ভীতিজনক হোক। যেমন মুসলমানদের কোন বাহিনী কোন জিহাদে গিয়েছে এবং তাদের বিজয়ের সংবাদ এসে পৌছলে; এটা শান্তির সংবাদ। কিংবা তাদের পরাজিত হওয়ার খবর যদি আসে; এটা হল ভয়জনক সংবাদ তাহলে তারা সে সংবাদটিকে সঙ্গে সঙ্গে রটিয়ে দেয়। অথচ দেখা যায়, সেটি ছিল ভুল। আর যদি সঠিকও হয়ে থাকে, তথাপি অনেক সময় তার রটনা প্রশাসনিক

কল্যাণের বিরোধী হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে নিজের ভাবে প্রচার করার পরিবর্তে যদি এরা এ সংবাদটি রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এবং বিচক্ষণ সাহাবায়ে কেরামের মতামতের উপর অর্পণ করত এবং নিজেরা যদি এসব ব্যাপারে কোন রকম দখল না দিত, তাহলে এ সমস্ত খবরা-খবরের যথার্থতা কিংবা ভ্রান্ততা এবং এগুলো প্রচারযোগ্য কি নয় সে বিষয়ে তাঁরা উপলব্ধি করতে পারতেন যারা এসব বিষয় অনুসন্ধান করে থাকেন। যেমন করে সাধারণতঃ উপলব্ধি করে থাকেন। অতঃপর তাঁরা যে ব্যবস্থা করতে চান, সেমতেই এসব রটনাকারীদের কাজ করা উচিত ছিল। এসব ব্যাপারে তারা যদি কোন রকম হস্তক্ষেপ না করত, তাহলে এমনকি বিগড়ে যেত? (মাআরেফুল কুরআন ২/৫৬০-৫৬১)

আল্লাহর রীতিতে পরিবর্তন নেই

ইরশাদ হয়েছে–

لَئِنْ لَّمْ يَنْتَهِ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْمُرْجِفُوْنَ فِى الْمَدِيْنَةِ لَنُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ ثُمَّ لَا يُجَاوِرُوْنَكَ فِيْهَآ اِلَّا قَلِيْلًا (٦٠) مَلْعُوْنِيْنَ اَيْنَمَا ثُقِفُوْٓا اُخِذُوْا وَقُتِّلُوْا تَقْتِيْلًا (٦١) سُنَّةَ اللّٰهِ فِى الَّذِيْنَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا (٦٢) (احزاب ٦٠-٦٢)

তরজমাঃ (৬০) মুনাফিকরা এবং যাদের অন্তরে রোগ আছে এবং মদীনায় গুজব রটনাকারীরা যদি বিরত না হয়, তবে আমি অবশ্যই তাদের বিরুদ্ধে আপনাকে উত্তেজিত করব। অতঃপর এই শহরে আপনার প্রতিবেশী অল্পই থাকবে। (৬১) অভিশপ্ত অবস্থায় তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাবে ধরা হবে এবং প্রাণ বধ করা হবে। (৬২) যারা পূর্বে অতীত হয়ে গেছে, তাদের ব্যাপারে এটাই ছিল আল্লাহর রীতি। আপনি আল্লাহর রীতিতে কখনও পরিবর্তন পাবেন না। (আহযাব ৬০-৬২)

তাফসীরঃ উক্ত আয়াতসমূহ মুনাফিকদের মধ্যে থেকে যারা

মুসলমানদেরকে নির্যাতন করত এবং তাদের বিরুদ্ধে সদাসর্বদা মিথ্যা খবর রটনা করত। উদাহরণতঃ এখন অমুক শত্রুপক্ষ মদীনা আক্রমণ করবে এবং সকলকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। তাদের বিরুদ্ধে নাযিল হয়েছে।

(মাআরেফুল কুরআন ৭/২৪৯)

উক্ত আয়াত থেকে প্রমাণিত হল যে, মুসলমানদের উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠার কারণ হয়, এরূপ কোন গুজব ছড়ানো হারাম। (মাআরেফুল কুরআন ৭/২৫২)

কোন সংবাদ আসলে তা পরীক্ষা কর

ইরশাদ হয়েছে–

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّنُوْا أَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجَهَالَةٍ فَتُصْبِحُوْا عَلٰى مَا فَعَلْتُمْ نٰدِمِيْنَ (حجرات ٦)

তরজমাঃ হে মুমিনগণ! যদি কোন পাপাচারী ব্যক্তি তোমাদের কাছে কোন সংবাদ আনয়ন করে, তবে তোমরা তা পরীক্ষা করে দেখবে, যাতে অজ্ঞতাবশতঃ তোমরা কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতি সাধনে প্রবৃত্ত না হও এবং পরে নিজেদের কৃতকর্মের জন্যে অনুতপ্ত না হও। (হুজুরাত ৬)

তাফসীরঃ এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, কোন দুষ্ট ও পাপাচারী ব্যক্তি যদি কোন লোক বা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ আনয়ন করে, তবে যথোপযুক্ত তদন্ত ব্যতিরেকে তার সংবাদ অথবা সাক্ষ্য অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা জায়েয নয়। (মাআরেফুল কুরআন ৮/১১১)

সপ্তম অধ্যায়
যুদ্ধের ফলাফল

ইরশাদ হয়েছে–

فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوْتُ بِالْجُنُوْدِ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ مُبْتَلِيْكُمْ بِنَهَرٍ ج فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّيْ ج وَمَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَاِنَّهٗ مِنِّيْ اِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةًۢ بِيَدِهٖ ج فَشَرِبُوْا مِنْهُ اِلَّا قَلِيْلًا مِّنْهُمْ ط فَلَمَّا جَاوَزَهٗ هُوَ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ قَالُوْا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَالُوْتَ وَجُنُوْدِهٖ ط قَالَ الَّذِيْنَ يَظُنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلٰقُوا اللّٰهِ كَمْ مِّنْ فِئَةٍ قَلِيْلَةٍ غَلَبَتْ فِئَةً كَثِيْرَةًۢ بِاِذْنِ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ (البقرة: ٢٤٩)

তরজমাঃ অতঃপর যখন তালুত সৈন্য-সামন্ত নিয়ে বেরুল, তখন বলল– নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদিগকে পরীক্ষা করবেন একটি নদীর মাধ্যমে। সুতরাং যে লোক সেই নদীর পানি পান করবে সে আমার নয়। আর যে লোক তার স্বাদ গ্রহণ করলো না, নিশ্চয়ই সে আমার লোক। কিন্তু যে লোক হাতের আঁজলা ভরে সামান্য খেয়ে নিবে তার দোষ অবশ্য তেমন গুরুতর হবে না। অতঃপর সবাই পান করল সেই পানি সামান্য কয়েকজন ছাড়া। পরে তালুত যখন তা পার হলো এবং যারা তাঁর সাথে ছিল ঈমানদার যারা তাঁর সাথে ছিল, তখন তারা বলতে লাগল, আজকের দিনে তালুত এবং সৈন্য বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার শক্তি আমাদের নাই। যাদের ধারণা ছিল যে, আল্লাহর সামনে তাদের একদিন উপস্থিত হতে হবে, তারা বারবার বলতে লাগল, সামান্য দলই বিরাট দলের মোকাবিলায় জয়ী হয়েছে আল্লাহর হুকুমে। আর যারা ধৈর্যশীল আল্লাহ তাদের সাথে রয়েছেন। (বাকারা ২৪৯)

তালুত ও জালুতের কাহিনী

তাফসীর ঃ হে সম্বোধিত ব্যক্তি! তুমি কি বনী ইসরাঈলের সে কাহিনী যা মূসা (আঃ)-এর পরে ঘটেছিল অবগত হওনি। যার পূর্বেই তাদের উপর কাফের জালুত বিজয় অর্জন করে তাদের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য জনপদ অধিকার করে নিয়েছিল? যখন তারা তাদের এক নবীকে বলল যে, আমাদের জন্য একজন বাদশাহ নিযুক্ত করে দিন যাতে আমরা তাঁর সাথে মিলে আল্লাহর পথে জালুতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে পারি। সে নবী বললেন, এমন কোন সম্ভাবনা কি আছে, যদি তোমাদেরকে জিহাদের আদেশ দেওয়া হয়, তবে তোমরা সে সময় জিহাদ করবে না? তখন তারা বলল এমনকি কারণ থাকতে পারে, যার জন্য আমরা আল্লাহর রাহে জিহাদ করব না। অথচ জিহাদের একটি কারণও রয়েছে যে, সে কাফেররাই আমাদেরকে নিজেদের আবাসভূমি এবং ছেলে-মেয়েদের কাছ থেকেও বিতাড়িত করেছে। কেননা তাদের কোন জনপদ কাফেররা দখল করে নিয়েছিল এবং তাদের ছেলে-মেয়েদেরকেও বন্দী করেছিল। অতঃপর তাদেরকে জিহাদ করার আদেশ দেয়া হলো। তখন মাত্র ক'টি ছোট দল ছাড়া সবাই বিরত রইল। তাদেরকে তাদের নবী বললেন, আল্লাহ তাআলা তালুতকে তোমাদের বাদশাহ নিযুক্ত করেছেন। তারা তখন বলতে লাগলো, তার পক্ষে আমাদের উপর রাজত্ব করার কি অধিকার থাকতে পারে? অথচ তাঁর তুলনায় রাজত্ব করার অধিকার আমাদেরই বেশী। আর তাঁকে আর্থিক সঙ্গতিও আমাদের চাইতে বেশী দেয়া হয়নি। কারণ, তালুত ছিল দরিদ্র। সে নবী উত্তরে বললেন, একেতো আল্লাহ তাআলা তোমাদের তুলনায় তাঁকে নির্বাচিত করেছেন এবং নির্বাচনের ভাল-মন্দ আল্লাহই বেশী অবগত এবং দ্বিতীয়তঃ রাজনীতি ও রাজ্য পরিচালনার জ্ঞান এবং শারীরিক সামর্থ্যের দিক দিয়ে তাঁকেই বেশী যোগ্যতা দিয়েছেন। বাদশাহ হওয়ার জন্য বিদ্যা ও শারীরিক যোগ্যতাই অধিক প্রয়োজন, যাতে রাজ্য পরিচালনা ও ব্যবস্থাপনা ভাল হবে এবং শারীরিক সামর্থ্যও এ অর্থে প্রয়োজন যে, পক্ষ ও বিপক্ষ সবার অন্তরে ভয়-ভীতির বিস্তার হবে এবং তৃতীয়তঃ আল্লাহ তাআলা রাজত্বের মালিক স্বীয় রাজত্ব যাকে ইচ্ছা দান করেন কোন প্রশ্নের তোয়াক্কা করেন না এবং চতুর্থতঃ আল্লাহ তাআলাই প্রাচুর্যদাতা তাকে দৌলত দিতে আল্লাহপাকের অসুবিধা

কিসে, অথচ সে সম্পর্কেই তোমাদের সন্দেহ হচ্ছে এবং আল্লাহপাক জানেন কে রাজত্ব করার যোগ্যতা রাখে। আর যখন তারা নবীকে বললো যে, যদি তাঁর বাদশাহ হওয়ার কোন প্রকাশ্য নিদর্শন আমরা দেখতে পাই, তবেই আমাদের মনে অধিক শান্তি ও দৃঢ়তা আসবে। তখন তাদের নবী বললেন, তাঁর আল্লাহর পক্ষ থেকে বাদশাহ নিযুক্ত হওয়ার নিদর্শন হচ্ছে এই যে, তোমাদের নিকট সেই সিন্দুকটি তোমাদের আনয়ন ছাড়াই এসে যাবে; যার মধ্যে শান্তি ও বরকতের বস্তু রয়েছে তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে এবং তাতে রয়েছে কিছু অবশিষ্ট বস্তু যা হযরত মূসা ও হযরত হারূন (আঃ) রেখে গিয়েছেন। তাদের কিছু পোষাক ইত্যাদি। এ সিন্দুকটি ফেরেশতাগণ নিয়ে আসবে। এভাবে সিন্দুকের আগমনেই তোমাদের জন্য পূর্ণ নিদর্শন রয়েছে যদি তোমরা বিশ্বাসী হয়ে থাক? অতঃপর যখন বনী ইসরাঈল তালুতকে বাদশাহ মেনে নিল এবং জালুতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য সমবেত হলো এবং তালুত সৈন্য নিয়ে নিজের স্থান বায়তুল মোকাদ্দাস থেকে আমালেকার দিকে রওয়ানা হলেন, তখন তিনি নবীর মাধ্যমে ওহী দ্বারা অবগত হয়ে সঙ্গীদের বললেন, এখন আল্লাহ তাআলা তোমাদের দৃঢ়তা ও স্থীরচিত্ততা সম্পর্কে তোমাদের পরীক্ষা করবেন একটি নহর দ্বারা। যা পথেই পড়বে এবং কঠিন পিপাসার সময় তা তোমরা পার হবে। সুতরাং যে ব্যক্তি তা থেকে অতিমাত্রায় পানি পান করবে তারা আমার দলভুক্ত নয়। আর যারা তা মুখেও না তুলবে সে আমার দলভুক্ত। কিন্তু যারা তাদের হাতে এক আঁজলা পান করবে তবে এতটুকু রেহাই দেয়া গেল, যা হোক রাস্তার সে নহর পূর্ণ পিপাসার সময় পার হতে হয়েছে, তাই সবাই তা থেকে মাত্রাতিরিক্তরূপে পানি পান করতে আরম্ভ করলো। তাদের মধ্যে সামান্য সংখ্যক লোক তা থেকে বিরত রইল। কেউ মোটেই পান করল না; আর কেউ কেউ এক আঁজলার বেশী পান করেনি। সুতরাং তালুত এবং তাঁর সাথের মুমিনগণ নহর অতিক্রম করলো আর তাদের দলকে দেখলো; দেখা গেল সামান্য কয়েকজন মাত্র রয়ে গেছে। তখন কেউ কেউ পরস্পর বলাবলি করতে লাগলো, আজ আমাদের দল এতো ক্ষুদ্র যে, এমতাবস্থায় আমাদের মধ্যে জালুত ও তার সেনাবাহিনীর সাথে যুদ্ধ করার ক্ষমতা নেই। একথা

শুনে এসব লোক যাদের এ ধারণা ছিল যে, তারা আল্লাহর সামনে উপস্থিত হবে বলতে লাগলো, অনেক ঘটনা এরূপ ঘটেছে যে, অনেক ছোট ছোট দল অনেক বড় বড় দলকে পরাজিত করেছে। আসল হচ্ছে দৃঢ়তা এবং আল্লাহ তাআলা দৃঢ় ব্যক্তিদের সাথে থাকেন। আর যখন তাঁরা আমালেকা অঞ্চলে পদার্পণ করেন এবং জালুত ও তার সৈন্যদের সামনে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন, বললেন– হে আমাদের পরওয়ারদেগার! তোমার পক্ষ থেকে আমাদের উপর দৃঢ়তা দান কর এবং আমাদেরকে কাফের জাতির উপর বিজয়ী কর। অতঃপর তালুত জালুতের বাহিনীকে আল্লাহ তাআলার আদেশে পরাজিত করলো এবং দাউদ (আঃ) যিনি তখন তালুত বাহিনীতে ছিলেন এবং তখনো নবুওয়ত প্রাপ্ত হননি জালুতকে হত্যা করলেন এবং বিজয়ী বেশে ফিরে এলেন। (মাআরেফুল কুরআন ১/৭২২–৭২৪)

মোকাবিলায় নিদর্শন রয়েছে

ইরশাদ হয়েছে–

قَدْ كَانَ لَكُمْ اٰيَةٌ فِىْ فِئَتَيْنِ الْتَقَتَا فِئَةٌ تُقَاتِلُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاُخْرٰى كَافِرَةٌ يَّرَوْنَهُمْ مِثْلَيْهِمْ رَأْىَ الْعَيْنِ ط وَاللّٰهُ يُؤَيِّدُ بِنَصْرِهٖ مَنْ يَّشَاءُ ط اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّاُولِى الْاَبْصَارِ (ال عمران ١٣)

তরজমাঃ নিশ্চয়ই দুটো দলের মোকাবিলার মধ্যে তোমাদের জন্য নিদর্শন ছিল। একটি দল আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করে। আর অপর দল ছিল কাফেরদের, এরা স্বচক্ষে তাদেরকে দ্বিগুণ দেখেছিল। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা নিজের সাহায্যের দ্বারা শক্তি দান করেন। এরই মধ্যে শিক্ষণীয় রয়েছে দৃষ্টি সম্পন্নদের জন্য। (আলে-ইমরান ১৩)

তাফসীরঃ নিশ্চয়ই তোমাদের প্রমাণের জন্যে বড় নমুনা রয়েছে দুই দলের ঘটনার মধ্যে, যারা পরস্পরে বদর যুদ্ধে একে অন্যের মুখোমুখি হয়েছিল। মুসলমান আল্লাহর পথে লড়াই করেছিল এবং অন্য দল ছিল কাফের। কাফেরদের সংখ্যা এত বেশী ছিল যে, কাফেররা নিজ দলকে

মুসলমানদের চেয়ে কয়েক গুণ বেশী দেখছিল। দেখা ও ধারণা-কল্পনায় দেখা নয়; বরং চাক্ষুষ দেখা। যার বাস্তবতা সম্পর্কে কোন সন্দেহ ছিল না। কিন্তু কাফেরদের সংখ্যা এত বেশী হওয়া সত্ত্বেও আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের জয়ী করেন। আসলে জয়-পরাজয় আল্লাহর হাতেই। আল্লাহ তাআলা বিশেষ সাহায্য দ্বারা যাকে ইচ্ছা শক্তি দান করেন। অতএব নিঃসন্দেহে এ ঘটনায় চাক্ষুষমানদের জন্যে বড় সাবধানবাণী ও দৃষ্টান্ত রয়েছে। (মাআরেফুল কুরআন ২/২২)

আল্লাহর উপরই ভরসা করা উচিত

ইরশাদ হয়েছে–

إِنْ يَنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ۚ وَإِنْ يَخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِي
يَنْصُرُكُمْ مِنْ بَعْدِهِ ۗ وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (ال عمران ١٦٠)

তরজমাঃ যদি আল্লাহ তোমাদের সহায়তা করেন, তাহলে কেউ তোমাদের উপর পরাক্রান্ত হতে পারবে না। আর যদি তিনি তোমাদের সাহায্য না করেন, তবে এমন কে আছে, যে তোমাদের সাহায্য করতে পারে? আর আল্লাহরই উপরই মুসলমানদের ভরসা করা উচিত।

(আলে ইমরান ১৬০)

তাফসীরঃ যদি মহান পরওয়ারদেগার তোমাদের সহায় থাকেন, তাহলে কেউ তোমাদের সাথে জিততে পারবে না। আর যদি তিনি তোমাদের সাহায্য না করেন, তাহলে এমন কে আছে? যে তোমাদেরকে বিজয়ী করবে। সুতরাং তোমাদের উচিত কেবল আল্লাহর উপর ভরসা করা।

গর্দানের উপর আঘাত হান

ইরশাদ হয়েছে–

إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِنَ
الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ (٩) وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ إِلَّا بُشْرَى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ
قُلُوبُكُمْ ۚ وَمَا النَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ۗ إِنَّ اللّٰهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ (١٠) إِذْ

يُغَشِّيكُمُ النُّعَاسَ اَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِّنَ السَّمَاءِ مَاءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ عَلٰى قُلُوْبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامَ (١١) اِذْ يُوْحِيْ رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ اَنِّيْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ط سَاُلْقِيْ فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا الرُّعْبَ فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ (١٢) (انفال: ٩-١٢)

তরজমাঃ (৯) তোমরা যখন ফরিয়াদ করতে আরম্ভ করেছিলে স্বীয় পরওয়ারদেগারের নিকট, তখন তিনি তোমাদের ফরিয়াদের মঞ্জুরী দান করলেন যে, আমি তোমাদিগকে সাহায্য করব ধারাবাহিকভাবে আগত হাজার ফেরেশতার মাধ্যমে। (১০) আর আল্লাহ্ তো শুধু সুসংবাদ দান করলেন যাতে তোমাদের মন আশ্বস্ত হতে পারে। আর সাহায্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ছাড়া অন্য কারও পক্ষ থেকে হতে পারে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ মহাশক্তির অধিকারী, হেকমতওয়ালা। (১১) যখন তিনি আরোপ করেন তোমাদের উপর তন্দ্রাচ্ছন্নতা নিজের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রশান্তির জন্য এবং তোমাদের উপর আকাশ থেকে পানি অবতরণ করেন, যাতে তোমাদিগকে পবিত্র করে দেন এবং যাতে তোমাদের থেকে অপসারিত করে দেন শয়তানের অপবিত্রতা। আর যাতে করে সুরক্ষিত করে দিতে পারেন তোমাদের অন্তর সমূহকে এবং তাতে যেন সুদৃঢ় করে দিতে পারেন তোমাদের পাগুলো। (১২) যখন নির্দেশ দান করেন ফেরেশতাদিগকে তোমাদের পরওয়ারদেগার যে, আমি সাথে রয়েছি তোমাদের। সুতরাং তোমরা মুসলমানদের চিত্ত সমূহকে ধীরস্থির করে রাখ। আমি কাফেরদের মনে ভীতির সঞ্চার করে দেব। কাজেই গর্দানের উপর আঘাত হান এবং তাদেরকে কাট জোড়ায় জোড়ায়। (সূরা আনফাল ৯–১২)

তাফসীরঃ উল্লেখিত আয়াতসমূহের মধ্যে থেকে প্রথম আয়াতদ্বয়ের দ্বারা সে ঘটনার বিবরণ দেয়া হয়েছে যা, বদর যুদ্ধে কাফেরদের সশস্ত্র বাহিনীর সাথে সম্মুখ সমর সাব্যস্ত হয়ে যাওয়ার পর ঘটেছিল। রাসূলে কারীম

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন লক্ষ্য করলেন যে, তাঁর সঙ্গী মাত্র তিনশ তের জন, তাও আবার অধিকাংশই নিরস্ত্র, অথচ তাদের মোকাবেলায় রয়েছে এক হাজার জওয়ানের সশস্ত্র বাহিনী, তখন তিনি আল্লাহ জাল্লা শানুহুর দরবারে সাহায্য ও সহায়তার জন্য প্রার্থনার হাত উঠালেন। তিনি দু'আ করছিলেন আর সাহাবায়ে কেরাম তাঁর সাথে 'আমীন' 'আমীন' বলে যাচ্ছিলেন। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রার্থনার নিম্নলিখিত বাক্যগুলো উদ্ধৃত করেছেন। 'ইয়া আল্লাহ! আমাদের সাথে যে ওয়াদা আপনি করেছেন তা যথাশীঘ্র পূরণ করুন। ইয়া আল্লাহ! মুসলমানদের এই সামান্য দলটি যদি নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, তাহলে পৃথিবীতে আপনার ইবাদত করার মত কেউ থাকবে না। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনর্গল এমনিভাবে বাষ্পরুদ্ধ কণ্ঠে দু'আয় তন্ময় হয়ে থাকেন। এমনকি তাঁর কাঁধ থেকে চাদর পড়ে যায়। হযরত আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহু এগিয়ে গিয়ে সে চাদর তাঁর গায়ে জড়িয়ে দেন এবং নিবেদন করেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি বিশেষ চিন্তা করবেন না আল্লাহ তাআলা অবশ্যই আপনার দু'আ কবুল করবেন এবং যে ওয়াদা তিনি করেছেন, তা অবশ্যই পূরণ করবেন। আয়াতে– إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ বাক্যের দ্বারা এ ঘটনাই উদ্দেশ্য। তার অর্থ হচ্ছে এই যে, সে সময়ের কথা মনে রাখার মত, যখন আপনি স্বীয় পরওয়ারদেগারের নিকট প্রার্থনা করছিলেন এবং তাঁর সাহায্য কামনা করছিলেন। এই প্রার্থনাটি যদিও রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকেই করা হয়েছিল কিন্তু সাহাবায়ে কেরামও যেহেতু তাঁর সাথে আমীন আমীন বলছিলেন, তাই সমগ্র দলের সাথেই একে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। অতঃপর এ প্রার্থনা মঞ্জুরীর বিষয়টি এভাবে বিবৃত হয়েছে فَاسْتَجَابَ অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা তোমাদের ফরিয়াদ গ্রহণ করেছেন এবং বলেছেন যে, এক হাজার ফেরেশতা দ্বারা তোমাদিগকে সাহায্য করব, যারা একের পর এক করে কাতার বন্দী অবস্থায় আসবে। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ফেরেশতাগণকে যে অসাধারণ শক্তি-সামর্থ্য দান করেছেন তার কিছুটা অনুমান করা যায় সে ঘটনার দ্বারা যা লুত (আঃ)-এর সম্প্রদায়ের জনপদকে উল্টে দেয়ার সময় ঘটেছিল।

জিবরাঈল (আঃ) একটি মাত্র পাখার ঝাপটার মাধ্যমে তা উল্টে দিয়েছিলেন। কাজেই এহেন অনন্য সাধারণ ক্ষমতা সম্পন্ন ফেরেশতাদের এত বিপুল সংখ্যককে এ মোকাবেলার জন্য পাঠানোর কোনই প্রয়োজন ছিল না; একজনই যথেষ্ট হতে পারত। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের প্রকৃতি সম্পর্কে যথার্থই অবগত। তারা যে সংখ্যার দ্বারাও প্রভাবিত হয়ে থাকে। তাই প্রতিপক্ষের সংখ্যানুপাতেই সমসংখ্যক ফেরেশতা পাঠানোর ওয়াদা করেছেন, যাতে তাঁদের মন পরিপূর্ণভাবে আশ্বস্ত হয়ে যায়। যা আল্লাহ নিজেই ব্যক্ত করেছেন যে, وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ

অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা এ ব্যবস্থা শুধুমাত্র এজন্য করেছেন যাতে তোমরা সুসংবাদ প্রাপ্ত হও এবং যাতে তোমাদের অন্তর আশ্বস্ত হয়ে যায়।

(মাআরেফুল কুরআন ৪/২৩১-২৩২)

اِذْ يُغَشِّيْكُمُ النُّعَاسَ

উক্ত আয়াত থেকে পরবর্তী আয়াত সমূহের মাধ্যমে আল্লাহর পক্ষ থেকে মুসলমানদের উপর দুটি নি'আমতের কথা আলোচনা করা হয়েছে। একটি হল– সবার উপর তন্দ্রা নেমে আসার ফলে ক্লান্তি-শ্রান্তি বিদূরিত হয়ে যাওয়া এবং দ্বিতীয়টি হল বৃষ্টির মাধ্যমে তাদের জন্য পানির ব্যবস্থা করে দেয়া এবং যুদ্ধক্ষেত্রটিকে তাদের জন্য সমতল আর শত্রুদের জন্য কর্দমাক্ত করে দেয়া।

(মাআরেফুল কুরআন ৪/২৩৬)

সবই আল্লাহর নিকট পৌঁছে

ইরশাদ হয়েছে–

اِذْ يُرِيْكَهُمُ اللّٰهُ فِىْ مَنَامِكَ قَلِيْلاً ط وَلَوْ اَرٰكَهُمْ كَثِيْرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمَ اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ (٤٣) وَاِذْ يُرِيْكُمُوْهُمْ اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِىْ اَعْيُنِكُمْ قَلِيْلاً وَّيُقَلِّلُكُمْ فِىْ اَعْيُنِهِمْ لِيَقْضِىَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلاً ط وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ (٤٤) (انفال ٤٣-٤٤)

তরজমাঃ (৪৩) আল্লাহ্ যখন তোমাকে স্বপ্নে সেসব কাফেরের পরিমাণ অল্প করে দেখালেন; বেশী করে দেখালে তোমরা কাপুরুষতা অবলম্বন করতে এবং কাজের বেলায় বিপদ সৃষ্টি করতে। কিন্তু আল্লাহ বাঁচিয়ে দিয়েছেন। তিনি অতি উত্তমভাবেই জানেন, যা কিছু অন্তরে রয়েছে। (৪৪) আর যখন তোমাদেরকে দেখালেন সে সৈন্য দল মোকাবেলার সময় তোমাদের চোখে অল্প এবং তোমাদেরকে দেখালেন তাদের চোখে অল্প, যাতে আল্লাহ্ সে কাজ করে নিতে পারেন যা ছিল নির্ধারিত। আর সব কাজই আল্লাহ্র নিকট গিয়ে পৌঁছায়। (আনফাল ৪৩-৪৪)

তাফসীর ঃ উক্ত আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ্ পাকের এক অপূর্ব কুদরত সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে যা বদর যুদ্ধের ময়দানে এই উদ্দেশ্যে কার্যকর করা হয়, যাতে উভয় বাহিনীর কোন একটিও যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে গিয়ে যুদ্ধের অনুষ্ঠানকেই শেষ না করে দেয়। কারণ, এ যুদ্ধের ফলশ্রুতিতে বস্তুগত দিক দিয়েও ইসলামের সত্যতার বিকাশ ঘটানো ছিল নির্ধারিত।

বস্তুতঃ আল্লাহ্ পাকের সে বিস্ময়কর হেকমতটি ছিল এই যে, কাফের বাহিনী যদিও তিন গুণ বেশী ছিল, কিন্তু আল্লাহ তাআলা শুধুমাত্র স্বীয় পরিপূর্ণ ক্ষমতা ও কুদরত বলে তাদের সংখ্যাকে মুসলমানদের চোখে কম করে দেখিয়েছেন যাতে মুসলমানদের মধ্যে কোন দুর্বলতা ও বিরোধ সৃষ্টি হয়ে না যায়। আর এ ঘটনাটি ঘটে দু'বার। একবার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে স্বপ্নযোগে দেখানো হয় এবং তিনি বিষয়টি মুসলমানদের কাছে বলেন। তাতে তাদের মনোবল বেড়ে যায়। আর দ্বিতীয় বার ঠিক যুদ্ধ ক্ষেত্রে যখন উভয় পক্ষ সামনা-সামনি হয়, তখন মুসলমানদেরকে তাদের সংখ্যা কম করে দেখানো হয়। সুতরাং ৪৩ তম আয়াতে স্বপ্নের ঘটনা এবং ৪৪ তম আয়াতে প্রত্যক্ষ জাগ্রত অবস্থার ঘটনা উল্লেখ করা হয়েছে।

হযরত আবদুল্লাহ্ ইবনে মাসউদ রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমাদের দৃষ্টিতে প্রতিপক্ষীয় বাহিনীকে এমন দেখা যাচ্ছিল যে, আমি আমার নিকটবর্তী একজনকে বললাম, এরা গোটা নব্বইয়েক লোক হতে পারে। পাশের লোকটি বলল, না তা নয়- শতেক হতে পারে হয়তো।

শেষ আয়াতে সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলা হয়েছে যে, يُقَلِّلُكُمْ فِىْٓ اَعْيُنِهِمْ অর্থাৎ আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকেও প্রতিপক্ষের দৃষ্টিতে কম করে দেখিয়েছেন। (মাআরেফুল কুরআন ৪/৩০৯)

জ্ঞাতব্য বিষয়ঃ যা হোক আয়াতটির দ্বারা একথাও বুঝা গেল যে, কোন কোন সময় মুজেযা ও অলৌকিকতা স্বরূপ চোখের দেখাও ভুল প্রতিপন্ন হয়ে যেতে পারে। যেমনটি এক্ষেত্রে হয়েছে। সেজন্যই এখানে পূনঃর্বার বলা হয়েছে–

لِيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلاً

অর্থাৎ, এহেন কুদরতী বিস্ময় এবং চোখের দৃষ্টির উপর হস্তক্ষেপ এ কারণে প্রকাশ হয় যাতে সে কাজটি সুসম্পন্ন হয়ে যেতে পারে, যা আল্লাহ করতে চান। অর্থাৎ মুসলমানদেরকে তাদের সংখ্যা স্বল্পতা ও নিঃসম্বলতা সত্ত্বেও বিজয় দান করে ইসলামের সত্যতা এবং তার প্রতি অদৃশ্য সমর্থন প্রকাশ পায়। বস্তুতঃ এ যুদ্ধের যা উদ্দেশ্য ছিল আল্লাহ তাআলা এভাবে পূর্ণ করে দেখিয়ে দেন।

আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে– وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ

অর্থাৎ শেষ পর্যন্ত সব বিষয়ই আল্লাহ্‌র দিকে প্রত্যাবর্তন করে; তিনি যা ইচ্ছা করবেন এবং যেমন ইচ্ছা নির্দেশ দেবেন। তিনি অল্পকে অধিকের উপর এবং দুর্বলকে শক্তিশালীর উপর বিজয় করে দিতে পারেন, অল্পকে অধিক, অধিককে অল্পে পরিণত করতে পারেন। (মাআরেফুল কুরআন ৪/৩১০)

আল্লাহই যথেষ্ট

ইরশাদ হয়েছে–

وَاِنْ يُّرِيْدُوْٓا اَنْ يَّخْدَعُوْكَ فَاِنَّ حَسْبَكَ اللّٰهُ ؕ هُوَ الَّذِيْٓ اَيَّدَكَ بِنَصْرِهٖ وَبِالْمُؤْمِنِيْنَ (انفال ٦٢)

তরজমাঃ পক্ষান্তরে তারা যদি তোমাকে প্রতারণা করতে চায়, তবে তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনিই তোমাকে শক্তি যুগিয়েছেন স্বীয় সাহায্যে ও মুসলমানদের মাধ্যমে। (আনফাল ৬২)

তাফসীর ঃ অর্থাৎ এ সম্ভাবনা যদি বাস্তবায়িত হয়ে যায়, সন্ধি করতে গিয়ে তাদের নিয়ত যদি খারাপ থাকে এবং আপনাকে যদি এভাবে ধোঁকা দিতে চায়, তবুও আপনি কোন পরোয়া করবেন না। আল্লাহ তাআলা আপনার

জন্য যথেষ্ট। পূর্বেও আল্লাহর সাহায্য-সমর্থনেই আপনার কার্যসিদ্ধি হয়েছে। তিনি তাঁর বিশেষ সাহায্যে আপনার সহায়তা করেছেন, যা আপনার বিজয় ও কৃতকার্যতার ভিত্তি ও বাস্তব সত্য। আবার বাহ্যিকভাবে মুসলমানদের জামাআতকে আপনার সাহায্যে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন, যা ছিল বাহ্যিক উপকরণ। সুতরাং যিনি প্রকৃত মালিক ও মহান শক্তিমান, যিনি বিজয় ও কৃতকার্যতার যাবতীয় উপকরণকে বাস্তবতায় রূপায়িত করেছেন। তিনি আজও শত্রুদের ধোঁকা-প্রতারণার ব্যাপরে আপনার সাহায্য করবেন। এ খোদায়ী ওয়াদার প্রেক্ষাপটেই এ আয়াত অবতরণের পর থেকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সমগ্র জীবনে এমন কোন ঘটনার সম্মুখীন হতে হয়নি, যাতে শত্রুদের ধোঁকা-প্রতারণার দরুণ তাঁর কোন রকম কষ্ট ভোগ করতে হয়েছে।

আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন

ইরশাদ হয়েছে–

إِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ج فَأَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلٰى وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ (التوبة: ٤٠)

তরজমাঃ (৪০) যদি তোমরা তাকে (রাসূলকে) সাহায্য না কর, তবে মনে রেখো, আল্লাহ তার সাহায্য করেছিলেন, যখন তাকে কাফেররা বহিষ্কার করেছিল। তিনি ছিলেন দু'জনের একজন, যখন তারা গুহার মধ্যে ছিলেন, তখন তিনি আপন সঙ্গীকে বললেন, বিষন্ন হইওনা আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। অতঃপর আল্লাহ তার প্রতি স্বীয় সান্ত্বনা নাযিল করলেন এবং তাঁর সাহায্যে এমন বাহিনী পাঠালেন, যা তোমরা দেখনি। বস্তুতঃ আল্লাহ কাফেরদের মাথা নীচু করে দিলেন। আর আল্লাহর কথাই সদা সমুন্নত এবং আল্লাহ পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময়। (সূরা তাওবা ঃ ৪০)

তাফসীর ঃ তৃতীয় আয়াতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের ঘটনা উল্লেখ করে দেখিয়ে দেয়া হয় যে, আল্লাহর রাসূল কোন মানুষের সাহায্য-সহযোগিতার মুখাপেক্ষী নন। আল্লাহ প্রত্যক্ষভাবে গায়েব থেকে তাঁর সাহায্য করতে সক্ষম। যেমন, হিজরতের সময় করা হয়, তখন তাঁর আপন গোত্র ও দেশবাসী তাঁকে দেশত্যাগ করতে বাধ্য করে।

আল্লাহ তাঁর রাসূল ও মুমিনদের প্রতি সান্ত্বনা নাযিল করেন

ইরশাদ হয়েছে–

لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ فِىْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا وَّضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ (٢٥) ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَنْزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَذٰلِكَ جَزَآءُ الْكٰفِرِيْنَ (٢٦) (التوبة ٢٥-٢٦)

তরজমা ঃ (২৫) আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন অনেক ক্ষেত্রে এবং হুনাইনের দিনে, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের প্রফুল্ল করেছিল। কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্যে সংকুচিত হয়েছিল। অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে। (২৬) তারপর আল্লাহ নাযিল করেন নিজের পক্ষ থেকে সান্ত্বনা তাঁর রাসূল ও মুমিনদের প্রতি এবং অবতীর্ণ করেন এমন সেনাবাহিনী যাদের তোমরা দেখতে পাওনি। আর শাস্তি প্রদান করেন কাফেরদের এবং এটি হল কাফেরদের কর্মফল। (সূরা তাওবাঃ ২৫–২৬)

তাফসীর ঃ আলোচ্য ২৫ ও ২৬ নং আয়াতে যুদ্ধের এ দিকটি তুলে ধরে বলা হয় যে, তোমরা নিজেদের সংখ্যাধিক্যে বেশ আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলে। কিন্তু সেই সংখ্যাধিক্য তোমাদের কাজে আসল না। প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী তোমাদের জন্যে সংকুচিত হয়ে গেল, তারপর তোমরা পালিয়ে গিয়েছিলে। অতঃপর আল্লাহ সান্ত্বনা নাযিল করলেন আপন রাসূলের

উপর ও মুসলমানদের উপর এবং ফেরেশতাদের এমন সৈন্যদল প্রেরণ করলেন, যাদের তোমরা দেখনি। তারপর তোমাদের হাতে কাফেরদের শাস্তি দিলেন। দ্বিতীয় আয়াতে বলেন- ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ অতঃপর আল্লাহ সান্ত্বনা নাযিল করলেন আপন রাসূলের উপর ও মুসলমানদের উপর, এ বাক্যের অর্থ হল হুনাইন যুদ্ধের প্রথম আক্রমণে যে সকল সাহাবী আপন স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন তাঁরা আল্লাহর সান্ত্বনা লাভের পর স্ব স্ব অবস্থানে ফিরে আসেন আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আপন অবস্থানে সুদৃঢ় হন।

ঈমানদারদের রক্ষা করা আমার দায়িত্ব

ইরশাদ হয়েছে-

ثُمَّ نُنَجِّىْ رُسُلَنَا وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا كَذٰلِكَ ج حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِ الْمُؤْمِنِيْنَ (يونس ١٠٣)

তরজমাঃ অতঃপর আমি বাঁচিয়ে নেই নিজের রাসূলগণকে এবং তাদেরকে যারা ঈমান এনেছে এমনিভাবে ঈমানদারদের বাঁচিয়ে নেয়া আমার দায়িত্বও বটে। (ইউনুস ১০৩)

তাফসীর ঃ কাফেরদের উপর যদি কোন বিপদ নাযিল হয়, মুসলমানগণ তা থেকে হেফাযতে থাকবে, সে বিপদ দুনিয়াতে হোক কিংবা আখেরাতে হোক। (মাআরেফুল কুরআন ৪র্থ খণ্ড, ৭০৭ পৃষ্ঠা)

মুমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব

ইরশাদ হয়েছে-

وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلاً اِلٰى قَوْمِهِمْ فَجَاۤءُوْهُمْ بِالْبَيِّنٰتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا ط وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ-
(روم ٤٧)

তরজমাঃ আপনার পূর্বে আমি রাসূলগণকে তাদের নিজ নিজ সম্প্রদায়ের

কাছে প্রেরণ করেছি। তাঁরা তাদের কাছে সুস্পষ্ট নির্দশনাবলী নিয়ে আগমন করেন। অতঃপর যারা পাপী ছিল, তাদের আমি শাস্তি দিয়েছি। মুমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব। (রূম ৪৭)

তাফসীরঃ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِيْنَ اَجْرَمُوْا ط وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِيْنَ অর্থাৎ আমি অপরাধী কাফেরদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিলাম এবং মুমিনদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব ছিল। এই আয়াত থেকে জানা গেল যে, আল্লাহ তাআলা কৃপাবশতঃ মুমিনের সাহায্য করা নিজ দায়িত্বে গ্রহণ করেছেন। বাহ্যতঃ এর ফলে কাফেরদের মোকাবেলায় মুসলমানদের কোন সময় পরাজিত না হওয়া উচিত ছিল। অথচ অনেক ঘটনা এর বিপরীতও হয়েছে এবং হয়ে থাকে। এর জওয়াব আয়াতের মধ্যেই নিহিত আছে যে, মুমিন বলে কাফেরদের বিরুদ্ধে যারা আল্লাহ তাআলার ওয়াস্তে জিহাদ করে, তাদের বুঝানো হয়েছে। এমন খাঁটি লোকদের প্রতিশোধই আল্লাহ তাআলা কাফেরদের কাছ থেকে গ্রহণ করেন এবং তাদের বিজয়ী করেন। যেখানে এর বিপরীত কোন কিছু ঘটে, সেখানে জিহাদকারীদের পদস্খলন তাদের পরাজয়ের কারণ হয়ে থাকে। যেমন, উহুদ যুদ্ধ সম্পর্কে স্বয়ং কুরআনে আছে–

اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا

অর্থাৎ তাদের কতক ভ্রান্তি কর্মের কারণে শয়তান তাদের পদস্খলন ঘটিয়ে দেয়। এরূপ পরিস্থিতিতেও আল্লাহ তাআলা পরিণামে মুমিনদেরই বিজয় দান করেন। যদি তারা তাদের ভুল বুঝতে পারে। উহুদ যুদ্ধে তাই হয়েছে। পক্ষান্তরে যারা শুধু নামে মুমিন, আল্লাহর বিধানাবলীর অবাধ্য এবং কাফেরদের বিজয়ের সময়ও গোনাহ থেকে তাওবা করে না, তারা এই ওয়াদার অন্তর্ভুক্ত নয়। তারা আল্লাহর সাহায্যের যোগ্য পাত্র নয়। এমনি যোগ্যতা ব্যতিরেকেও আল্লাহ তাআলা দয়া বশতঃ সাহায্য ও বিজয় প্রদান করে থাকেন, অতএব এর আশা করা এবং দু'আ করতে থাকা সর্বাবস্থায় উপকারী। (মাআরেফুল কুরআন ৬/৯৪০-৯৪১)

যুদ্ধক্ষেত্রে আল্লাহ মুমিনদের জন্য যথেষ্ট

ইরশাদ হয়েছে–

وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوْا خَيْرًا وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا (احزاب ٢٥)

তরজমাঃ আল্লাহ কাফেরদেরকে ক্রুদ্ধাবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন। তারা কোন কল্যাণ পায়নি। যুদ্ধ করার ক্ষেত্রে আল্লাহ মুমিনদের জন্য যথেষ্ট হয়ে গেলেন। আল্লাহ্ শক্তিধর পরাক্রমশালী। (আহযাব ২৫)

তাফসীরঃ আল্লাহ পাক কাফের তথা মক্কার মুশরিকদেরকে খন্দক যুদ্ধকালে ক্রোধপূর্ণ অবস্থায় মদীনা থেকে হটিয়ে দিয়েছেন। তাদের কোন উদ্দেশ্যই পূর্ণ হয়নি যুদ্ধ ক্ষেত্রে মুসলমানদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। ফলে কাফেররা মূল যুদ্ধে উপনিত হওয়ার পূর্বেই পালিয়ে যায়।

(মাআরেফুল কুরআন ৭ম খণ্ড ৯৭ পৃঃ)

আসমান ও যমীনের বাহিনীসমূহ আল্লাহরই

ইরশাদ হয়েছে–

هُوَ الَّذِىْ اَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِىْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْا اِيْمَانًا مَّعَ اِيْمَانِهِمْ وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا

(فتح ٤)

তরজমা ঃ তিনি মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করেন, যাতে তাদের ঈমানের সাথে আরও ঈমান বেড়ে যায়। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের বাহিনীসমূহ আল্লাহরই এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। (সূরা ফাতাহ ৪)

তাফসীর ঃ তিনি মুসলমানদের অন্তরে সহনশীলতা সৃষ্টি করেছেন, (যার প্রতিক্রিয়া দু'টি– (এক) জিহাদের বায়আতের সময় এগিয়ে যাওয়া, সংকল্প ও সাহসিকতা; যেমন বায়আতে রিদওয়ানের ঘটনায় পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে এবং (দুই) কাফেরদের অন্যায় হঠকারিতার সময় নিজেদের জোশ ও

ক্রোধকে বশে রাখা। হুদায়বিয়ার ঘটনার দশম অংশে এর বিস্তারিত বিবরণ উল্লেখ করা হবে। পরবর্তী فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ আয়াতেও বর্ণিত হবে।) যাতে তাদের আগেকার ঈমানের সাথে তাদের ঈমান আরও বেড়ে যায়। কেননা আসলে রাসূলের (সাঃ) আনুগত্য ঈমানের নূর বৃদ্ধি পাওয়ার একটি উপায়। এই ঘটনায় সকল দিক দিয়ে রাসূলের (সাঃ) পূর্ণ আনুগত্যের পরীক্ষা হয়েছে। রাসূল (সাঃ) যখন জিহাদের ডাক দিলেন এবং বায়আত নিলেন, তখন সবাই হৃষ্টচিত্তে এগিয়ে এসে বায়আত করল এবং জিহাদের জন্য তৈরী হল। এরপর যখন রহস্য ও উপযোগিতার পরিপ্রেক্ষিতে রাসূল (সাঃ) জিহাদ করতে নিষেধ করলেন, তখন সকল সাহাবী জিহাদের উদ্দীপনায় উদ্দীপ্ত ও অস্থির হওয়া সত্ত্বেও রাসূলের (সাঃ) আনুগত্যে মাথা নত করে দিলেন (এবং জিহাদ থেকে বিরত থাকেন।) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের বাহিনীসমূহ (যেমন ফেরেশতা ও অন্যান্য সৃষ্টজীব) আল্লাহরই। (তাই কাফেরদেরকে পরাজিত করা ও ইসলামকে সমুন্নত করার জন্য তোমাদের জিহাদের প্রতি আল্লাহ তাআলা মুখাপেক্ষী নন। তিনি ইচ্ছা করলে ফেরেশতাদের বাহিনী প্রেরণ করতে পারেন; যেমন বদর, আহযাব ও হুনায়নের যুদ্ধে তা প্রত্যক্ষ করা হয়েছে। এই বাহিনী প্রেরণ করাও মুসলমানদের সাহস বৃদ্ধি করার জন্য; নতুবা একজন ফেরেশতাই সবাইকে খতম করার জন্য যথেষ্ট। অতএব কাফেরদের সংখ্যাধিক্য দেখে জিহাদে যেতে তোমাদের ইতঃস্তত করা উচিত নয় এবং আল্লাহ ও রাসূলের (সাঃ) পক্ষ থেকে জিহাদ বর্জন করার আদেশ হলে তাতেও ইতঃস্তত করা সমীচীন নয়। জিহাদ করণ ও জিহাদ বর্জনের ফলাফল ও পরিণাম আল্লাহ তাআলাই বেশী জানেন। (কেননা) আল্লাহ তাআলা (উপযোগিতা সম্পর্কে) সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়, জিহাদ করণ উপযোগী হলে তার নির্দেশ দেন। তাই উভয় অবস্থায় মুসলমানদের ইচ্ছা অনিচ্ছাকে রাসূলের (সাঃ) আদেশের অনুগত রাখা উচিত। এটা ঈমান বৃদ্ধির কারণ।

অষ্টম অধ্যায়
মালে গণীমত

ইরশাদ হয়েছে–

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْاَنْفَالِ ط قُلِ الْاَنْفَالُ لِلّٰهِ وَالرَّسُولِ ج فَاتَّقُو اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ ص وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (انفال ١)

তরজমাঃ আপনার কাছে জিজ্ঞেস করে, গনীমতের হুকুম। বলে দিন, গনীমতের মাল হল আল্লাহর এবং রাসূলের। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজেদের অবস্থা সংশোধন করে নাও। আর আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের হুকুম মান্য কর– যদি ঈমানদার হয়ে থাক। (আনফাল ১)

তাফসীরঃ এ আয়াতটি বদর যুদ্ধে সংঘটিত একটি ঘটনার সাথে সম্পর্কিত। এ ঘটনার বিস্তারিত বিবরণ বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী হযরত উবাদা রাযিয়াল্লাহু আনহুর রেওয়ায়েত ক্রমে মুসনাদে আহমদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ, মুসতাদরাকে হাকেম প্রভৃতি গ্রন্থে এভাবে উদ্ধৃত রয়েছে যে, হযরত উবাদা ইবনে সামেত রাযিয়াল্লাহু আনহুর নিকট কোন এবং ব্যক্তি আয়াতে উল্লেখিত اَنْفَالٌ (আনফাল) শব্দের মর্ম জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, এ আয়াতটি তো আমাদের অর্থাৎ বদর যুদ্ধে যারা অংশগ্রহণ করেছিলেন তাদের সম্পর্কেই নাযিল হয়েছে। সে ঘটনাটি ছিল এই যে, গনীমতের মালামাল বিলি-বন্টনের ব্যাপারে আমাদের মাঝে সামান্য মতবিরোধ হয়ে গিয়েছিল যাতে আমাদের পবিত্র চরিত্রে একটা অশুভ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। আল্লাহ তাআলা এ আয়াতের মাধ্যমে গনীমতের সমস্ত মালামাল আমাদের হাত থেকে নিয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দায়িত্বে অর্পণ করেন। আর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বদরে অংশগ্রহণকারী সবার মধ্যে সমানভাবে সেগুলো বন্টন করে দেন। ব্যাপার ঘটেছিল এই যে, বদরের যুদ্ধে আমরা সবাই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বেরিয়ে যাই এবং উভয় দলের মধ্যে

তুমুল যুদ্ধের পর আল্লাহ্ তাআলা যখন শত্রুদের পরাজিত করে দেন, তখন আমাদের সেনাবাহিনী তিনটি ভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। কিছু লোক শত্রুদের পশ্চাদ্ধাবন করেন। যাতে তারা পুণরায় ফিরে আসতে না পারে। কিছু লোক কাফেরদের পরিত্যক্ত গনীমতের মালামাল সংগ্রহে মনোনিবেশ করেন। আর কিছু লোক রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে এসে সমবেত হন। যাতে গোপনে লুকিয়ে থাকা কোন শত্রু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর আক্রমণ করতে না পারে। যুদ্ধ শেষে সবাই যখন নিজেদের অবস্থানে এসে উপস্থিত হন, তখন যাঁরা গনীমতের মালামাল সংগ্রহ করেছিলেন তারা বলতে লাগলেন, এ সমস্ত মালামাল যেহেতু আমরা সংগ্রহ করেছি। কাজেই এতে আমাদের ছাড়া অপর কারও ভাগ নেই। আর যারা শত্রুর পশ্চাদ্ধাবন করতে গিয়েছিলেন তাঁরা বললেন, এতে তোমরা আমাদের চেয়ে বেশী অধিকারী নও। কারণ আমরাই তো শত্রুকে হটিয়ে দিয়ে তোমাদের জন্য সুযোগ করে দিয়েছি, যাতে তোমরা নিশ্চিন্তে গনীমতের মালামালগুলো সংগ্রহ করে আনতে পার। পক্ষান্তরে যারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হেফাযতকল্পে তাঁর পাশে সমবেত ছিলেন, তাঁরা বললেন, আমরাও ইচ্ছা করলে গনীমতের এই মাল সংগ্রহে তোমাদের সাথে অংশগ্রহণ করতে পারতাম। কিন্তু আমরা জিহাদের সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ কাজ হুযূরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হেফাযতের কাজে নিয়োজিত ছিলাম। অতএব আমরাও এর অধিকারী। সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহু-এর এসব কথাবার্তা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছলে পর এ আয়াতটি অবতীর্ণ হয়। এতে পরিষ্কার হয়ে যায় যে, এসব মালামাল আল্লাহ তাআলার। একমাত্র আল্লাহ ব্যতীত এর অন্য কোন মালিক বা অধিকারী নেই, শুধু তাঁকে ছাড়া যাঁকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দান করেন। সুতরাং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের নির্দেশ অনুযায়ী এসব মালামাল জিহাদে অংশগ্রহণকারীদের মাঝে সমানভাবে বন্টন করে দেন।

(ইবনে কাসীর)

অতঃপর সবাই আল্লাহ ও রাসূলের এই সিদ্ধান্তের উপর রাজী হয়ে যান

এবং তাঁদের মহান মর্যাদার পরিপন্থী পারস্পরিক প্রতিদ্বন্দ্বিতার যে পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল সেজন্য সবাই লাঞ্ছিত হন। (মাআরেফুল কুরআন ৪/২০৬-২০৮)

"اَنْفَالٌ" শব্দটি "نَفْلٌ" এর বহুবচন। এর অর্থ অনুগ্রহ, দান ও উপঢৌকন। নফল নামায, রোযা, সদকা প্রভৃতিকে এ কারণেই 'নফল' বলা হয় যে, এগুলো কারো উপর অপরিহার্য কর্তব্য ওয়াজিব নয়। যারা তা করে, নিজের খুশীতেই করে থাকে। কুরআন ও সুন্নাহর পরিভাষায় نَفْلٌ ও اَنْفَالٌ (নফল ও আনফাল) গনীমত বা যুদ্ধলব্ধ মালামালকে বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। যা যুদ্ধকালে কাফেরদের থেকে লাভ করা হয়। তবে কুরআন মাজীদে এতদার্থে তিনটি শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে- (১) আনফাল, (২) গনীমত এবং (৩) ফায়। اَنْفَالٌ শব্দটি তো এ আয়াতেই রয়েছে। আর غَنِيْمَةٌ (গনীমত) শব্দ এবং তার বিশ্লেষণ এ সূরার একচল্লিশতম আয়াতে আসবে। আর فىء এবং তার ব্যাখ্যা সুরা হাশরের আয়াত وَمَا اَفَاءَ اللّٰهُ প্রসঙ্গে বর্ণিত হবে। এ তিনটি শব্দের অর্থ যৎসামান্য পার্থক্যসহ বিভিন্ন রকম। সামান্য ও সাধারণ পার্থক্যের কারণে অনেক সময় একটি শব্দকে অন্যটির জায়গায় শুধু 'গনীমতের মাল' অর্থেও ব্যবহার করা হয়। اَنْفَالٌ (গনীমত) সাধারণতঃ সে মালকে বলা হয়। যা যুদ্ধ-জিহাদের মাধ্যমে বিরোধী দলের কাছ থেকে হাসিল করা হয়। আর فَىْءٌ (ফায়) বলা হয় সে মালকে যা কোন রকম যুদ্ধ-বিগ্রহ ছাড়াই কাফেরদের কাছ থেকে পাওয়া যায়। তা সেগুলো ফেলে কাফেররা পালিয়েই যাক অথবা স্বেচ্ছায় দিয়ে দিতে রাজী হোক। আর نَفْلٌ ও اَنْفَالٌ (নফল ও আনফাল) শব্দটি অধিকাংশ সময় আনআম বা পুরস্কার অর্থেও ব্যবহার হয়। যা জিহাদের আমীর কোন বিশেষ মুজাহিদকে তার কৃতিত্বের বিনিময় হিসেবে গনীমতের প্রাপ্য অংশের অতিরিক্ত পুরস্কার দিয়ে থাকেন। তাফসীরে ইবনে জারীর গ্রন্থে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে এ অর্থই উদ্ধৃত করা হয়েছে। (ইবনে কাসীর)

আবার কখনও 'নফল ও আনফাল' শব্দ দ্বারা সাধারণ গনীমতের মালকেও বুঝানো হয়। এ আয়াতের ক্ষেত্রে অধিকাংশ তাফসীরকার এই

সাধারণ অর্থই গ্রহণ করেছেন। সহীহ্ বুখারী শরীফে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে এ অর্থই উদ্ধৃত করা হয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এ (اَنْفَالْ) শব্দটি সাধারণ-অসাধারণ উভয় অর্থেই ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এতে কোন মতবিরোধ নেই। বস্তুতঃ এর সর্বোত্তম ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনা হল সেটাই; যা ইমাম আবু উবাইদ (রহঃ) করেছেন। তিনি স্বীয় গ্রন্থ 'কিতাবুল আমওয়াল' এ উল্লেখ করেছেন যে, মূল অভিধান অনুযায়ী 'নফল' বলা হয় দান ও পুরস্কারকে। আর এই উম্মতের প্রতি এটা এক বিশেষ দান যে, জিহাদ ও লড়াইয়ের মাধ্যমে যেসব মাল-সামান কাফেরদের কাছ থেকে লাভ করা হয়। সেগুলো মুসলমানদের জন্য হালাল করে দেয়া হয়েছে। বিগত উম্মতের মধ্যে এই প্রচলন ছিল না। বরং গনীমতের মালের ক্ষেত্রে আইন ছিল এই যে, তা কারো জন্য হালাল ছিল না; সমস্ত গনীমতের মালামাল কোন এক জায়গায় জমা করা হত। অতঃপর আসমান থেকে এক অনল বিদ্যুৎ এসে সেগুলোকে জ্বালিয়ে ছারখার করে দিত। আর এটাই ছিল আল্লাহ তাআলার নিকট জিহাদ কবুল হওয়ার নির্দশন। পক্ষান্তরে গনীমতের মাল-সামান একত্রিত করে রাখার পর যদি আকাশ থেকে বিদ্যুৎ এসে সেগুলোকে না জ্বালাত, তবে তাই ছিল জিহাদ কবুল না হওয়ার লক্ষণ। এতে বুঝা যেত, এ জেহাদ আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। ফলে গনীমতের সে মাল-সামানকেও প্রত্যাখ্যাত ও অলক্ষুণে মনে করা হত এবং সেগুলো কোন প্রকার ব্যবহারে আনা হতো না। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে হযরত জাবের রাযিয়াল্লাহু আনহুর রেওয়ায়েতক্রমে বুখারী ও মুসলিম শরীফে উদ্ধৃত হয়েছে যে, হুযূরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, আমাকে পাঁচটি বিষয় দান করা হয়েছে যা পূর্ববর্তী উম্মতকে দেয়া হয়নি। সে পাঁচটির একটি হল– اُحِلَّتْ لِىَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تحلّ لِاَحَدٍ قَبْلِىْ অর্থাৎ আমার জন্য গনীমতের মালকে হালাল করা হয়েছে। অথচ আমার পূর্ববর্তী কারও জন্য তা হালাল ছিল না। উল্লেখিত আয়াতে আনফাল-এর বিধান বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, এগুলো আল্লাহর এবং রাসূলের। তার অর্থ এই যে, এগুলো প্রকৃত মালিকানা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের এবং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হচ্ছেন সেগুলোর ব্যবস্থাপক।

তিনি আল্লাহ তাআলার নির্দেশ মোতাবেক স্বীয় কল্যাণ বিবেচনায় সেগুলো বিলি-বন্টন করবেন। (মাআরেফুল কুরআন ৪/২০৮-২১০)

ইরশাদ হয়েছে-

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ۙ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ - (انفال ٤١)

তরজমাঃ আর একথা জেনে রাখ যে, কোন বস্তু-সামগ্রীর মধ্য থেকে যা কিছু তোমরা গনীমত হিসেবে পাও তার এক পঞ্চমাংশ হল আল্লাহর জন্য, রাসূলের জন্য, তাঁর নিকটাত্মীয়-স্বজনের জন্য এবং ইয়াতীম-অসহায় ও মুসাফিরদের জন্য; যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে আল্লাহর উপর এবং সে বিষয়ের উপর যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি ফায়সালার দিনে, যেদিন সম্মুখীন হয়ে যায় উভয় সেনাদল। আর আল্লাহ সবকিছুর উপর ক্ষমতাশীল। (আনফাল ৪১)

তাফসীরঃ উল্লেখিত আয়াতে গনীমতের মালের বন্টন-বিধি বর্ণনা করা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে-

فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ

অর্থাৎ গনীমতের মালের এক পঞ্চমাংশ হচ্ছে আল্লাহর, তাঁর রাসূলের, তাঁর নিকটাত্মীয়-স্বজনের, ইয়াতীম-মিসকীনদের এবং মুসাফিরদের জন্য। এখানে প্রথমতঃ লক্ষ্যণীয় যে, গোটা গণীমতের মালামালের বন্টনবিধিই বর্ণিত হচ্ছে। অথচ কুরআন এখানে শুধুমাত্র তার এক পঞ্চমাংশের বন্টনবিধি বর্ণনা করেছে। অবশিষ্ট চার ভাগের কোন উল্লেখ করেনি। এতে কি রহস্য থাকতে পারে এবং বাকী চার ভাগের বন্টনবিধিই বা কি? কিন্তু কুরআনের উপর চিন্তা-গবেষণা করলে এতদুভয় প্রশ্নের উত্তর ও এসব বাক্য থেকেই

বেরিয়ে আসে। কারণ, কুরআনে কারীম জিহাদে নিয়োজিত মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে বলেছে– مَا غَنِمْتُمْ অর্থাৎ তোমরা যা কিছু গনীমত হিসেবে অর্জন করেছ। এতে এই ইঙ্গিত পাওয়া যায় যে, এসব মালামাল অর্জনকারীদেরই প্রাপ্য। তার পর যখন বলা হল যে, এসবের মধ্য থেকে এক পঞ্চমাংশ হল আল্লাহ ও রাসূল প্রমুখের প্রাপ্য, তখন এর সুস্পষ্ট ফল দাঁড়াল এই যে, অবশিষ্ট চার ভাগই গনীমত অর্জনকারী ও মুজাহিদীনের প্রাপ্য। যেমন কুরআনে কারীমের উত্তরাধিকার আইনের এক জায়গায় বলা হয়েছে– وَوَرِثَهُ اَبَوَاهُ فَلِاُمِّهِ السُّدُسُ অর্থাৎ কোন মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারী যখন তার পিতা-মাতা হয়, তখন মাতা পায় এক ষষ্ঠমাংশ।' এখানেও মায়ের অংশ বলেই শেষ করা হয়েছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, অবশিষ্ট পাঁচ ভাগ হল পিতার অধিকার। তেমনিভাবে مَاغَنِمْتُمْ বলার পর যখন শুধু পঞ্চমাংশ আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট করা হলো তাতেই প্রমাণিত হল যে, অপরাপর চারটি অংশই মুজাহিদীনের হক। অতঃপর রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বর্ণনা এবং কার্যধারাও বিষয়টিকে পরিপূর্ণভাবে পরিষ্কার করে দিয়েছে। তিনি অবশিষ্ট চার ভাগই এক বিশেষ বিধি অনুযায়ী মুজাহিদীনের মাঝে বন্টন করে দেন। এবার সে পঞ্চমাংশের বিস্তারিত বিশ্লেষণ লক্ষ্য করা যাক যা কুরআনে কারীম এ আয়াতে নির্দিষ্ট করে দিয়েছে। কুরআনের ভাষায় এখানে ছয়টি শব্দ উল্লেখ করা হয়েছে।

لِلّٰهِ - لِلرَّسُوْلِ - لِذِى الْقُرْبٰى - اَلْيَتٰمٰى - اَلْمَسَاكِيْنُ - اِبْنُ السَّبِيْلِ

لِلّٰهِ (আল্লাহর জন্য) শব্দটি সে সমস্ত বন্টন ক্ষেত্রের মধ্যে একটি অতি উজ্জ্বল শিরোণাম, যাতে আলোচ্য এক পঞ্চমাংশ গনীমতের মাল বন্টিত হবে। অর্থাৎ এ সমুদয় ক্ষেত্রই একনিষ্ঠভাবে আল্লাহর জন্য। তাছাড়া এখানে বিশেষভাবে এ শব্দটি ব্যবহার করার মাঝেও একটি বিশেষ তাৎপর্য রয়েছে। যেদিকে তাফসীরে মাজহারীতে ইঙ্গিত করা হয়েছে। তা এই যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তার খান্দান তথা পরিবার-পরিজনদের জন্য সদকার মালামাল গ্রহণ করাকে হারাম সাব্যস্ত করে দেয়া হয়েছে। কেননা, তা তাঁর সম্মান ও মর্যাদার পক্ষে শোভন নয়। তার কারণ, এসব মালামাল সাধারণ মানুষের ধন-সম্পদ পবিত্র-পরিচ্ছন্ন তথা পঙ্কিলতামুক্ত

করার জন্য মূল সম্পদের মধ্য থেকে পৃথক করে নেয়া হয়। এ মালকে হাদীসে বলা হয়েছে أَوْسَاخُ النَّاسِ অর্থাৎ মানুষের গাদ-কাচড়া। এহেন বস্তু নবী পরিবারের যোগ্য নয়। গনীমতের মালামালের পঞ্চমাংশ থেকে যেহেতু কুরআন রাসূলে কারীম ও তাঁর খান্দানকেও অংশ সাব্যস্ত করেছে। কাজেই এ ব্যাপারে সতর্ক করে দেয়া হয়েছে যে, অংশটি লোকদের মালিকানা থেকে পরিবর্তিত হয়ে আসেনি বরং সরাসরি আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে এসেছে। যেমন, এইমাত্র উল্লেখ করা হয়েছে যে, গনীমতের মাল কাফেরদের অধিকার বা মালিকানা থেকে বেরিয়ে সরাসরিভাবে আল্লাহর নির্ভেজাল মালিকানায় পরিণত হয়ে যায়। তারপর আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তা উপহার হিসেবে বিতরণ করা হয়। সে কারণেই এ বিষয়টির প্রতি ইঙ্গিত করার উদ্দেশ্যে যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তার নিকটাত্মীয়-স্বজনকে অর্থাৎ ذِى الْقُرْبٰى কে গনীমতের মাল থেকে যে পঞ্চমাংশ দেয়া হয়েছে তা মানুষের সদকা নয়। বরং সরাসরি আল্লাহ তাআলার অনুগ্রহ ও দান। আয়াতের প্রারম্ভে বলা হয়েছে যে, এ সমস্ত মালামাল প্রকৃতপক্ষে নির্ভেজালভাবে আল্লাহ তাআলার মালিকানাভুক্ত। তাঁরই নির্দেশ মোতাবেক উল্লেখিত ক্ষেত্রগুলোতে ব্যয় করা হবে। সে জন্যই এক পঞ্চমাংশের প্রকৃত প্রাপক রয়েছে পাঁচটি। ১. রাসূল, ২. যাবিল কুরবা (নিকটাত্মীয়-স্বজন), ৩. ইয়াতীম, ৪. মিসকীন এবং ৫. মুসাফির।

তারপরও তাদের প্রাপ্যতার স্তরভেদ রয়েছে। কুরআনে কারীমের বর্ণনা কৌশল লক্ষ্য করার মত যে, প্রাপ্যতার এ সমস্ত পার্থক্যকে কেমন সূক্ষ্ম ও নাজুক ভঙ্গিতে প্রকাশ করেছে। এই পাঁচটি প্রাপকের বর্ণনা দিতে গিয়ে প্রথম দুটিতে لَامْ লাম বর্ণ ব্যবহার করেছে। বলা হয়েছে- لِلرَّسُوْلِ وَلِذِى الْقُرْبٰى অথচ অপর তিনটিতে 'লাম' ব্যবহারের পরিবর্তে সবগুলোকে একটিকে অন্যটির সাথে জুড়ে দিয়ে উল্লেখ করা হয়েছে। আরবী ভাষায় لَامْ বর্ণটি কোন বৈশিষ্ট্য প্রকাশ করার লক্ষ্যে ব্যবহৃত হয়ে থাকে لِلّٰهِ শব্দে 'লাম' বর্ণটি মালিকানার এ বৈশিষ্ট্য বা নির্দিষ্টতা প্রকাশ করার জন্য ব্যবহৃত হয়েছে যে, যাবতীয় সম্পদরাজির মালিক হচ্ছেন আল্লাহ তাআলা। আর لِلرَّسُوْلِ শব্দে

এর ব্যবহারের উদ্দেশ্য হল প্রাপ্যতার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা যে, আল্লাহ্ রাব্বুল আলামীন এই এক পঞ্চমাংশ গনীমতের মালামাল ব্যয়-বন্টন করার অধিকার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করেছেন। ইমাম তাহাবীর গবেষণা এবং তাফসীরে মাযহারীর বর্ণনা অনুযায়ী এর সারমর্ম এই যে, এখানে যদিও এক পঞ্চমাংশের ব্যয় ক্ষেত্র বা প্রাপক হিসেবে পাঁচটি খাতের উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিপূর্ণ এখতিয়ার রয়েছে যে, তিনি নিজের কল্যাণ বিবেচনা অনুসারে এই পাঁচটি ক্ষেত্রেই গনীমতের এক পঞ্চমাংশ ব্যয় করতে পারেন। যেমন, সূরা আনফালের প্রথম আয়াতে সমুদয় গনীমতের মালামাল বন্টনের ব্যাপারে এ নির্দেশই ছিল যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় কল্যাণ বিবেচনায় তা যে কোন স্থানে ব্যবহার করতে পারেন। যাকে খুশী দিতে পারেন। অতঃপর وَاعْلَمُوٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ আয়াত গনীমতের মালামালকে পাঁচ ভাগে বিভক্ত করে তার চার ভাগকে মুজাহিদীনের অধিকার বলে সাব্যস্ত করে দিয়েছে। কিন্তু এর পঞ্চমাংশটি পূর্ববর্তী নির্দেশেরই আওতাভুক্ত রয়ে গেছে। এর ব্যয় করার বিষয়টি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিবেচনার উপরই ছেড়ে দেয়া হয়েছে। তবে এতটুকু বাড়িয়ে বলা হয়েছে যে, এখানে এই পঞ্চমাংশের জন্য পাঁচটি খাত নির্ধারিত করে বলে দেয়া হয়েছে যে, এ অংশটি এই পাঁচটি খাতেই আবর্তিত হতে থাকবে। অবশ্য অধিকাংশ বিজ্ঞ গবেষক ইমামগণের মতে এই এক পঞ্চমাংশকে সমানভাবে পাঁচ ভাগ করে আয়াতে বর্ণিত পাঁচটি খাতে সমানভাবে বন্টন করে দেয়া মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য অপরিহার্য ছিল না। বরং এটুকু অপরিহার্য ছিল যে, গনীমতের এই এক পঞ্চমাংশকে এই পাঁচ প্রকারের সবাইকে অথবা কাউকে কাউকে স্বীয় বিবেচনা অনুযায়ী দান করবেন। এর সবচেয়ে বড় ও প্রকৃষ্ট প্রমাণ হল এ আয়াতের শব্দাবলী এবং তাতে বর্ণিত মাসরাফ ও ব্যয় খাতসমূহের প্রকারগুলো। কারণ, এসব প্রকার কার্যতঃ পৃথক পৃথক নয়; বরং পারস্পরিক সমন্বিতও হতে পারে। যেমন, যে ব্যক্তি যাবিল-কুরবা বা নিকটাত্মীয়ের

অন্তর্ভুক্ত হবে সে ইয়াতীমও হতে পারে, মিসকীন কিংবা মুসাফিরও হতে পারে। তেমনিভাবে মিসকীন-মুসাফির হলে সাথে সাথে তার ইয়াতীম হওয়াও বিচিত্র নয়। আর সে লোক যাবিল-কুরবাও হতে পারে। তেমনিভাবে যে মিসকীন সে লোক মুসাফিরের তালিকায়ও আসতে পারে। যদি এ সবরকম লোকের মাঝে পৃথকভাবে এবং সবার মাঝে সমান সমান বিতরণ করা উদ্দেশ্য হতো। তবে এক প্রকারের লোক অন্য প্রকারের অন্তর্ভুক্ত না হওয়াটাই হতো বাঞ্ছনীয়। তাহলে দেখা যেত যাবিল-কুরবার যে ব্যক্তি ইয়াতীম এবং মুসাফির ও মিসকীনও হোত, তবে প্রত্যেকে প্রেক্ষিতের বিবেচনায় একেকটি করে মিলে চারটি অংশই তাকে দেয়া কর্তব্য হয়ে পড়ত। যেমন মীরাস বন্টনের ক্ষেত্রে নিয়ম রয়েছে যে, কোন ব্যক্তি যদি মৃত ব্যক্তির সাথে বিভিন্ন রকমের নিকটাত্মীয়তার সম্পর্কযুক্ত হয়। তাহলে প্রত্যেক নৈকট্যের জন্যই সে পৃথক পৃথকভাবে মীরাসের অংশ পেয়ে থাকে। গোটা উম্মতের কেউ এ মতের প্রবক্তা নন যে, গনীমতের বেলায় কোন এক ব্যক্তিকে চার ভাগ দেয়া যেতে পারে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এমন বাধ্যবাধকতা আরোপ করা আয়াতের উদ্দেশ্যই নয় যে, এই পাঁচ প্রকার লোকের সবাইকে অবশ্য অবশ্যই দিতে হবে এবং সমান সমান অংশ দিতে হবে। বরং আয়াতের উদ্দেশ্য হল এই যে, গনীমতের এক পঞ্চমাংশ মাল উল্লেখিত পাঁচ প্রকার লোকের মধ্য থেকে যাকে যে পরিমাণ দিতে চাইবেন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের ইচ্ছামত দিতে পারবেন। (মাযহারী)

সে কারণেই হযরত ফাতেমা যাহরা রাযিয়াল্লাহু আনহা যখন নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই এক পঞ্চমাংশ গনীমতের মধ্য থেকে একটি খাদেমের জন্য আবেদন করলেন এবং সাথে সাথে সংসারের কাজকর্মে নিজের পরিশ্রম, অন্যান্য অসুবিধা এবং নিজের শারীরিক দুর্বলতার কথাও ব্যক্ত করলেন, তখন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই অপারগতার কথা জানিয়ে তাঁকে দান করতে অস্বীকার করলেন যে, আমার সামনে তোমার চেয়ে বেশী অসুবিধায় রয়েছে সুফফাবাসীগণ। তাঁরা সীমাহীন

দারিদ্র-দুর্দশায় নিপতিত। কাজেই তাঁদের বাদ দিয়ে আমি তোমাকে দিতে পারি না। (সহীহ বুখারী ও মুসলিম)

এতে বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, সব রকম লোকের পৃথক পৃথক হক ছিল না। যদি তাই হতো, তবে যাবিল-কুরবার অধিকারে ফাতেমা যাহ্‌রা রাযিয়াল্লাহু আনহার চেয়ে বেশী অগ্রাধিকার আর কার থাকতে পারে? সুতরাং এগুলো ছিল ক্ষেত্রের বিবরণ, প্রাপ্য অধিকারের বিবরণ নয়।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর এক পঞ্চমাংশের বন্টন

অধিকাংশ ইমামগণের মতে গনীমতের এক পঞ্চমাংশের মধ্য থেকে যে অংশ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য রাখা হয়েছিল তা তাঁর নবুওয়ত ও রেসালতের সুউচ্চ মর্যাদার ভিত্তিতে তেমনি ছিল যেমন করে তাঁকে বিশেষভাবে এ অধিকারও দেয়া হয়েছিল যে, তিনি সমগ্র গনীমতের মালামালের মধ্য থেকে নিজের পছন্দ মত যে কোন বস্তু নিতে পারতেন। সে অধিকার বলে কোন কোন গনীমতের মধ্য থেকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন কোন বস্তু নিয়েও ছিলেন। আর গনীমতের পঞ্চমাংশ থেকে তিনি তাঁর পরিবার-পরিজনের জন্য ভাতাও গ্রহণ করতেন। তাঁর ওফাতের পর এই অংশ নিজে থেকেই শেষ হয়ে যায়। কারণ তাঁর পরে আর কোন নবী রাসূল নেই।

যাবিল-কুরবার পঞ্চমাংশ

এতে কারও কোন দ্বিমত নেই যে, গনীমতের এক পঞ্চমাংশে দরিদ্র-নিকটাত্মীয়ের অধিকার বা হক। এর অন্যান্য প্রাপক ইয়াতীম, মিসকীন ও মুসাফিরের অগ্রবর্তী। কারণ নিকটাত্মীয়কে সদকা-যাকাত প্রভৃতি দিয়ে সাহায্য করা যায় না। অথচ অন্যান্যের ক্ষেত্রে যাকাত-ফেতরার দ্বারা সাহায্য করা যায়। অবশ্য ধনী নিকটাত্মীয়কে এর মধ্য থেকে দেয়া যাবে কিনা। এ

প্রশ্নে হযরত ইমাম আযম আবু হানীফা (রহঃ) বলেন, স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে নিকটাত্মীয়দিগকে দান করতেন তার দুটি ভিত্তি ছিল। ১. তাদের দরিদ্র ও অসহায় এবং ২. দ্বীনের প্রতিষ্ঠা ও ইসলামের প্রতিরক্ষার ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহায্য-সহায়তা। দ্বিতীয় ভিত্তিটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের সাথে সাথেই শেষ হয়ে গেছে। অবশিষ্ট থাকতে পারে শুধু দারিদ্র ও অসহায়ত্বের বিষয়টি। আর এই ভিত্তিতে কেয়ামত অবধি প্রত্যেক ইমামই তাঁদেরকে অন্যান্যের তুলনায় অগ্রবর্তী গণ্য করবেন। [হেদায়া, জাসসাস, ইমাম শাফেয়ী (রহঃ) থেকেও এ বক্তব্যই উদ্ধৃত রয়েছে। (কুরতুবী)]

কোন কোন ফেকাহবিদের মতে যাবিল-কুরবার অংশ রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নৈকট্যের ভিত্তিতে চিরকাল বলবৎ থাকবে এবং তাতে ধনী-গরীব সবাই শরীক থাকবে। তবে সমকালীন আমীর (শাসক) নিজ বিবেচনায় তাদেরকে অংশ দেবেন। (মাযহারী)

এ ব্যাপারে আদত বিষয়টি হল খোলাফায়ে রাশেদীনের অনুসৃত রীতি। দেখতে হবে, তাঁরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর কি করেছেন। হেদায়া গ্রন্থকার এ ব্যাপারে লিখেছেনঃ

إِنَّ الْخُلَفَاءَ الْاَرْبَعَةَ الرَّاشِدِيْنَ قَسَّمُوْهُ عَلٰى ثَلٰثَةِ اَسْهُمٍ

অর্থাৎ চারজন খোলাফায়ে রাশেদীন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ওফাতের পর গনীমতের এক পঞ্চমাংশকে মাত্র তিন ভাগে বিভক্ত করে ইয়াতীম, মিসকীন ও ফকীরদের মাঝে বিতরণ করেছেন। অবশ্য ফারূকে আযম হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে প্রমাণিত রয়েছে যে, তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকটাত্মীয়ের মধ্যে যাঁরা গরীব ও অভাবী ছিলেন, তাঁদেরকেও গনীমতের এক পঞ্চমাংশ থেকে দিয়ে থাকতেন। (আবু দাউদ)

বলা বাহুল্য, এটা শুধুমাত্র হযরত ওমর ফারূকেরই রীতি ছিল না, অন্যান্য খলীফাগণও তাই করতেন। আর যেসব রেওয়ায়েতের দ্বারা প্রমাণিত রয়েছে যে, হযরত সিদ্দীকে আকবার রাযিয়াল্লাহু আনহু ও হযরত ফারূকে আযম

রাযিয়াল্লাহু আনহু তাঁদের খেলাফতের শেষকাল পর্যন্তই যাবিল-কুরবার হক সে মাল থেকে পৃথক করে নিতেন এবং হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে তার মুতাওয়াল্লী বানিয়ে যাবিল-কুরবার মধ্যে বিতরণ করাতেন। (যেমনটি বর্ণিত রয়েছে ইমাম আবু ইউসুফ রচিত কিতাবুল খারাজ গ্রন্থে।) তবে এটা তার পরিপন্থী নয় যে, তা দারিদ্র যাবিল-কুরবার মাঝে বন্টন করার জন্যই নির্ধারিত ছিল।

ফায়েদাঃ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় কার্যের মাধ্যমে যাবিল-কুরবা তথা নিকটাত্মীয়ের নির্ধারণ এভাবে করেছেন যে, বনূ-হাশেম তো তাঁর নিজের গোত্র ছিলই তার সাথে বনূ-মুত্তালিবকেও এজন্য সংযুক্ত করে দিয়েছিলেন যে, এরা ইসলাম কিংবা জাহেলিয়াত কোন কালেই বনূ-হাশেম থেকে আলাদা হয়নি। এমনকি মক্কার কুরাইশরা যখন বনূ-হাশেমের প্রতি খাদ্য অবরোধ করে এবং তাদেরকে শেআবে আবী তালেবের মধ্যে অন্তরীণ করে দেয় তখন যদিও বনূ মুত্তালিবকে তারা এ বয়কটের অন্তর্ভুক্ত করেনি, কিন্তু এরা নিজেরা স্বেচ্ছায়ই এই বয়কটে শরীক হয়ে যায়। (মাযহারী, মাআরেফুল কুরআন ৪/২৯৬–৩০২)

ইরশাদ হয়েছে–

فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلٰلًا طَيِّبًا وَّاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (انفال ٦٩)

তরজমাঃ সুতরাং তোমরা খাও গনীমত হিসেবে তোমরা যে পরিচ্ছন্ন ও হালাল বস্তু অর্জন করেছো তা থেকে। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, মেহেরবান। (সূরা আনফাল ৬৯)

তাফসীর ঃ বলা হয়েছে– فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ অর্থাৎ গনীমতের যে সব মালামাল তোমাদের হস্তগত হবে এখন থেকে সেগুলো তোমরা খেতে পারবে এবং ভবিষ্যতের জন্যও তা হালাল করে দেয়া হল। কিন্তু তার পরেও এতে একটি সন্দেহের অবকাশ থেকে যায় যে, গনীমতের মাল হালাল হওয়ার নির্দেশটি তো এখন হলো কিন্তু ইতিপূর্বে যেসব মালামাল সংগ্রহ করে নেয়া হয়েছিল হয়তো সেগুলোতে কোন রকম করো হাত বা দোষ

থাকতে পারে। সেজন্যই সেগুলোতে حَلٰلًا طَيِّبًا বলে সে সন্দেহের অপনোদন করা হয়েছে যে, এরপর বৈধতার হুকুম নাযিল হওয়ার প্রাক্কালে গনীমতের মাল সংগ্রহের যদিও পদক্ষেপ নেয়া জায়েয ছিল না, কিন্তু এখন যখন গনীমতের মালের বৈধতা সংক্রান্ত হুকুম এসে গেছে, তখন সংগৃহীত মালামালও নির্দোষভাবেই হালাল।

মাসআলাঃ এখানে উসূলে ফিকাহ্র একটি বিষয় লক্ষণীয় ও প্রণিধানযোগ্য। তা হল এই যে, যখন কোন অবৈধ পদক্ষেপের পর স্বতন্ত্র কোন আয়াতের মাধ্যমে সে বিষয়টিকে হালাল করার নির্দেশ অবতীর্ণ হয় তখন তাতে পূর্ববর্তী পদক্ষেপের কোনই প্রভাব থাকে না; সে মালামাল যথার্থভাবেই পবিত্র ও হালাল হয়ে যায়।

নবম অধ্যায়

আল্লাহর রাস্তায় শহীদ হওয়ার ফযীলত

শহীদদেরকে মৃত বলো না

ইরশাদ হয়েছে–

وَلَا تَقُوْلُوْا لِمَنْ يُّقْتَلُ فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ بَلْ اَحْيَاءٌ وَّلٰكِن لَّا تَشْعُرُوْنَ (البقرة ١٥٤)

তরজমাঃ আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়, তাদেরকে মৃত বলো না। বরং তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা তা বুঝ না। (বাকারাহ ১৫৪)

তাফসীরঃ যেসব লোক আল্লাহর রাস্তায় নিহত হন, তাঁদেরকে শহীদ বলা হয়। সাধারণতভাবে অবশ্য তাঁদের মৃত বলাও জায়েয। তবে তাঁদের মৃত্যুকে অন্যান্যদের মৃত্যুর সমপর্যায়ভুক্ত মনে করতে নিষেধ করা হয়েছে। কেননা মৃত্যুর পর প্রত্যেকেই বরযখের জীবন লাভ করে থাকে এবং সে জীবনের পুরস্কার অথবা শাস্তি ভোগ করতে থাকে। কিন্তু শহীদগণকে সে জীবনে অন্যান্য মৃতের তুলনায় একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ মর্যাদা দান করা হয়। তা হল অনুভূতির বৈশিষ্ট্য, অন্যান্য মৃতের তুলনায় তাঁদের বেশী অনুভূতি দেয়া হয়। যেমন মানুষের পায়ের গোড়ালী ও হাতের আঙ্গুলের অগ্রভাগে উভয় স্থানেই অনুভূতি থাকে, কিন্তু গোড়ালীর তুলনায় আঙ্গুলের অনুভূতি অনেক বেশী তীব্র। তেমনি, সাধারণ মৃতের তুলনায় শহীদগণ বরযখের জীবনে বহুগুণ বেশী অনুভূতি প্রাপ্ত হয়ে থাকেন। এমনকি শহীদের এ জীবনুভূতি অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের জড়দেহেও এসে পৌঁছে থাকে। অনেক সময় তাঁদের হাড়-মাংসের দেহ পর্যন্ত মাটিতে বিনষ্ট হয় না, জীবিত মানুষের দেহের মতই অবিকৃত থাকতে দেখা যায়। হাদীসের বর্ণনা এবং বহু প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় এর যথার্থতা প্রমাণিত হয়েছে। এ কারণেই শহীদগণকে জীবিত

বলা হয়েছে এবং সাধারণ মৃতদের মত বলতে নিষেধ করা হয়েছে। তবে সাধারণ নিয়মে তাঁদেরকেও মৃতই ধরা হয় এবং তাদের পরিত্যক্ত সম্পদ ওয়ারিশগণের মধ্যে বন্টিত হয় এবং তাঁদের বিধবাগণ অন্যের সাথে পুনঃবিবাহ করতে পারে। (মাআরেফুল কুরআন ১/৪৬২)

তারা জীবিত ও জীবিকা প্রাপ্ত

ইরশাদ হয়েছে–

وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ؕ بَلْ اَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ (١٦٩) فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (١٧) يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ وَّاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ (١٧١) (ال عمران ١٦٩-١٧١)

তরজমাঃ আর যারা আল্লাহর রাহে নিহত হয় তাদেরকে তুমি কখনো মৃত মনে করো না। বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকা প্রাপ্ত। আল্লাহ নিজের অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তার প্রেক্ষিতে তারা আনন্দ উদযাপন করছে। আর যারা এখনও তাদের কাছে এসে পৌঁছেনি তাদের পেছনে তাদের জন্যে আনন্দ প্রকাশ করে। কারণ তাদের কোন ভয়-ভীতিও নেই এবং কোন চিন্তা-ভাবনাও নেই। আল্লাহর নেয়ামত ও অনুগ্রহের জন্যে তারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং তা এভাবে যে, আল্লাহ ঈমানদারদের শ্রমফল বিনষ্ট করেন না। (ইমরান ১৬৯–১৭১)

আল্লাহর রাহে শাহাদত বরণকারীদের বিশেষ মর্যাদা

তাফসীর ঃ وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِى سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا এ আয়াতে শহীদানের বিশেষ মর্যাদার বিবরণ বিবৃত হয়েছে। এছাড়া বিশুদ্ধ

হাদীসেও এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা এসেছে। ইমাম কুরতুবী (রহঃ) বলেছেন, শহীদদের অবস্থা ও মর্যাদার মধ্যেও পার্থক্য রয়েছে। কাজেই হাদীসের রেওয়ায়েতে যেসব দিক বর্ণিত হয়েছে, তাও বিভিন্ন অবস্থারই প্রেক্ষিতে বলা হয়েছে।

এখানে শহীদানের ফযীলত বর্ণনা প্রসঙ্গে প্রথম ফযীলত স্বরূপ বলা হয়েছে যে, তাঁরা মরেননি, বরং অনন্ত জীবনের অধিকারী হয়ে গেছেন। এক্ষেত্রে লক্ষণীয় বিষয় এই যে, তাদের মৃত্যুবরণ এবং সমাহিত হওয়াটা একান্ত বাস্তব ও প্রত্যক্ষ বিষয়। তবুও কুরআনের বিভিন্ন আয়াতে তাদেরকে মৃত না বলার এবং মনে না করার যে হেদায়েত দেয়া হয়েছে, তার উদ্দেশ্য কি? যদিও বলা হয় যে, 'বরযখ' এর জীবন বুঝানো হয়েছে, তবে এ জীবন তো মুমিন-কাফের নির্বিশেষে সবারই রয়েছে। মৃত্যুর পর তাদের সবার রূহই জীবিত থাকে। আর কবরের সওয়াল-জওয়াবের পর সৎ মুমিনদের জন্য সুখ ও শান্তির ব্যবস্থা এবং বেঈমান কাফেরদের জন্য কবর আযাবের ব্যবস্থার বিষয় তো কুরআন-সুন্নাহর দ্বারাই প্রমাণিত। কাজেই বরযখের জীবন যখন সবার জন্যই ব্যাপক, তখন শহীদানের বৈশিষ্ট্য কি রইল?

উত্তর এই যে, কুরআনে কারীমের এই আয়াতেই বলা হয়েছে আল্লাহর পক্ষ থেকে শহীদগণ রিযিক পেয়ে থাকেন। আর রিযিক তারাই পেয়ে থাকে, যারা জীবিত। এতে বুঝা যায়, এই জড় পৃথিবী থেকে স্থানান্তরিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শহীদের জন্য বেহেশতী রিযিক প্রাপ্তি আরম্ভ হয়ে যায় এবং তখন থেকে তারা এক বিশেষ ধরনের জীবন প্রাপ্ত হন, যা সাধারণ মৃতদের তুলনায় বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে থাকে। (কুরতুবী)

এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে, সে বৈশিষ্ট্যসমূহ কেমন এবং সে জীবনই বা কোন ধরনের? এর তাৎপর্য একমাত্র বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কেউ জানতে পারে না এবং জানার কোন প্রয়োজনও নেই। অবশ্য কোন কোন সময় তাঁদের এই বিশেষ ধরনের জীবনের কিছু লক্ষণ এ পৃথিবীতেই তাদের দেহে প্রকাশ পায়, মাটি তাঁদেরকে খায় না, তাঁদের লাশ বরাবর অবিকৃত থেকে যায়। এ ধরনের বহু ঘটনা প্রত্যক্ষ করা গেছে। (কুরতুবী)

এ আয়াতে শহীদদের প্রথম বৈশিষ্ট্য বলা হয়েছে তাঁদের অনন্ত জীবন লাভকে। অতঃপর দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হল আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাঁদের রিযিক প্রাপ্তি। তৃতীয় বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করা হয়েছে– فَرِحِينَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ আয়াতে যে তারা সদা-সর্বদা আনন্দমুখর থাকবেন। যে সমস্ত নিআমত আল্লাহ তাদেরকে দান করবেন সেগুলোর মধ্যে চতুর্থ হল–

وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ

অর্থাৎ তারা নিজেদের যেসব উত্তরসুরীকে পৃথিবীতে রেখে গিয়েছিলেন, তাঁদের ব্যাপারেও তাদের এ আনন্দ অনুভূত হয় যে, তাঁরাও পৃথিবীতে থেকে সৎকাজ ও জিহাদে নিয়োজিত রয়েছেন। ফলে তাঁরাও এখানে এসে এমনি সব নেআমত এবং উচ্চ মর্যাদা লাভ করবেন।

আর সাদ্দী (রহঃ) বর্ণনা করেছেন যে, শহীদের আত্মীয়-বন্ধুর মৃত্যু সম্পর্কে তাদেরকে পূর্বাহ্নেই জানিয়ে দেয়া হয় যে, অমুক ব্যক্তি এখন তোমার নিকট আসছেন। তখন তিনি তেমনই আনন্দিত হন, যেমন পৃথিবীতে বহু দূরের কোন বন্ধুর সাথে সুদীর্ঘ সময়ের পর সাক্ষাৎ হলে হয়ে থাকে।

এ আয়াতের যে শানে নুযুল হযরত আবু দাউদ (রহঃ) বিশুদ্ধ সনদের মাধ্যমে হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে রেওয়ায়েত করেছেন, তা হল এই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরাম রাযিয়াল্লাহু আনহুমকে বললেন যে, ওহুদের ঘটনায় যখন তোমাদের ভাইয়েরা শহীদ হন, তখন আল্লাহ তাঁদের আত্মাগুলোকে সবুজ পাখীর পালকের ভেতরে স্থাপন করে মুক্ত করে দেন। তাঁরা জান্নাতের ঝর্ণা ও উদ্যানসমূহ থেকে নিজেদের রিযিক আহরণ করেন এবং অতঃপর তারা সেই আলোকধারায় ফিরে আসেন, যা তাঁদের জন্য আল্লাহর আরশের নীচে ঝুলিয়ে দেয়া হয়েছে। যখন তারা নিজেদের জন্য আনন্দ ও শান্তিময় এ জীবন প্রত্যক্ষ করলেন, তখন বললেন, "আমাদের আত্মীয়-আপনজনরা পৃথিবীতে আমাদের মৃত্যুতে শোকার্ত; আমাদের অবস্থা সম্পর্কে কি কেউ তাদের জানিয়ে দিতে পারে; 'যাতে তারা আমাদের জন্য দুঃখ না করে এবং তারাও যাতে জিহাদে (অংশগ্রহণের) চেষ্টা করে"। তখন আল্লাহ বললেন, 'তোমাদের এ সংবাদ

তাদেরকে পৌঁছে দিচ্ছি।" এরই প্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল করা হয়। (কুরতুবী) (মাআরেফুল কুরআন ২/২৫৯-২৬০)

আল্লাহর নিকট রয়েছে উত্তম বিনিময়

ইরশাদ হয়েছে-

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ اَنِّىْ لَاۤ اُضِيْعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنْكُمْ مِّنْ ذَكَرٍ اَوْ اُنْثٰى ج بَعْضُكُمْ مِّنْۢ بَعْضٍ ج فَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا وَاُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاُوْذُوْا فِىْ سَبِيْلِىْ وَقٰتَلُوْا وَقُتِلُوْا لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ وَلَاُدْخِلَنَّهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ج ثَوَابًا مِّنْ عِنْدِ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الثَّوَابِ - (ال عمران ١٩٥)

তরজমাঃ অতঃপর তাদের পালনকর্তা তাদের দুআ (এই বলে) কবুল করে নিলেন যে, আমি তোমাদের কোন পরিশ্রমকারীর পরিশ্রমই বিনষ্ট করি না, তা সে পুরুষ হোক কিংবা স্ত্রীলোক। তোমরা পরস্পর এক। তারপর সে সমস্ত লোক যারা হিজরত করেছে, তাদেরকে নিজেদের দেশ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের প্রতি উৎপীড়ন করা হয়েছে আমার পথে এবং যারা লড়াই করেছে ও মৃত্যুবরণ করেছে, অবশ্যই আমি তাদের উপর থেকে অকল্যাণ অপসারিত করব এবং তাদেরকে প্রবিষ্ঠ করাব জান্নাতে যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। এই হলো বিনিময় আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর আল্লাহর নিকট রয়েছে উত্তম বিনিময়। (আল-ইমরান ১৯৫)

হিজরত ও শাহাদতের দ্বারা হক্কুল ইবাদ ব্যতীত অন্যান্য সব গোনাহ মাফ হয়ে যায়

তাফসীর ঃ لَاُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ ....الخ আয়াতের আওতায় তাফসীরের সার সংক্ষেপে এই শর্তারোপ করা হয়েছে যে, আল্লাহর হকের বেলায় যে সমস্ত ত্রুটি-গাফলতী ও পাপ-তাপ হয়ে থাকবে তা হিজরত ও শাহাদতের মাধ্যমে মাফ হয়ে যাবে। তার কারণ, স্বয়ং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে ঋন-ধারকে এ থেকে পৃথক করে

দিয়েছেন। বরং তাঁর ক্ষমার নিয়ম হলো স্বয়ং পাওনাদার কিংবা তাঁর ওয়ারিশগণকে প্রাপ্য পরিশোধ করে দেবে অথবা তাদের কাছ থেকে ক্ষমা করিয়ে নেবে। অবশ্য যদি কারো প্রতি আল্লাহ্ তাআলা বিশেষ অনুগ্রহ করে পাওনাদারকে রাজী করিয়ে দেন, তবে তা স্বতন্ত্র কথা। কারো কারো ব্যাপারে এমন হবেও বটে। (মাআরেফুল কুরআন- ২/৩০৩০-৩০৪)

তাদের জিহাদ করাই কর্তব্য

ইরশাদ হয়েছে-

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ
النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ج وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا
(٦٩) ذٰلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللّٰهِ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ عَلِيْمًا (٧) يٰاَيُّهَا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا خُذُوْا حِذْرَكُمْ فَانْفِرُوْا ثُبَاتٍ اَوِ انْفِرُوْا جَمِيْعًا (٧١) وَاِنَّ
مِنْكُمْ لَمَنْ لَّيُبَطِّئَنَّ ج فَاِنْ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَالَ قَدْ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيَّ
اِذْ لَمْ اَكُنْ مَّعَهُمْ شَهِيْدًا (٧٢) وَلَئِنْ اَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللّٰهِ
لَيَقُوْلَنَّ كَاَنْ لَّمْ تَكُنْۢ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهٗ مَوَدَّةٌ يّٰلَيْتَنِيْ كُنْتُ مَعَهُمْ فَاَفُوْزَ
فَوْزًا عَظِيْمًا (٧٣) فَلْيُقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الَّذِيْنَ يَشْرُوْنَ الْحَيٰوةَ
الدُّنْيَا بِالْاٰخِرَةِ ط وَمَنْ يُّقَاتِلْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلْ اَوْ يَغْلِبْ
فَسَوْفَ نُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا (٧٤) (نساء ٦٩ - ٧٤)

তরজমাঃ (৬৯) আর যে কেউ আল্লাহর হুকুম এবং তাঁর রাসূলের হুকুম মান্য করবে, তাহলে যাদের প্রতি আল্লাহ নি'আমত দান করেছেন, সে তাদের সঙ্গী হবে। তাঁরা হলেন নবী, সিদ্দীক, শহীদ ও সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ। আর তাঁদের সান্নিধ্যই হল উত্তম। (৭০) এটা হল আল্লাহ প্রদত্ত মহত্ত্ব। আর আল্লাহ যথেষ্ট পরিজ্ঞাত। (৭১) হে ঈমানদারগণ! নিজেদের অস্ত্র তুলে নাও এবং পৃথক পৃথক সৈন্য দলে কিংবা সমবেতভাবে বেরিয়ে পড়। (৭২) আর তোমাদের মধ্যে এমনও কেউ কেউ রয়েছে, যারা অবশ্য বিলম্ব করবে এবং তোমাদের উপর কোন বিপদ উপস্থিত হলে বলবে, আল্লাহ আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, আমি তাদের সাথে যায়নি। (৭৩) পক্ষান্তরে তোমাদের

প্রতি আল্লাহর পক্ষ থেকে কোন অনুগ্রহ আসলে তারা এমনভাবে বলতে শুরু করবে যেন তোমাদের এবং তাদের মধ্যে কোন মিত্রতাই ছিল না। (বলবে) হায়! আমি যদি তাদের সাথে থাকতাম, তাহলে আমিও যে বিরাট সফলতা লাভ করতাম। (৭৪) কাজেই আল্লাহর কাছে যারা পার্থিব জীবনকে আখেরাতের পরিবর্তে বিক্রি করে দেয় তাদের জিহাদ করাই কর্তব্য। বস্তুতঃ যারা আল্লাহর রাহে লড়াই করে এবং অতঃপর মৃত্যুবরণ করে কিংবা বিজয় অর্জন করে আমি তাদেরকে মহা পূণ্য দান করব। (নিসা ৬৯–৭৪)

তাফসীরঃ আল্লাহ তাআলার আনুগত্যশীল বান্দাগণ সে সকল মহান ব্যক্তিদের সাথে থাকবেন, যাঁরা আল্লাহ তাআলার নিকট সর্বাধিক সম্মানিত ও মকবুল। তাঁরা চার শ্রেণীতে বিভক্ত– (১) আম্বিয়া (আঃ) (২) সিদ্দীকীন, (৩) শুহাদা, (৪) সালেহীন। (মাআরেফুল কুরআন ২/৫৩০–৫৩১)

আল্লাহ শহীদদেরকে পছন্দনীয় জায়গায় পৌছাবেন

ইরশাদ হয়েছে–

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْآ اَوْ مَاتُوْا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا ط وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ (٥٨) لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلاً يَّرْضَوْنَهٗ وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيْمٌ حَلِيْمٌ (٥٩) (الحج: ٥٨-٥٩)

তরজমাঃ (৫৮) যারা আল্লাহর পথে গৃহ ত্যাগ করেছে, এরপর নিহত হয়েছে অথবা মরে গেছে; আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করবেন এবং আল্লাহ সর্বোৎকৃষ্ট রিযিকদাতা। (৫৯) তাদেরকে অবশ্যই এমন এক স্থানে পৌছাবেন যাকে তারা পছন্দ করবে এবং আল্লাহ জ্ঞানময়, সহনশীল। (সূরা হজ্জ ৫৮–৫৯)

তাফসীরঃ অর্থাৎ দ্বীনের হেফাজতের জন্য গৃহ ত্যাগ করেছে, এরপর কাফেরদের মোকাবেলায় নিহত হয়েছে অথবা স্বাভাবিক মৃত্যুবরণ করেছে তারা ব্যর্থ ও বঞ্চিত নয় যদিও তারা পার্থিব উপকারিতা লাভ করতে পারেনি। কিন্তু পরকালে আল্লাহ তাআলা অবশ্যই তাদেরকে জান্নাতের অগণিত নি'আমতরাজি দান করবেন। (মাআরেফুল কুরআন ৬/৩৩৮)

আল্লাহ শহীদদের কর্ম বিনষ্ট করবেন না

ইরশাদ হয়েছে–

فَاِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فَضَرْبَ الرِّقَابِ ط حَتّٰى اِذَا اَثْخَنْتُمُوْهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ فَاِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَاِمَّا فِدَاءً حَتّٰى تَضَعَ الْحَرْبُ اَوْزَارَهَا ط ذٰلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللّٰهُ لَانْتَصَرَ مِنْهُمْ وَلٰكِنْ لِّيَبْلُوَا بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ ط وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَلَنْ يُّضِلَّ اَعْمَالَهُمْ - سَيَهْدِيْهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ - وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ (محمد ٤-٦)

তরজমাঃ অতঃপর যখন তোমরা কাফেরদের সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হও, তখন তাদের গর্দান মার, অবশেষে যখন তাদেরকে পূর্ণরূপে পরাভূত কর তখন তাদেরকে শক্ত করে বেঁধে ফেল। অতঃপর হয় তাদের প্রতি অনুগ্রহ কর, না হয় তাদের নিকট থেকে মুক্তিপণ নাও। তোমরা যুদ্ধ চালিয়ে যাবে যে পর্যন্ত না শত্রুপক্ষ অস্ত্র সমর্পণ করবে। এটাই বিধান। এটা এজন্য যে, আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন। কিন্তু তিনি তোমাদের কতককে কতকের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান। যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয় আল্লাহ কখনই তাদের কর্ম বিনষ্ট করবেন না। তিনি তাদের পথ প্রদর্শন করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করবেন। অতঃপর তিনি তাদেরকে জান্নাতে দাখিল করাবেন, যা তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন।

(সূরা মুহাম্মদ ৪–৬)

তাফসীরঃ وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ الخ আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে যে, যারা আল্লাহর পথে শহীদ হয় তাদের কর্ম বিনষ্ট হয় না; অর্থাৎ তারা কিছু গোনাহ করলেও সেই গোনাহর কারণে তাদের সৎকর্ম হ্রাস পায় না। বরং অনেক সময় তাদের সৎকর্ম তাদের গোনাহর কাফফারা হয়ে যায়।

سَيَهْدِيْهِمْ وَيُصْلِحُ بَالَهُمْ

এতে শহীদের জন্য দুটি নি'আমতের কথা বর্ণিত হয়েছে। (১) আল্লাহ তাকে হেদায়েত করবেন, (২) তার সমস্ত অবস্থা ভাল করে দেবেন। অবস্থা বলে দুনিয়া ও আখেরাত উভয় জাহানের অবস্থা বুঝানো হয়েছে। দুনিয়াতে

এই যে, যে ব্যক্তি জিহাদে যোগদান করে, সে শহীদ না হলেও শহীদের সওয়াবের অধিকারী হবে। আখেরাতে এই যে, সে কবরের আযাব থেকে এবং হাশরের পেরেশানী থেকে মুক্তি পাবে। কিছু লোকের হক তার যিম্মায় থেকে গেলে আল্লাহ তাআলা হকদারদেরকে তার প্রতি রাজী করিয়ে তাকে মুক্ত করে দেবেন। (মাযহারী)

শহীদ হওয়ার পর হেদায়েত করার অর্থ এই যে, তাদেরকে মনযিলে মাকসূদ অর্থাৎ জান্নাতে পৌছে দেবেন; যেমন কুরআনে জান্নাতীদের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা জান্নাতে পৌছে একথা বলবে–

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَانَا لِهٰذَا

অর্থাৎ আল্লাহর তাআলারই সমস্ত প্রশংসা, যিনি আমাদিগকে এ পর্যন্ত পৌছিয়েছেন।

وَيُدْخِلُهُمُ الْجَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ

এ হচ্ছে তৃতীয় একটি নি'আমত। অর্থাৎ তাদেরকে কেবল জান্নাতেই পৌঁছানো হবে না; বরং তাদের অন্তরে আপনা-আপনি জান্নাতে নিজ নিজ স্থান ও জান্নাতের নেয়ামত তথা হুর ও গেলমানের এমন পরিচয় সৃষ্টি হয়ে যাবে, যেমন তারা চিরকাল তাদের মধ্যেই বসবাস করত এবং তাদের সাথে পরিচিত ছিল। এরূপ না হলে অসুবিধা ছিল। কারণ জান্নাত ছিল একটি নতুন জগত। সেখানে নিজ নিজ স্থান খুঁজে নেয়ার মধ্যে ও সেখানকার বস্তুসমূহের সাথে সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার মধ্যে সময় লাগত এবং বেশ কিছু কাল পর্যন্ত অপরিচিতির অনুভূতির কারণে মন অশান্ত থাকত। হযরত আবু হুরায়রা রাযিয়াল্লাহু আনহুর বর্ণনা– রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন– সেই আল্লাহর কসম! যিনি আমাকে সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, তোমরা দুনিয়াতে যেমন তোমাদের স্ত্রী ও গৃহকে চিন, তার চাইতেও বেশী জান্নাতে তোমাদের স্থান ও স্ত্রীদেরকে চিনবে এবং তাদের সাথে অন্তরঙ্গ হবে। (মাযহারী)

কোন কোন রেওয়ায়েতে আছে, প্রত্যেক জান্নাতীর জন্যে একজন ফেরেশতা নিযুক্ত করা হবে। সে জান্নাতে তার স্থান বলে দেবে এবং সেখানকার সঙ্গীনীদের সাথে পরিচয় করিয়ে দেবে। (মাআরেফুল কুরআন ৮/১৪–১৫)

দশম অধ্যায়

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের জিহাদসমূহ

(ক) বদর যুদ্ধ

ইরশাদ হয়েছে—

كَمَآ اَخْرَجَكَ رَبُّكَ مِنْ بَيْتِكَ بِالْحَقِّ ص وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ
لَكٰرِهُوْنَ (٥) يُجَادِلُوْنَكَ فِى الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُوْنَ اِلَى
الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ (٦) وَاِذْ يَعِدُكُمُ اللّٰهُ اِحْدَى الطَّآئِفَتَيْنِ اَنَّهَا
لَكُمْ وَتَوَدُّوْنَ اَنَّ غَيْرَ ذَاتِ الشَّوْكَةِ تَكُوْنُ لَكُمْ وَيُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّحِقَّ
الْحَقَّ بِكَلِمٰتِهٖ وَيَقْطَعَ دَابِرَ الْكَافِرِيْنَ (٧) لِيُحِقَّ الْحَقَّ وَيُبْطِلَ
الْبَاطِلَ وَلَوْ كَرِهَ الْمُجْرِمُوْنَ (٨) اِذْ تَسْتَغِيْثُوْنَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ
لَكُمْ اَنِّىْ مُمِدُّكُمْ بِاَلْفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُرْدِفِيْنَ (٩) وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ
اِلَّا بُشْرٰى وَلِتَطْمَئِنَّ بِهٖ قُلُوْبُكُمْ ط وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ
عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ ط (١٠) اِذْ يُغَشِّيْكُمُ النُّعَاسَ اَمَنَةً مِّنْهُ وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ
مِّنَ السَّمَآءِ مَآءً لِّيُطَهِّرَكُمْ بِهٖ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ
عَلٰى قُلُوْبِكُمْ وَيُثَبِّتَ بِهِ الْاَقْدَامَ (١١) اِذْ يُوْحِىْ رَبُّكَ اِلَى الْمَلٰٓئِكَةِ
اَنِّىْ مَعَكُمْ فَثَبِّتُوا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ط سَاُلْقِىْ فِىْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا
الرُّعْبَ فَاضْرِبُوْا فَوْقَ الْاَعْنَاقِ وَاضْرِبُوْا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ (١٢) ذٰلِكَ
بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ج وَمَنْ يُّشَاقِقِ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ
الْعِقَابِ (١٣) ذٰلِكُمْ فَذُوْقُوْهُ وَاَنَّ لِلْكٰفِرِيْنَ عَذَابَ النَّارِ (١٤) يٰاَيُّهَا

الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا زَحْفًا فَلَا تُوَلُّوْهُمُ الْاَدْبَارَ (١٥)
وَمَنْ يُّوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهٗٓ اِلَّا مُتَحَرِّفًا لِّقِتَالٍ اَوْ مُتَحَيِّزًا اِلٰى فِئَةٍ فَقَدْ
بَآءَ بِغَضَبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰهُ جَهَنَّمُ ط وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ (١٦) فَلَمْ تَقْتُلُوْهُمْ
وَلٰكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ رَمٰى وَلِيُبْلِيَ
الْمُؤْمِنِيْنَ مِنْهُ بَلَآءً حَسَنًا اِنَّ اللّٰهَ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (١٧) ذٰلِكُمْ وَاَنَّ اللّٰهَ
مُوْهِنُ كَيْدِ الْكٰفِرِيْنَ (١٨) اِنْ تَسْتَفْتِحُوْا فَقَدْ جَآءَكُمُ الْفَتْحُ وَاِنْ
تَنْتَهُوْا فَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ وَاِنْ تَعُوْدُوْا نَعُدْ وَلَنْ تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ
شَيْئًا وَّلَوْ كَثُرَتْ وَاَنَّ اللّٰهَ مَعَ الْمُؤْمِنِيْنَ (١٩) (انفال ٥ - ١٩)

তরজমাঃ (৫) যেমন করে তোমাকে তোমার পরওয়ারদেগার ঘর থেকে বের করেছেন ন্যায় ও সৎকাজের জন্য। অথচ ঈমানদারদের একটিদল (তাতে) সম্মত ছিল না। (৬) তারা তোমার সাথে বিবাদ করছিল সত্য ও ন্যায় বিষয়ে, তা প্রকাশিত হবার পর। তারা যেন মৃত্যুর দিকে ধাবিত হচ্ছে দেখতে দেখতে। (৭) আর যখন আল্লাহ দুটি দলের একটির ব্যাপারে তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছিলেন যে, সেটি তোমাদের হস্তগত হবে। আর তোমরা কামনা করছিলে যাতে কোন রকম কন্টক নেই, তাই তোমাদের ভাগে আসুক। অথচ আল্লাহ চাইতেন সত্যকে স্বীয় কালামের মাধ্যমে সত্যে পরিণত করতে এবং কাফেরদের মূল কর্তন করে দিতে। (৮) যাতে করে সত্যকে সত্য এবং মিথ্যাকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে দেন। যদিও পাপীরা অসন্তুষ্ট হয়। (৯) তোমরা যখন ফরিয়াদ করতে আরম্ভ করেছিলে স্বীয় পরওয়ারদেগারের নিকট। তখন তিনি তোমাদের ফরিয়াদের মঞ্জুরী দান করলেন যে, আমি তোমাদিগকে সাহায্য করব ধারাবাহিকভাবে আগত হাজার ফেরেশতার মাধ্যমে। (১০) আর আল্লাহ তো শুধু সুসংবাদ দান করলেন যাতে তোমাদের মন আশ্বস্ত হতে পারে। আর সাহায্য আল্লাহর পক্ষ থেকে ছাড়া অন্য কারও পক্ষ থেকে হতে পারে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহা শক্তির অধিকারী, হেকমতওয়ালা। (১১) যখন তিনি আরোপ করেন তোমাদের উপর

তন্দ্রাচ্ছন্নতা নিজের পক্ষ থেকে তোমাদের প্রশান্তির জন্য এবং তোমাদের উপর আকাশ থেকে পানি অবতারণ করেন, যাতে তোমাদিগকে পবিত্র করে দেন এবং যাতে তোমাদের থেকে অপসারিত করে দেন শয়তানের অপবিত্রতা। আর যাতে করে সুরক্ষিত করে দিতে পারে তোমাদের অন্তরসমূহকে এবং তাতে যেন সুদৃঢ় করে দিতে পারেন তোমাদের পা গুলো। (১২) যখন নির্দেশ দান করেন ফেরেশতাদিগকে তোমাদের পরওয়ারগেদার যে, আমি সাথে রয়েছি তোমাদের। সুতরাং তোমরা মুসলমানদের চিত্তসমূহকে ধীরস্থির করে রাখ। আমি কাফেরদের মনে ভীতির সঞ্চার করে দেব। কাজেই গর্দানের উপর আঘাত হান এবং তাদেরকে কাট জোড়ায় জোড়ায়। (১৩) যেহেতু তারা অবাধ্য হয়েছে আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের, সেজন্য এই নির্দেশ। বস্তুতঃ যে লোক আল্লাহ ও রাসূলের অবাধ্য হয়, নিঃসন্দেহে আল্লাহর শাস্তি অত্যন্ত কঠোর। (১৪) আপাততঃ বর্তমান এ শাস্তি তোমরা আস্বাদন করে নাও এবং জেনে রাখ যে, কাফেরদের জন্য রয়েছে দোযখের আযাব। (১৫) হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন কাফেরদের সাথে মুখোমুখী হবে, তখন তাদেরকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। (১৬) আর যে লোক সেদিন তাদের থেকে পশ্চাদপসারণ করবে, অবশ্য যে লড়াইয়ের কৌশল পরিবর্তন কল্পে কিংবা যে নিজ সৈন্যদের নিকট আশ্রয় নিতে আসে সে ব্যতীত– অন্যরা আল্লাহর গযব সাথে নিয়ে প্রত্যাবর্তন করবে। আর তার ঠিকানা হল জাহান্নাম। বস্তুতঃ সেটা হল নিকৃষ্ট অবস্থান। (১৭) সুতরাং তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি, বরং আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছেন। আর তুমি মাটির মুষ্টি নিক্ষেপ করনি, যখন তা নিক্ষেপ করেছিলে বরং তা নিক্ষেপ করেছিলেন আল্লাহ স্বয়ং যেন ঈমানদারদের প্রতি ইহসান করতে পারেন যথার্থভাবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ শ্রবণকারী, পরিজ্ঞাত। (১৮) এটাতো গেল, আর জেনে রেখো, আল্লাহ নস্যাৎ করে দেবেন কাফেরদের সমস্ত কলা-কৌশল। (১৯) তোমরা যদি মীমাংসা কামনা কর, তাহলে তোমাদের নিকট মীমাংসা পৌঁছে গেছে। আর যদি তোমারা প্রত্যাবর্তন কর, তবে তা তোমাদের জন্য উত্তম এবং তোমরা যদি তাই কর, তবে আমিও তেমনই করব। বস্তুতঃ তোমাদের কোনই কাজে আসবে না তোমাদের দল-বল। তা যত বেশীই হোক। জেনে রেখো, আল্লাহ রয়েছেন ঈমানদারদের সাথে। (সূরা আনফাল ৫–১৯)

বদর যুদ্ধের বিবরণ

তাফসীরঃ ইবনে আকাবাহ ও ইবনে আমরের বর্ণনা অনুসারে ঘটনাটি ছিল এই যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মদীনায় এ সংবাদ এসে পৌছে যে, আবু সুফিয়ান একটি বাণিজ্যিক কাফেলাসহ বাণিজ্যিক পণ্য-সামগ্রী নিয়ে সিরিয়া থেকে মক্কার দিকে যাচ্ছে। আর এই বাণিজ্যে মক্কার সমস্ত কুরাইশ অংশীদার। ইবনে আকবাহ বর্ণনা অনুযায়ী মক্কায় এমন কোন কুরাইশ নারী বা পুরুষ ছিল না যার অংশ এ বাণিজ্যে ছিল না। কারো কাছে এক মিসকাল (সাড়ে চার মাশা) পরিমাণ সোনা থাকলে সেও তা এতে নিজের অংশ হিসেবে লাগিয়েছিল। এই কাফেলার মোট পুঁজি সম্পর্কে ইবনে আকাবার বর্ণনা হচ্ছে এই যে, তা পঞ্চাশ হাজার দীনার ছিল। দীনার হল একটি স্বর্ণ মুদ্রা যার ওজন সাড়ে চার মাশা। স্বর্ণের বর্তমান দর অনুযায়ী এর মূল্য হয় বায়ান্ন টাকা (বর্তমান বাজার হিসেবে কয়েক শ গুণ বেশী হবে) এবং গোটা পুঁজির মূল্য হয় ছাব্বিশ লক্ষ টাকা। আর তাও আজকের নয়। বরং চৌদ্দশ বছর পূর্বেকার। ছাব্বিশ লক্ষ বা বর্তমানে ছাব্বিশ কোটি অপেক্ষাও অনেক গুণ বেশী হতে পারে। এই বাণিজ্যিক কাফেলার রক্ষণাবেক্ষণ এবং ব্যবসায়ের জন্য সত্তর জন কুরাইশ যুবক ও সর্দার এর সাথে ছিল। এতে প্রতীয়মান হয় যে, প্রকৃতপক্ষে এই বাণিজ্য কাফেলাটি ছিল কুরাইশদের একটি বাণিজ্য কোম্পানী। ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু প্রমুখের রেওয়ায়েত মতে বগভী (রহঃ) উল্লেখ করেছেন যে, এই কাফেলার অন্তর্ভুক্ত ছিলেন কুরাইশদের চল্লিশ জন ঘোড় সওয়ার সর্দার যাদের মধ্যে আমর ইবনুল আস মাখরামাহ ইবনে নাওফেল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তাছাড়া একথাও সবাই জানত যে, কুরাইশদের এই বাণিজ্য ও বাণিজ্যিক এই পুঁজিই ছিল সবচেয়ে বড় শক্তি। এরই ভরসায় তারা রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সঙ্গী-সাথীদিগকে উৎপীড়ন করে মক্কা ছেড়ে যেতে বাধ্য করেছিল। সে কারণেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সিরিয়া থেকে এই কাফেলা ফিরে আসার সংবাদ পেলেন, তখন তিনি স্থির করলেন যে, এখনই কাফেলার মোকাবেলা করে কুরাইশদের ক্ষমতাকে ভেঙ্গে দেয়ার উপযুক্ত সময়। তিনি সাহাবায়ে কেরামদের সাথে এ বিষয়ে পরামর্শ করলেন। তখন ছিল রমযান মাস।

যুদ্ধেরও কোন পূর্ব প্রস্তুতি ছিল না। কাজেই কেউ কেউ সাহস ও শৌর্য প্রদর্শন করলেও অনেকে কিছুটা দোদুল্যমনতা প্রকাশ করলেন। স্বয়ং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও সবার উপর এ জিহাদে অংশগ্রহণ করাকে অপরিহার্য বা বাধ্যতামূলক হিসেবে সাব্যস্ত করলেন না, বরং তিনি হুকুম করলেন, যাদের কাছে সওয়ারীর ব্যবস্থা রয়েছে তারা যেন আমাদের সাথে যুদ্ধ যাত্রা করেন। তাতে অনেকে যুদ্ধ যাত্রা থেকে বিরত থেকে যান। আর যাঁরা যুদ্ধে যেতে ইচ্ছুক ছিলেন, কিন্তু তাঁদের সওয়ারী ছিল গ্রাম এলাকায়। তাঁরা গ্রাম থেকে সওয়ারী আনিয়ে পরে যুদ্ধে অংশগ্রহণের অনুমতি চাইলেন। কিন্তু এতটা অপেক্ষা করার মত সময় তখন ছিল না। তাই নির্দেশ হল, যাঁদের নিকট এ মুহূর্তে সওয়ারী উপস্থিত রয়েছে এবং জিহাদে যেতে চান, শুধু তারাই যাবেন। বাইরে থেকে সওয়ারী আনিয়ে নেওয়ার মত সময় এখন নেই। কাজেই হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যেতে আগ্রহীদের মধ্যেও অল্পই তৈরী হতে পারলেন। বস্তুতঃ যাঁরা এই জিহাদে অংশগ্রহণের আদৌ ইচ্ছাই করেনি, তার কারণও ছিল। তা এই যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এতে অংশগ্রহণ করা সবার জন্য ওয়াজিব বা অপরিহার্য সাব্যস্ত করেননি। তাছাড়া তাদের মনে এ বিশ্বাসও ছিল যে, এটা একটা বাণিজ্যিক কাফেলা মাত্র। কোন যুদ্ধ বাহিনী নয় যার মোকাবেলা করার জন্য রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সঙ্গীদিগকে খুব বেশী পরিমাণ সৈন্য কিংবা মুজাহিদীনের প্রয়োজন পড়তে পারে। কাজেই সাহাবায়ে কেরামের এক বিরাট অংশ এতে অংশগ্রহণ করেননি। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম 'বি'রে সুক্ইয়া' নামক স্থানে পৌঁছে যখন কায়েস ইবনে সা'দা'আ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে সৈন্য গণনা করার নির্দেশ দেন, তখন তিনি তা গুণে নিয়ে জানান তিন'শ তের জন রয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা শুনে আনন্দিত হয়ে বললেন– তালুতের সৈন্য সংখ্যাও এই ছিল। কাজেই লক্ষণ শুভ। বিজয় ও কৃতকার্যতারই লক্ষণ বটে। সাহাবায়ে কেরামের সাথে মোট উট ছিল সত্তরটি। প্রতি তিনজনের জন্য একটি, যাতে তারা পালাক্রমে সওয়ারী করেছিলেন। স্বয়ং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে অপর দু'জন একটি উটের অংশীদার ছিলেন। তাঁরা ছিলেন হযরত আবু লুবাবাহ ও হযরত আলী

রাযিয়াল্লাহু আনহুমা। যখন হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পায়ে হেঁটে চলার পালা আসত তখন তারা বলতেন (ইয়া রাসূলুল্লাহ) আপনি উটের উপরেই থাকুন। আপনার পরিবর্তে আমরা হেঁটে চলব। তাতে রহমাতুললিল আলামীনের পক্ষ থেকে উত্তর আসত! না, তোমরা আমার চেয়ে বেশী বলিষ্ঠ, আর না আখেরাতের সওয়াবে আমার প্রয়োজন নেই যে আমার সওয়াবের সুযোগটি তোমাদিগকে দিয়ে দেব। সুতরাং নিজের পালা এলে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও পায়ে হেঁটে চলতেন। অপরদিকে সিরিয়ার বিখ্যাত স্থান আইনে-যোরকায়' পৌঁছে কোন এক লোক কুরাইশ কাফেলার নেতা আবু সুফিয়ানকে এ সংবাদ জানিয়ে দিল যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের এ কাফেলার অপেক্ষা করছেন। তিনি এর পশ্চাদ্ধাবন করবেন। আবু সুফিয়ান সতর্কতামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করল। যখন কাফেলাটি হেজাজের সীমানায় গিয়ে পৌঁছল, তখন বিচক্ষণ ও কর্মক্ষম জনৈক দমদম ইবনে উমরকে (ضمضم ابن عمر) কুড়ি মেসকাল সোনা অর্থাৎ প্রায় দু' হাজার টাকা মজুরী দিয়ে এ ব্যাপারে রাজী করাল যে, সে একটি দ্রুতগামী উষ্ট্রীতে চড়ে যথা শীঘ্র মক্কা মুকাররামায় গিয়ে এ সংবাদটি পৌঁছে দিবে যে, তাদের কাফেলা সাহাবায়ে কেরামের আক্রমণ আশঙ্কার সম্মুখীন হয়ে পড়েছে। দম দম ইবনে ওমর সেকালের বিশেষ রীতি অনুযায়ী আশঙ্কার ঘোষণা দেয়ার উদ্দেশ্যে তার উষ্ট্রীর নাক-কান কেটে এবং নিজের পরিধেয় পোষাকের সামনে পেছনে ছিঁড়ে ফেলল এবং হাওদাটি উল্টোভাবে উষ্ট্রীর পিঠে বসিয়ে দিল। এ ছিল সেকালে ঘোর বিপদের চিহ্ন। যখন সে এভাবে মক্কায় এসে ঢুকল, তখন গোটা মক্কা নগরীতে এক হৈ চৈ পড়ে গেল। সাজ সাজ রব উঠল। সমস্ত কুরাইশ প্রতিরোধের জন্য তৈরী হয়ে পড়ল। যারা এ যুদ্ধে যেতে পারল, নিজেই অংশগ্রহণ করল। আর যারা কোন কারণে অপারগ ছিল তারা অন্য কাউকে নিজের স্থলাভিষিক্ত করে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত করল। এভাবে মাত্র তিন দিনের মধ্যে সমগ্র কুরাইশ বাহিনী পরিপূর্ণ সাজ সরঞ্জাম নিয়ে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেল। তাদের মধ্যে যারা এ যুদ্ধে অংশগ্রহণে গড়িমসি করত। তাদেরকে তারা সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখত এবং মুসলমানদের সমর্থক বলে মনে করত। কাজেই এ ধরনের লোককে তারা বিশেষভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণে বাধ্য করেছিল। যারা

প্রকাশ্যভাবে মুসলমান ছিলেন এবং কোন অসুবিধার দরুণ তখনও হিজরত করতে না পেরে মক্কাতে অবস্থান করছিলেন। তাদেরকে এবং বনু হাশেম গোত্রের যেসব লোকের প্রতি এমন ধারনা হতো যে, এরা মুসলমানদের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করে। তাদেরকেও এ যুদ্ধে অংশগ্রহণে বাধ্য করা হয়েছিল। এ সমস্ত অসহায় লোকদের মধ্যে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পিতৃব্য হযরত আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু এবং আবু তালেবের দুই পুত্র তালেব ও আকীলও ছিলেন। যা হোক, এভাবে সব মিলিয়ে এই বাহিনীতে এক হাজার জওয়ান দু'শ ঘোড়া ছ'শ বর্মধারী এবং সারী গায়িকা বাঁদী দল তাদের বাদ্য-যন্ত্রাদিসহ বদর অভিমুখে রওনা হল। প্রত্যেক মঞ্জিলে তাদের খাবার জন্য দশটি করে উট জবাই করা হত। অপরদিকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধুমাত্র একটি বাণিজ্যিক কাফেলার মোকাবেলা করার অনুপাতে প্রস্তুতি নিয়ে ১২ই রামাযান শনিবার মদীনা তাইয়্যেবা থেকে রওনা হন এবং কয়েক মঞ্জিল অতিক্রম করার পর বদরের নিকট এসে পৌঁছে দু'জন সাহাবীকে আবু সুফিয়ানের কাফেলার সংবাদ নিয়ে আসার জন্য পাঠিয়ে দেন। (মাযহারী)

সংবাদ বাহকরা ফিরে এসে জানালেন যে, আবু সুফিয়ানের কাফেলা মহানবীর পশ্চাদ্ধাবনের সংবাদ জানতে পেরে নদীর তীর ধরে অতিক্রম করে চলে গেছে। আর কুরাইশরা তাদের রক্ষণাবেক্ষণ ও মুসলমানদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য মক্কা থেকে এক হাজার সৈন্যের এক বাহিনী নিয়ে এগিয়ে আসছে। (ইবনে কাসীর)

বলা বাহুল্য, এ সংবাদে অবস্থার মোড় পাল্টে গেল। তখন রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সঙ্গী সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করলেন যে, আগত এ বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করা হবে কিনা। হযরত আবু আইয়ূব আনসারী ও অন্যান্য কতিপয় সাহাবী নিবেদন করলেন, তাদের মোকাবেলা করার মত শক্তি আমাদের নেই। তাছাড়া আমরা এমন কোন উদ্দেশ্য নিয়ে আসিওনি। তখন হযরত সিদ্দীকে আকবার রাযিয়াল্লাহু আনহু উঠে দাঁড়ালেন এবং রাসূলের নির্দেশ পালনের জন্য নিজেকে নিবেদন করলেন। তারপর হযরত ফারূকে আযম রাযিয়াল্লাহু আনহু উঠে দাঁড়ালেন এবং তেমনিভাবে নির্দেশ পালন ও জিহাদের জন্য প্রস্তুতির কথা প্রকাশ

করলেন। অতঃপর মেকদাদ রাযিয়াল্লাহু আনহু উঠে নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর পক্ষ থেকে আপনি যে ফরমান পেয়েছেন, তা জারী করে দিন। আমরা আপনার সাথে রয়েছি। আল্লাহর কসম! আমরা আপনাকে এমন উত্তর দেব না– যা বনী ইসরাঈলরা দিয়েছিল হযরত মুসা (আঃ)কে। তারা বলেছিলঃ

اِذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هٰهُنَا قَاعِدُوْنَ

অর্থাৎ, যান, আপনি ও আপনার রব (পালনকর্তাই) গিয়ে লড়াই করুন। আমরা তো এখানেই বসে থাকলাম।

সে সত্তার কসম! যিনি আপনাকে সত্য ধর্ম দিয়ে পাঠিয়েছেন। আপনি যদি আমাদের আবিসিয়ার 'বা'কুলগিমাদ' নামক স্থান পর্যন্ত নিয়ে যান, তবুও আমরা জিহাদ করার জন্য আপনার সাথে যাব। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মেকদাদের কথা শুনে অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং দু'আ করেন। কিন্তু তখনও আনসারগণের পক্ষ থেকে সহযোগিতার কোন সাড়া পাওয়া যাচ্ছিল না। আর এমন একটা সম্ভাবনাও ছিল যে, হুযূরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আনসারগণের যে সহযোগিতা চুক্তি সম্পাদিত হয়েছিল যেহেতু তা ছিল মদীনার অভ্যন্তরের জন্য, সেহেতু তারা মদীনার বাইরে সাহায্য-সহায়তার ব্যাপারে বাধ্যও ছিলেন না। সুতরাং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সভাসদকে লক্ষ্য করে বললেন, বন্ধুগণ! তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও যে, আমরা এই জিহাদে মদীনার বাইরে এগিয়ে যাব কিনা? এই সম্বোধনের মূল লক্ষ্য ছিলেন আনসারগণ। হযরত সাদ ইবনে মুআয আনসারী রাযিয়াল্লাহু আনহু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশ্য বুঝতে পেরে নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি আমাদিগকে জিজ্ঞাসা করছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। তখন সা'দ ইবনে মুআয রাযিয়াল্লাহু আনহু বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার উপর ঈমান এনেছি এবং সাক্ষ্য দান করেছি যে, আপনি যা কিছু বলেন তা সত্য। আমরা এ প্রতিশ্রুতিও দিয়েছি যে, যে কোন অবস্থায় আপনার আনুগত্য করব। অতএব আপনি আল্লাহর পক্ষ থেকে যে ফরমান লাভ করেছেন, তা জারী করে দিন। সে সত্ত্বার কসম! যিনি আপনাকে দ্বীনে-হক দিয়ে পাঠিয়েছেন। আপনি যদি আমাদিগকে সমুদ্রে নিয়ে যান, তবে আমরা

আপনার সাথে তাতেই ঝাঁপিয়ে পড়ব। আমাদের মধ্যে থেকে কোন একটি লোকও আপনার কাছ থেকে সরে যাবে না। আপনি যদি কালই আমাদিগকে শত্রুর সম্মুখীন করে দেন, তবুও আমাদের মনে এতটুকু ক্ষোভ থাকবে না। আমরা আশা করি, আল্লাহ তাআলা আমাদের কর্মের মাধ্যমে এমন বিষয় প্রত্যক্ষ করাবেন, যা দেখে আপনার চোখ জুড়িয়ে যাবে। আল্লাহর নামে আমাদিগকে যেখানে ইচ্ছা নিয়ে যান।' এ বক্তব্য শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যন্ত খুশী হলেন এবং স্বীয় কাফেলাকে হুকুম করলেন, আল্লাহর নামে এগিয়ে যাও। সাথে সাথে এ সুসংবাদও শোনালেন যে, আমাদের আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ওয়াদা করেছেন যে, এ দু'টি দলের মধ্যে একটির উপর আমাদের বিজয় হবে। দু'টি দল বলতে, একটি হল আবু সুফিয়ানের বাণিজ্যিক কাফেলা, আর অপরটি হল মক্কা থেকে আগত সৈন্য দল। অতঃপর তিনি ইরশাদ করলেন, আল্লাহর কসম! আমি যেন মুশরিকদের বধ্যভূমি স্বচক্ষে দেখছি। (এ সমুদয় ঘটনা তাফসীরে ইবনে কাসীর এবং মাযহারী থেকে উদ্ধৃত।) ঘটনাটি বিস্তারিত জানার পর আলোচ্য আয়াতের প্রতি লক্ষ্য করুন।

প্রথম আয়াতে– وَاِنَّ فَرِيْقًا مِّنَ الْمُؤْمِنِيْنَ لَكٰرِهُوْنَ অর্থাৎ মুসলমানদের একটি দল এই জিহাদকে কঠিন মনে করছিল বলে যে উক্তি করা হয়েছে, তাতে পরামর্শকালে সাহাবায়ে কেরামের পক্ষ থেকে জিহাদের ব্যাপারে যে দুর্বলতা প্রকাশ পেয়েছিল, সে দিকেই ইঙ্গিত করা হয়েছে। আর এ ঘটনারই বিশ্লেষণ ব্যক্ত হয়েছে পরবর্তী يُجَادِلُوْنَكَ فِى الْحَقِّ بَعْدَ مَا تَبَيَّنَ كَاَنَّمَا يُسَاقُوْنَ اِلَى الْمَوْتِ وَهُمْ يَنْظُرُوْنَ আয়াতে। অর্থাৎ এরা আপনার সাথে সত্যের ব্যাপারে বিতর্ক ও বিরোধ করেছে যেন তাদেরকে মৃত্যুর দিকে টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে, যা তারা স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করেছে। সাহাবায়ে কেরাম যদিও কোন রকম নির্দেশ লংঘন করেননি, বরং পরামর্শের উত্তরে নিজেদের দুর্বলতা ও ভীরুতা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু রাসূলের সহচরদের কাছ থেকে এহেন মত প্রকাশ ও তাদের সুউচ্চ মর্যাদার প্রেক্ষিতে আল্লাহর পছন্দ ছিল না। কাজেই অসন্তোষের ভাষায়ই তা বিবৃত করা হয়েছে। (মাআরেফুল কুরআন ৪/২২২-২২৮)

ইরশাদ হয়েছে–

وَاعْلَمُوْٓا اَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَاَنَّ لِلّٰهِ خُمُسَهٗ وَلِلرَّسُوْلِ وَلِذِي
الْقُرْبٰى وَالْيَتٰمٰى وَالْمَسٰكِيْنِ وَابْنِ السَّبِيْلِ اِنْ كُنْتُمْ اٰمَنْتُمْ بِاللّٰهِ
وَمَآ اَنْزَلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ ط وَاللّٰهُ
عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (٤١) اِذْ اَنْتُمْ بِالْعُدْوَةِ الدُّنْيَا وَهُمْ بِالْعُدْوَةِ
الْقُصْوٰى وَالرَّكْبُ اَسْفَلَ مِنْكُمْ ط وَلَوْ تَوَاعَدْتُّمْ لَاخْتَلَفْتُمْ فِي الْمِيْعٰدِ
لا وَلٰكِنْ لِّيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا لا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْۢ بَيِّنَةٍ
وَّيَحْيٰى مَنْ حَيَّ عَنْۢ بَيِّنَةٍ ط وَاِنَّ اللّٰهَ لَسَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (٤٢) اِذْ يُرِيْكَهُمُ
اللّٰهُ فِيْ مَنَامِكَ قَلِيْلًا وَلَوْ اَرٰىكَهُمْ كَثِيْرًا لَّفَشِلْتُمْ وَلَتَنَازَعْتُمْ فِي
الْاَمْرِ وَلٰكِنَّ اللّٰهَ سَلَّمَ ط اِنَّهٗ عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ (٤٣) وَاِذْ
يُرِيْكُمُوْهُمْ اِذِ الْتَقَيْتُمْ فِيْٓ اَعْيُنِكُمْ قَلِيْلًا وَّيُقَلِّلُكُمْ فِيْٓ اَعْيُنِهِمْ
لِيَقْضِيَ اللّٰهُ اَمْرًا كَانَ مَفْعُوْلًا ط وَاِلَى اللّٰهِ تُرْجَعُ الْاُمُوْرُ (٤٤) يٰٓاَيُّهَا
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا لَقِيْتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوْا وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ
تُفْلِحُوْنَ (٤٥) وَاَطِيْعُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ وَلَا تَنَازَعُوْا فَتَفْشَلُوْا وَتَذْهَبَ
رِيْحُكُمْ وَاصْبِرُوْا ط اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ (٤٦) (انفال: ٤٦-٤١)

তরজমাঃ (৪১) আর একথা জেনে রাখ যে, কোন বস্তু সামগ্রীর মধ্য থেকে যা কিছু তোমরা গনীমত হিসেবে লাভ কর তার এক পঞ্চমাংশ হল আল্লাহর জন্য, রাসূলের জন্য, তার নিকটাত্মীয়-স্বজনের জন্য এবং ইয়াতীম-অসহায় ও মুসাফিরদের জন্য। যদি তোমাদের বিশ্বাস থাকে আল্লাহর উপর এবং সে বিষয়ের উপর যা আমি আমার বান্দার প্রতি অবতীর্ণ করেছি ফায়সালার দিনে, যে দিন সম্মুখীন হয়ে যায় উভয় সেনা দল। আর আল্লাহ সবকিছুর উপরই ক্ষমতাশীল। (৪২) আর যখন তোমরা ছিলে সমরাঙ্গণের এ প্রান্তে আর তারা ছিল সে প্রান্তে অথচ কাফেলা তোমাদের

থেকে নীচে নেমে গিয়েছিল। এমতাবস্থায় যদি তোমরা পারস্পরিক অঙ্গীকারাবদ্ধ হতে। তবে তোমরা এক সঙ্গে সে ওয়াদা পালন করতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ্ তাআলা এমন এক কাজ করতে চেয়েছিলেন, যা নির্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। যাতে সে সব লোক নিহত হওয়ার ছিল, প্রমাণ প্রতিষ্ঠার পর এবং যাদের বাঁচার ছিল, তারা বেঁচে থাকে প্রমাণ প্রতিষ্ঠার পর। আর নিশ্চিতই আল্লাহ শ্রবণকারী, বিজ্ঞ। (৪৩) আল্লাহ যখন তোমাকে স্বপ্নে সেসব কাফেরের পরিমাণ অল্প করে দেখালেন, বেশী করে দেখালে তোমরা কাপুরুষতা অবলম্বন করতে এবং কাজের বেলায় বিপদ সৃষ্টি করতে। কিন্তু আল্লাহ্ বাঁচিয়ে দিয়েছেন। তিনি অতি উত্তমভাবেই জানেন যা কিছু অন্তরে রয়েছে। (৪৪) আর যখন তোমাদেরকে দেখালেন সে সৈন্য দল মোকাবেলার সময় তোমাদের চোখে অল্প এবং তোমাদেরকে দেখালেন তাদের চোখে অল্প, যাতে আল্লাহ্ সে কাজ করে নিতে পারেন, যা ছিল নির্ধারিত। আর সব কাজই আল্লাহ্র নিকট গিয়ে পৌছায়। (৪৫) হে ঈমানদারগণ! তোমরা যখন কোন বাহিনীর সাথে সংঘাতে লিপ্ত হও। তখন সুদৃঢ় থাক এবং আল্লাহকে অধিক পরিমাণে স্মরণ কর যাতে তোমরা উদ্দেশ্যে কৃতকার্য হতে পার। (৪৬) আর আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশ মান্য কর এবং তাঁর রাসূলের। তাছাড়া তোমরা পরস্পরে বিবাদে লিপ্ত হইও না। যদি তা কর, তবে তোমরা কাপুরুষ হয়ে পড়বে এবং তোমাদের প্রভাব চলে যাবে। আর তোমরা ধৈর্য ধারণ কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তাআলা রয়েছেন ধৈর্যশীলদের সাথে। (সূরা আনফাল ৪১-৪৬)

তাফসীরঃ ৪১ নং আয়াতের ব্যাখ্যা চলে গেছে মালে গনীমত অধ্যায় ১২৮/১২৯ পৃঃ, ৪৩ ও ৪৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা চলে গেছে ১১৬/১১৭ পৃষ্ঠায়, ৪৫ ও ৪৬ এর ব্যাখ্যা চলে গেছে ৬৬, ৬৭, ৬৮ ও ৬৯ নং পৃষ্ঠায় জিহাদের ফযীলত অধ্যায়ে।

ইরশাদ হয়েছে-

إِذْ يَقُوْلُ الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِىْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ غَرَّ هٰٓؤُلَآءِ دِيْنُهُمْ ط وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ (٤٩) وَلَوْ تَرٰٓى اِذْ يَتَوَفَّى الَّذِيْنَ كَفَرُوا الْمَلٰٓئِكَةُ يَضْرِبُوْنَ وُجُوْهَهُمْ وَاَدْبَارَهُمْ ج وَذُوْقُوْا

عَذَابَ الْحَرِيْقِ (٥٠) (انفال: ٤٩-٥٠)

তরজমাঃ যখন মুনাফিকরা বলতে লাগল এবং যাদের অন্তর ব্যাধিগ্রস্ত এরা নিজেদের ধর্মের উপর গর্বিত। বস্তুতঃ যারা ভরসা করে আল্লাহ্র উপর সে নিশ্চিত। কেননা আল্লাহ্ অতি পরাক্রমশালী-সুবিজ্ঞ। আর যদি তুমি দেখ, যখন ফেরেশতারা কাফেরদের জান কবজ করে; প্রহার করে তাদের মুখে এবং তাদের পশ্চাদদেশে আর বলে জ্বলন্ত আযাবের স্বাদ গ্রহণ কর।
(আনফাল ৪৯-৫০)

তাফসীরঃ প্রথম আয়াতে মুসলমানদের ব্যাপারে মদীনার মুনাফিক ও মক্কার মুশরিকদের একটি যৌথ সংলাপ উদ্ধৃত করা হয়েছে, যা তাদের জন্য দুঃখ করেই যেন বলা হয়েছিল। তা হচ্ছে এই- غَرَّ هٰؤُلَاءِ دِيْنُهُمْ অর্থাৎ বদরের ময়দানে মুষ্টিমেয় এই মুসলমানরা যে এহেন বিরাট শক্তিশালী বাহিনীর বিরুদ্ধে লড়তে চলে এসেছে। তা এই বেচারাদেরকে তাদের দ্বীনই প্রতারণায় ফেলে মৃত্যুর মুখে এনে ফেলেছে। আল্লাহ্ তাআলা তাদের উত্তরে বলেছেন- وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَاِنَّ اللّٰهَ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ অর্থাৎ যে লোক আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল ও ভরসা করে নেয়, জেনে রেখো, সে কখনও অপমানিত-অপদস্থ হয় না। কারণ আল্লাহ্ তাআলা সবকিছুর উপর পরাক্রমশীল। তাঁর কৌশলের সামনে সবার জ্ঞান-বুদ্ধিই বিকল হয়ে যায়। মর্মার্থ এই যে, তোমরা শুধু বস্তু ও বস্তুজগত সম্পর্কেই অবগত এবং তারই উপর নির্ভর কর। কিন্তু সেই গোপন শক্তি সম্পর্কে তোমাদের কোন খবরই নেই যা বস্তু ও বস্তুজগতের স্রষ্টা আল্লাহ্ তাআলার খাজানায় রয়েছে এবং যা তাঁর উপর ঈমান ও বিশ্বাস স্থাপনকারী লোকদের সঙ্গে থাকে। ইদানিংকালেও সরল-সোজা ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের দেখে তথাকথিত অনেক বিজ্ঞ-বুদ্ধিমান বলে থাকে 'এরা পুরনো দিনের লোক, এদের কিছু বলো না।' কিন্তু এদের মধ্যে যদি আল্লাহ্র উপর পরিপূর্ণ ঈমান ও ভরসা থাকে, তবে এতে তাদের কিছুই অনিষ্ঠ হতে পারে না। (মাআরেফুল কুরআন ৪/৩২৩-৩২৪)

ইরশাদ হয়েছে-

مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ لَهٗٓ اَسْرٰى حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ تُرِيْدُوْنَ

عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ (٦٧) لَوْ لَا كِتٰبٌ مِّنَ اللّٰهِ سَبَقَ لَمَسَّكُمْ فِيْمَآ اَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظِيْمٌ (٦٨) فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلٰلًا طَيِّبًا وَّاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (٦٩) (انفال: ٦٧-٦٩)

তরজমাঃ (৬৭) নবীর পক্ষে উচিত নয় বন্দীদিগকে নিজের কাছে রাখা। যতক্ষণ না দেশময় প্রচুর রক্তপাত ঘটাবে। তোমরা পার্থিব সম্পদ কামনা কর অথচ আল্লাহ চান আখেরাত। আর আল্লাহ হচ্ছেন পরাক্রমশালী হেকমতওয়ালা। (৬৮) যদি একটি বিষয় না হত যা পূর্ব থেকেই আল্লাহ লিখে রেখেছেন, তাহলে তোমরা যা গ্রহণ করেছ সে জন্য বিরাট আযাব এসে পৌঁছত। (৬৯) সুতরাং তোমরা খাও গনীমত হিসেবে তোমরা যে পরিচ্ছন্ন ও হালাল বস্তু অর্জন করেছ তা থেকে। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, মেহেরবান। (আনফাল ৬৭–৬৯)

তাফসীরঃ مَا كَانَ لِنَبِيٍّ اَنْ يَّكُوْنَ আয়াতটি গাযওয়ায়ে বদরের বিশেষ এক ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত বিধায় এগুলোর তাফসীর করার পূর্বে বিশুদ্ধ ও প্রামাণ্য রেওয়ায়েত ও হাদীসের মাধ্যমে ঘটনাটি বিবৃত করা বাঞ্ছনীয়।

ঘটনাটি হল এই যে, বদর যুদ্ধটি ছিল ইসলামের সর্বপ্রথম জিহাদ যা একান্তই দৈব্যাৎ সংঘটিত হয়। তখনও জিহাদ সংক্রান্ত হুকুম-আহকামের কোন বিস্তারিত বিবরণ কুরআনে কারীমে অবতীর্ণ হয়নি। যেমন, জিহাদ করতে গিয়ে গণীমতের মাল হস্তগত হলে তা কি করতে হবে, শত্রু-সৈন্য নিজেদের আয়ত্ত্বে এসে গেলে, তাকে বন্দী করা জায়েয হবে কিনা এবং বন্দী করে ফেললে তাদের সাথে কেমন আচরণ করতে হবে প্রভৃতি।

সহীহ বুখারী ও মুসলিম শরীফের রেওয়ায়েতে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলে কারীম (সাঃ) ইরশাদ করেছেন, আমাকে এমন পাঁচটি বিষয় দান করা হয়েছে, যা আমার পূর্বে অন্য কোন নবীকে দেয়া হয়নি। সেগুলোর মাঝে এও একটি যে, কাফেরদের থেকে প্রাপ্ত গনীমতের মালামাল কারো জন্য হালাল ছিল না, কিন্তু আমার উম্মতের জন্য তা হালাল করে দেয়া হয়েছে। গনীমতের মাল বিশেষভাবে এ উম্মতের জন্য হালাল হওয়ার বিষয়টি আল্লাহর

তো জানা ছিল, কিন্তু গাযওয়ায়ে বদরের পূর্ব পর্যন্ত এর হালাল হওয়ার ব্যাপারে মহানবী (সাঃ)-এর উপর কোন অহী নাযিল হয়নি। অথচ গাযওয়ায়ে বদরে এমন এক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় যে, আল্লাহ্ তাআলা মুসলমানগণকে ধারণা-কল্পনার বাইরে অসাধারণ বিজয় দান করেন। শত্রুরা বহু মালামাল ফেলে যায়, যা গনীমত হিসাবে মুসলমানদের হস্তগত হয় এবং তাদের বড় বড় সত্তর জন সর্দার মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়ে আসে। কিন্তু এতদুভয় বিষয়ের বৈধতা সম্পর্কে কোন অহী তখনও আসেনি।

সে কারণেই সাহাবায়ে কেরামের প্রতি এহেন তড়িৎ পদক্ষেপের দরুণ ভর্ৎসনা অবতীর্ণ হয়। এই ভর্ৎসনা ও অসন্তুষ্টিই এই অহীর মাধ্যমে ব্যক্ত করা হয়েছে যাতে যুদ্ধ বন্দীদের সম্পর্কে বাহ্যতঃ দুটি অধিকার মুসলমানগণকে দেয়া হয়েছিল। কিন্তু এরই মাঝে এই ইঙ্গিতও করা হয়েছিল যে, বিষয়টির দুটি দিকের মধ্যে আল্লাহ্ তাআলার নিকট একটি পছন্দনীয় এবং অপরটি অপছন্দনীয়। তিরমিযী, সুনানে নাসায়ী, সহীহ ইবনে হাব্বান প্রভৃতি গ্রন্থে হযরত আলী মুর্তজা (রাযিঃ)-এর রেওয়ায়েতক্রমে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, এ সময় হযরত জিবরাঈল আমীন রাসূলে কারীম (সাঃ)-এর নিকট আগমন করে তাঁকে আল্লাহর এ নির্দেশ জানান যে, আপনি সাহাবায়ে কেরামকে দুটি বিষয়ের যে কোন একটি গ্রহণ করার অধিকার দান করুন। তার একটি হলো এই যে, এই যুদ্ধ বন্দীদিগকে হত্যা করে শত্রুর মনোবলকে চিরতরে ভেঙ্গে দিবে। আর দ্বিতীয়টি হলো এই যে, তাদেরকে মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দিবে। তবে দ্বিতীয় অবস্থায় আল্লাহ্ তাআলার নির্দেশক্রমে একথা অবধারিত হয়ে রয়েছে যে, এর বদলা হিসাবে আগামী বছর মুসলমানদের এমনই সংখ্যক লোক শহীদ হবেন, যে সংখ্যক বন্দী আজ মুক্তিপণের বিনিময়ে ছেড়ে দেয়া হবে। এভাবে যদিও ক্ষমতা দেয়া হয় এবং সাহাবায়ে কেরামকে এ দুটি থেকে একটি বেছে নেয়ার অধিকার দেয়া হয় কিন্তু দ্বিতীয় অবস্থায় সত্তর জন সাহাবার শাহাদাতের ফায়সালার বিষয় উল্লেখ করার মাঝে অবশ্যই এই ইঙ্গিত বিদ্যমান ছিল যে, এ দিকটি আল্লাহর নিকট পছন্দনীয় না। কারণ এটি যদি পছন্দই হত, তবে এর ফলে সত্তর জন মুসলমানের খুন অবধারিত হতো না।

সাহাবায়ে কেরামের সামনে এ দুটি বিষয় যখন ঐচ্ছিক বিষয় হিসাবে

পেশ করা হল যে, এদেরকে যদি মুক্তিপণ নিয়ে ছেড়ে দেয়া হয়, তবে হয়তো এরা সবাই অথবা এদের কেউ কেউ কোন সময় মুসলমান হয়ে যাবে। আর প্রকৃতপক্ষে এটাই হল জিহাদের উদ্দেশ্য ও মূল উপকারিতা। দ্বিতীয়তঃ এমনও ধারণা করা হয়েছিল যে, এ সময় মুসলমানগণ যখন নিদারুণ দৈন্যাবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন, তখন সত্তর জনের আর্থিক মুক্তিপণ অর্জিত হলে এ কষ্টও কিছুটা লাঘব হতে পারে এবং তা ভবিষ্যতে জিহাদের প্রস্তুতির জন্যও সহায়ক হতে পারে। রইল সত্তর জন মুসলমানের শাহাদাতের বিষয়। প্রকৃতপক্ষে এটাও একটা বিপুল গৌরবের বিষয়। এতে ঘাবড়ানো উচিত নয়। এসব ধারণার প্রেক্ষিতে সিদ্দীকে আকবার (রাযিঃ) ও অন্যান্য অধিকাংশ সাহাবায়ে কেরাম এ মতই প্রদান করলেন যে, বন্দীগণকে মুক্তিপণ নিয়ে মুক্ত করে দেয়া হোক। শুধুমাত্র হযরত উমর ইবনে খাত্তাব (রাযিঃ) ও হযরত সাদ ইবনে মুআয (রাযিঃ) প্রমুখ কয়েকজন এ মতের বিরোধিতা করলেন এবং বন্দীদের সবাইকে হত্যা করার পক্ষে মত দান করলেন। তাদের যুক্তি ছিল এই যে, একান্ত সৌভাগ্যক্রমে ইসলামের মোকাবেলায় শক্তি ও সামর্থ্যের বলে যোগদানকারী সমস্ত কুরাইশ সর্দার এখন মুসলমানদের হস্তগত হলেও পরে তাদের ইসলাম গ্রহণ করার বিষয়টি একান্তই কল্পনা নির্ভর। কিন্তু ফিরে গিয়ে এরা যে মুসলমানদের বিরুদ্ধে অধিকতর তৎপরতা প্রদর্শন করবে সে ধারণাই প্রবল।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যিনি রাহমাতুললিল আলামীন হয়ে আগমন করেছিলেন এবং আপাদমস্তক করুণার আধার ছিলেন, তিনি সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে দুটি মত লক্ষ্য করে সে মতটিই গ্রহণ করে নিলেন, যাতে বন্দীদের ব্যাপারে রহমত ও করুণা প্রকাশ পাচ্ছিল এবং বন্দীদের জন্যও ছিল সহজ। অর্থাৎ মুক্তিপণের বিনিময়ে তাদেরকে মুক্ত করে দেয়া। তিনি সিদ্দীকে আকবর ও ফারূকে আযম (রাযিঃ)কে উদ্দেশ্য করে বললেন لَوِ اتَّفَقْتُمَا مَا خَالَفْتُكُمَا অর্থাৎ তোমরা উভয়ে যদি কোন বিষয়ে একমত হয়ে যেতে, তবে আমি তোমাদের বিরোধিতা করতাম না। (মাযহারী)

তাঁদের মত-বিরোধের ক্ষেত্রে বন্দীদের প্রতি সহজতা প্রদর্শন করাই ছিল সৃষ্টির প্রতি তাঁর দয়া ও করুণার চাহিদা। অতএব তাই হল। আর তারই

পরিণতিতে পরবর্তী বছর খোদায়ী বাণী মোতাবেক সত্তর জন মুসলমানের শাহাদাতের ঘটনা সংঘটিত হল।

تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا আয়াতে সে সমস্ত সাহাবাকে সম্বোধন করা হয়েছে, যারা মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দীদের ছেড়ে দেয়ার পক্ষে মত দিয়েছিলেন। এতে বলা হয়েছে যে, তোমরা আমার রাসূলকে অসঙ্গত পরামর্শ দান করছো। কারণ শত্রুদেরকে বশে পাওয়ার পরেও তাদের শক্তি ও দম্ভকে চূর্ণ করে না দিয়ে অনিষ্ঠকর শত্রুকে ছেড়ে দিয়ে মুসলমানদের জন্য স্থায়ী বিপদ দাঁড় করিয়ে দেয়া কোন নবীর পক্ষেই শোভন নয়।

এ আয়াতে حَتّٰى يُثْخِنَ فِى الْاَرْضِ বাক্য ব্যবহৃত হয়েছে اِثْخَانٌ এর আভিধানিক অর্থ হচ্ছে কারও শক্তি ও দম্ভকে ভেঙ্গে দিতে গিয়ে কঠোরতম ব্যবস্থা নেয়া। এ অর্থের তাকীদ বোঝাবার জন্য فِى الْاَرْضِ বাক্যের প্রয়োগ। এর সারার্থ হল এই যে, শত্রুর দম্ভকে ধুলিস্মাৎ করে দিন।

যেসব সাহাবী মুক্তিপণ নিয়ে বন্দীদের ছেড়ে দেয়ার পক্ষে মত দিয়েছিলেন, তাঁদের সে মতে যদিও নির্ভেজাল একটি দ্বীনী প্রেরণাও বিদ্যমান ছিল– অর্থাৎ মুক্তি পাবার পর তাদের মুসলমান হয়ে যাবার আশা, কিন্তু সেই সাথে আত্মস্বার্থজনিত অপর একটি দিকও ছিল যে, এতে করে তাদের হাতে কিছু অর্থ-সম্পদ এসে যাবে। অথচ তখনও পর্যন্ত কোন সরাসরি 'নছ' বা খোদায়ী বাণীর মাধ্যমে সে সমস্ত মালামালের বৈধতা প্রমাণিত ছিল না। কাজেই মানুষের যে সমাজটিকে রাসূলে কারীম (সাঃ)-এর তত্ত্বাবধানে এমন মানদণ্ডের গঠন করা হচ্ছিল, যাতে তাদের মর্যাদা ফেরেশতাদের চেয়েও বেশী হবে, তাদের পক্ষে গনীমতের সে মাল-সামান বা দ্রব্য-সামগ্রীর আগ্রহকেও এক রকম পাপ বলে গণ্য করা হয়। তাছাড়া যে কাজে বৈধা-বৈধের সমন্বয় থাকে, তার সমষ্টিকে অবৈধ বলেই বিবেচনা করা হয়। সে জন্যই সাহাবায়ে কেরামের সে কাজটিকে ভর্ৎসনাযোগ্য সাব্যস্ত করে বলা হয়েছেঃ

تُرِيْدُوْنَ عَرَضَ الدُّنْيَا وَاللّٰهُ يُرِيْدُ الْاٰخِرَةَ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ

অর্থাৎ তোমরা দুনিয়া কামনা করছ অথচ তোমাদের কাছ থেকে আল্লাহ চান, তোমরা যেন আখেরাত কামনা কর। এখানে ভর্ৎসনা হিসাবে শুধুমাত্র

তাদের সে কাজের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে যা ছিল অসন্তুষ্টির কারণ। বন্দীদের মুসলমান হওয়ার আশা সংক্রান্ত দ্বিতীয় কারণটির কথা এখানে উল্লেখ করা হয়নি। এতে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, সাহাবায়ে কেরামের মত নিঃস্বার্থ, পবিত্রাত্মা দলের পক্ষে এমন দ্ব্যর্থবোধক নিয়ত করা, যাতে কিছু পার্থিব স্বার্থও নিহিত থাকবে গ্রহণযোগ্য নয়। এখানে এ বিষয়টিও লক্ষণীয় যে, এ আয়াতে ভর্ৎসনা ও সতর্কীকরণের লক্ষ্যস্থল হলেন সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ)। যদিও রাসূলে কারীম (সাঃ) নিজেও তাঁদের মতামত সমর্থন করে তাদের সাথে আংশিকভাবে যুক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর সে কাজটি ছিল একান্তভাবেই তাঁর রাহমাতুললিল আলামীন বৈশিষ্ট্যের বহিঃপ্রকাশ। সে কারণেই তিনি মতানৈক্যের ক্ষেত্রে সে দিকটিই গ্রহণ করে নিয়েছিলেন, যা বন্দীদের পক্ষে সহজ ও দয়াভিত্তিক।

আয়াতের শেষাংশে وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ বলে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, আল্লাহ তাআলা মহাপরাক্রমশালী, হেকমতওয়ালা; আপনারা যদি তাড়াহুড়া না করতেন, তবে তিনি স্বীয় অনুগ্রহে পরবর্তী বিষয়ে আপনাদের জন্য ধন-সম্পদের ব্যবস্থাও করে দিতেন।

মাসআলাঃ উল্লেখিত আয়াতে মুক্তিপণের বিনিময়ে বন্দীদের মুক্তি দান ও গনীমতে মালামাল সংগ্রহের কারণে ভর্ৎসনা নাযিল হয়েছে এবং আল্লাহর আযাবের প্রতি ভীতি প্রদর্শন করা হয়েছে এবং পরে তা ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। কিন্তু এতে ভবিষ্যতে এ সমস্ত ব্যাপারে মুসলমানদিগকে কোন পন্থা অবলম্বন করতে হবে, তা পরিস্কারভাবে বোঝা যায় না। সে কারণেই পরবর্তী আয়াতে গনীমতের মালামাল সংক্রান্ত মাসআলাটি পরিস্কার করে দেয়া হয়েছে। বলা হয়েছে– فَكُلُوْا مِمَّا غَنِمْتُمْ অর্থাৎ গনীমতের যে সব মালামাল তোমাদের হস্তগত হবে, এখন থেকে সেগুলো তোমরা খেতে পারবে এবং ভবিষ্যতের জন্যও তা ফরজ করে দেয়া হল। কিন্তু তারপরেও এতে একটি সন্দেহের অবকাশ থেকে যায় যে, গনীমতের মাল হালাল হওয়ার নির্দেশটি তো এখন হলো কিন্তু ইতিপূর্বে যেসব মালামাল সংগ্রহ করে নেয়া হয়েছিল হয়তো সেগুলোতে কোন রকম কারাহাত বা দোষ থাকতে পারে। সেজন্যই এরপর حَلٰلًا طَيِّبًا বলে সে সন্দেহের অপনোদন করা হয়েছে যে, যদিও বৈধতার হুকুম নাযিল হওয়ার প্রাক্কালে গনীমতের মাল

সংগ্রহের পদক্ষেপ নেয়া জায়েয ছিল না, কিন্তু এখন যখন গনীমতের মালের বৈধতা সংক্রান্ত হুকুম এসে গেছে, তখন সংগৃহীত মালামালও নির্দোষভাবেই হালাল।

মাসআলাঃ এখানে উসূলে ফিকহের একটি বিষয় লক্ষণীয় ও প্রণিধানযোগ্য। তা হল এই যে, যখন কোন অবৈধ পদক্ষেপের পর স্বতন্ত্র কোন আয়াতের মাধ্যমে সে বিষয়টিকে হালাল করার নির্দেশ অবতীর্ণ হয়, তখন তাতে পূর্ববর্তী পদক্ষেপের কোনই প্রভাব থাকে না; সে মালামাল যথার্থভাবেই পবিত্র ও হালাল হয়ে যায়।

(খ) উহুদ যুদ্ধ

وَاِذْ غَدَوْتَ مِنْ اَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِيْنَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ - وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (١٢١) اِذْ هَمَّتْ طَّائِفَتٰنِ مِنْكُمْ اَنْ تَفْشَلَا لا وَاللّٰهُ وَلِيُّهُمَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ (١٢٢) وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ بِبَدْرٍ وَّاَنْتُمْ اَذِلَّةٌ ج فَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُوْنَ (١٢٣) اِذْ تَقُوْلُ لِلْمُؤْمِنِيْنَ اَلَنْ يَّكْفِيَكُمْ اَنْ يُّمِدَّكُمْ رَبُّكُمْ بِثَلٰثَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُنْزَلِيْنَ (١٢٤) بَلٰٓى لا اِنْ تَصْبِرُوْا وَتَتَّقُوْا وَيَاْتُوْكُمْ مِّنْ فَوْرِهِمْ هٰذَا يُمْدِدْكُمْ رَبُّكُمْ بِخَمْسَةِ اٰلٰفٍ مِّنَ الْمَلٰٓئِكَةِ مُسَوِّمِيْنَ (١٢٥) وَمَا جَعَلَهُ اللّٰهُ اِلَّا بُشْرٰى لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوْبُكُمْ بِهٖ ط وَمَا النَّصْرُ اِلَّا مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ الْعَزِيْزِ الْحَكِيْمِ (١٢٦) لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اَوْ يَكْبِتَهُمْ فَيَنْقَلِبُوْا خَائِبِيْنَ (١٢٧) لَيْسَ لَكَ مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ اَوْ يُعَذِّبَهُمْ فَاِنَّهُمْ ظٰلِمُوْنَ (١٢٨) (ال عمران ١٢١ - ١٢٨)

তরজমাঃ (১২১) আর আপনি যখন পরিজনদের কাছ থেকে সকাল বেলা বেরিয়ে গিয়ে মুমিনগণকে যুদ্ধের অবস্থানে বিন্যস্ত করলেন, আর আল্লাহ সব বিষয়েই শুনেন এবং জানেন। (১২২) যখন তোমাদের দুটি দল সাহস হারাবার উপক্রম করলো, অথচ আল্লাহ তাদের সাহায্যকারী ছিলেন, আর

আল্লাহর উপরই ভরসা করা মুমিনদের উচিত। (১২৩) বস্তুতঃ আল্লাহ বদরের যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছেন, অথচ তোমরা ছিলে দুর্বল। কাজেই আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পার। (১২৪) আপনি যখন বলতে লাগলেন মুমিনগণকে তোমাদের জন্য কি যথেষ্ট নয় যে, তোমাদের সাহায্যার্থে তোমাদের পালনকর্তা আসমান থেকে অবতীর্ণ তিন হাজার ফেরেশতা পাঠাবেন। (১২৫) অবশ্য তোমরা যদি সবর কর এবং বিরত থাক আর তারা যদি তখনই তোমাদের উপর চড়াও হয়, তাহলে তোমাদের পালনকর্তা চিহ্নিত ঘোড়ার উপর পাঁচ হাজার ফেরেশতা তোমাদের সাহায্যে পাঠাতে পারেন। (১২৬) বস্তুতঃ এটা তো আল্লাহ তোমাদের সুসংবাদ দান করলেন, যাতে তোমাদের মনে এতে সান্ত্বনা আসতে পারে। আর সাহায্য শুধুমাত্র পরাক্রান্ত, মহাজ্ঞানী আল্লাহরই পক্ষ থেকে। (১২৭) যাতে ধ্বংস করে দেন কোন কোন কাফেরকে অথবা লাঞ্ছিত করে দেন– যেন ওরা বঞ্চিত হয়ে ফিরে যায়। (১২৪) হয় আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন কিংবা তাদেরকে আযাব দেবেন। এ ব্যাপারে আপনার কোন করণীয় নেই। কারণ তারা রয়েছে অন্যায়ের উপর।

(আল-ইমরানঃ ১২১–১২৮)

উহুদ যুদ্ধের পটভূমি

তাফসীরঃ আলোচ্য আয়াতের তাফসীরের পূর্বে উহুদ যুদ্ধের পটভূমি হৃদয়ঙ্গম করে নেয়া প্রয়োজন।

দ্বিতীয় হিজরীতে রামাযান মাসে বদর নামক স্থানে কুরাইশ বাহিনী ও মুসলিম মুহাহিদগণের মধ্যে সংঘটিত যুদ্ধে কুরাইশদের সত্তর জন খ্যাতনামা ব্যক্তি নিহত হয় এবং সমপরিমাণই মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়। এ মারাত্মক অবমাননাকর পরাজয়টি ছিল প্রকৃতপক্ষে খোদায়ী আযাবের প্রথম কিস্তি। এতে কুরাইশদের প্রতিশোধ স্পৃহা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠে। নিহত সরদারদের আত্মীয়-স্বজনরা সমগ্র আরবকে ক্ষেপিয়ে তোলে। তারা প্রতিজ্ঞা করে, আমরা যতদিন এ পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ না করব, ততদিন স্বস্তির নিশ্বাস নেব না। তারা মক্কাবাসীদের কাছে আবেদন জানালো, তাদের বাণিজ্যিক কাফেলা সিরিয়া থেকে যে অর্থ-সম্পদ নিয়ে এসেছে। তা সবই যেন এ অভিযানে ব্যয় করা হয়– যাতে মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

ও তাঁর সঙ্গীদের কাছ থেকে নিহত ব্যক্তিদের প্রতিশোধ গ্রহণ করা যেতে পারে। এ আবেদনে সবাই যোগও দিল। সেমতে তৃতীয় হিজরীতে কুরাইশদের সাথে অন্যান্য কয়েকটি গোত্রও মদীনা আক্রমণের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লো। এমনকি স্ত্রীলোকেরাও পুরুষদের সাথে যোগদান করল– যাতে প্রয়োজনবোধে পুরুষদের উৎসাহিত করে পশ্চাদপসারণে বাধা দিতে পারে। তিন হাজার যোদ্ধার বিরাট বাহিনী অস্ত্রে-শস্ত্রে সুসজ্জিত হয়ে যখন মদীনা থেকে তিন চার মাইল দূরে উহুদ পাহাড়ের সন্নিকটে শিবির স্থাপন করলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীগণের সাথে পরামর্শ করলেন। তাঁর ব্যক্তিগত মত ছিল মদীনার ভিতরে থেকেই সহজে ও সাফল্যের সাথে শত্রু শক্তিকে প্রতিহত করা। তখন মুনাফিক সরদার আবদুল্লাহ ইবনে উবাই বাহ্যতঃ মুসলমানদের অন্তর্ভুক্ত। এ ব্যাপারে প্রথম বারের মত তার কাছেও পরামর্শ চাওয়া হলো। তার অভিমতও হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অভিমতের অনুরূপ ছিল। কিন্তু কিছু সংখ্যক উৎসাহী তরুণ সাহাবী যাঁরা বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে পারেনি এবং শাহাদতের আগ্রহে পাগলপারা ছিলেন, জেদ ধরলেন যে, শহরের বাইরে গিয়েই শত্রু-সৈন্যের মোকাবেলা করা উচিত। নতুবা শত্রুরা আমাদের দুর্বল ও কাপুরুষ বলে মনে করতে পারে। সংখ্যাগরিষ্ঠের অভিমতে এ প্রস্তাবটিই গৃহীত হলো।

ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম গৃহের অভ্যন্তরে চলে গেলেন এবং লৌহ বর্ম পরিধান করে বের হয়ে এলেন। এতে কেউ কেউ মনে করলেন যে, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে মদীনার বাইরে গিয়ে যুদ্ধ করতে বাধ্য করেছি। এটা ঠিক হয়নি। তাঁরা নিবেদন করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার ইচ্ছা না হলে এখানেই অবস্থান করুন। তিনি বললেন, একবার লৌহবর্ম পরিধান করে এবং অস্ত্র ধারন করার পর যুদ্ধ ব্যতিরেকেই তা আবার খুলে ফেলা পয়গম্বরের জন্য শোভনীয় নয়। এ বাক্যে পয়গাম্বর ও সাধারণ মানুষের পার্থক্য ফুটে উঠেছে। অর্থাৎ পয়গম্বর কখনও দুর্বলতা প্রকাশ করতে পারেন না। এতে উম্মতের জন্যেও বিরাট শিক্ষা রয়েছে। মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন মদীনা থেকে বের হলেন, তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন প্রায় এক

হাজার সাহাবী। আবদুল্লাহ ইবনে উবাই প্রায় তিনশত লোকের একটিদল নিয়ে রাস্তা থেকে এই বলে ফিরে গেল যে, অন্যদের পরামর্শমত যখন কাজ করা হয়েছে। তখন আমাদের যুদ্ধের প্রয়োজন নেই। আমরা অনর্থক নিজেদের ধ্বংসের মুখে নিক্ষেপ করতে চাই না। তার সঙ্গীদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল মুনাফিক। তবে কিছুসংখ্যক মুসলমানও তাদের প্রতারণায় পড়ে তাদের সঙ্গে ফিরে গেল। অবশেষে হুযূরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সর্বমোট সাতশত সৈন্য নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে পৌঁছলেন। তিনি স্বয়ং সামরিক কায়দায় এমনভাবে সৈন্য সমাবেশ করলেন, যাতে উহুদ পাহাড়টি থাকলো পিছনের দিকে। তিনি হযরত মুসআব ইবনে উমায়েরের হাতে পতাকা দান করলেন। হযরত যুবায়ের ইবনে আওয়ামকে সেনাধ্যক্ষ নিযুক্ত করলেন। হযরত হামযার হাতে বর্মহীন সৈন্যদের পরিচালনা ভার অর্পণ করলেন। পশ্চাৎদিক থেকে আক্রমণের ভয় থাকায় পঞ্চাশ জন তীরান্দাজের একটি বাহিনীকে সেদিকে নিযুক্ত করলেন এবং তাদেরকে নির্দেশ দিলেন যে, তারা যেন পশ্চাৎদিকে টিলার উপর থেকে হেফাজতের দায়িত্ব পালন করেন। সৈন্যদের জয়-পরাজয়ের সাথে তাদের কোন সম্পর্ক থাকবে না এবং কোন অবস্থাতেই তারা স্থানচ্যুত হবে না। আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের এ তীরান্দাজ বাহিনীর অধিনায়ক নিযুক্ত হলেন। কুরাইশরা বদর যুদ্ধে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল। তাই তারাও শ্রেণীবদ্ধভাবে সৈন্য সমাবেশ করলো।

বিজাতীর দৃষ্টিতে মহানবী (সাঃ)-এর সামরিক প্রজ্ঞা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেরূপ সামরিক কায়দায় সৈন্যদের সুশৃঙ্খলভাবে সারিবদ্ধ করেন। তা দেখে স্পষ্টতঃই মনে হয় যে, একজন কামেল পথ প্রদর্শক ও পুতঃপবিত্র পয়গাম্বর হওয়ার সাথে সাথে নিপুণ সেনাধ্যক্ষ হিসেবেও তাঁর তুলনা নেই। তিনি যেভাবে ব্যূহ রচনা করে সৈন্য সংস্থাপন করেছিলেন, তখনকার জগৎ সে সম্পর্কে মোটেই জ্ঞাত ছিল না। বর্তমান যুগে সমর বিদ্যা একটা স্বতন্ত্র বিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে। এ যুগের সমর-কুশলীরাও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদর্শিত রণ-নৈপুণ্যকে প্রশংসার চোখে দেখে থাকে। জনৈক খ্রীস্টান ঐতিহাসিকের ভাষায়– একথা মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করা উচিত যে, অপরিসীম সাহস ও বীরত্বের অধিকারী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শত্রু পক্ষের

মোকাবেলায় সমর বিদ্যার ক্ষেত্রেও নতুন পথ আবিষ্কার করেছেন। তিনি মক্কাবাসীদের বিশৃঙ্খল ও এলোপাতাড়ি যুদ্ধের মোকাবেলায় চমৎকার দূরদর্শিতা ও কঠোর নিয়ম-শৃঙ্খলার সাথে যুদ্ধ পরিচালনা করেন। এ কথাটি বিংশ শতাব্দীর ইতিহাসবিদ টম এ্যাণ্ডারসনের 'লাইফ অফ মোহাম্মদ' গ্রন্থ দ্রষ্টব্য।

উহুদ যুদ্ধের সূচনা

অতঃপর যুদ্ধ আরম্ভ হলো। প্রথম দিকে মুসলমানদের পাল্লাই ভারী ছিল। শত্রু-সৈন্য ইতস্ততঃ পলায়ন করতে লাগলো। বিজয় সমাপ্ত হয়েছে মনে করে মুসলমান সৈন্যরা গনীমতের মালামাল সংগ্রহে প্রবৃত্ত হলেন। শত্রুদের পলায়ন করতে দেখে উহুদ পাহাড়ের পেছন দিকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নিযুক্ত তীরান্দাজ সৈন্যরাও স্থান ত্যাগ করে পাহাড়ের পাদদেশের দিকে আসতে লাগলেন। অধিনায়ক আবদুল্লাহ্ ইবনে জুবায়ের রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কঠোর নির্দেশ স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাদের স্থান ত্যাগ করতে বারণ করলেন। কিন্তু কয়েকজন ছাড়া সবাই বলল, হুযূরের নির্দেশটি ছিল সাময়িক। এখন আমাদের সবার সাথে মিলিত হওয়া উচিত। এ সুযোগে কাফের বাহিনীর অধিনায়ক খালেদ ইবনে ওলীদ (যিনি তখনও মুসলমান হননি) পাহাড়ের পিছন দিক থেকে ঘুরে এসে গিরিপথে আক্রমণ করে বসলেন। আবদুল্লাহ্ ইবনে জুবায়ের অল্প কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে এ আক্রমণ প্রতিহত করতে চাইলেন। কিন্তু ব্যর্থ হলেন। খালেদের সৈন্য বাহিনী ঝড়ের বেগে হঠাৎ মুসলমানদের উপর পতিত হলো। অপরদিকে পলায়নপর শত্রু-সৈন্যও ফিরে এসে মুসলিম বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। এভাবে যুদ্ধের গতি সম্পূর্ণ পাল্টে গেল। এ আকস্মিক বিপদে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে মুসলিম বাহিনীর একটি বৃহৎ অংশ যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করল। এতদসত্ত্বেও কিছু সংখ্যক সাহাবী অমিত তেজে যুদ্ধ করে যাচ্ছিলেন। ইতিমধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে, রাসূলূল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শাহাদত বরণ করেছেন। এ সংবাদে মুসলমানদের অবশিষ্ট চেতনাও বিলুপ্ত হওয়ার উপক্রম হলো এবং তাঁরা সাহস হারিয়ে ফেললেন। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চারপাশে তখন মাত্র দশ বারজন জীবন উৎসর্গকারী সাহাবী বিদ্যমান। হুযূর স্বয়ং আহত। পরাজয় পর্ব সম্পন্ন

হওয়ার তেমন কিছুই আর বাকী ছিল না। এমনই সময় সাহাবীগণ জানতে পারেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জীবিতই রয়েছেন। তখন তাঁরা চতুর্দিক থেকে এসে তাঁর চারপাশে সমবেত হলেন এবং তাঁরা নির্বিঘ্নে পাহাড়ের দিকে গেলেন। কিন্তু এ পরাজয়ের দরুণ মুসলমানরা অত্যন্ত পেরেশান হয়ে পড়লেন। মুসলমানদের এ সাময়িক পরাজয় ছিল কয়েকটি কারণের প্রতিশ্রুতি। কুরআন পাক প্রত্যেকটি কারণ সম্পর্কে একান্ত মাপা শব্দে পর্যালোচনা করেছে এবং ভবিষ্যতের জন্যে সতর্ক থাকতে আদেশ দিয়েছে। এ যুদ্ধের বিশ্লেষণে অনেক অসাধারণ শিক্ষাপ্রদ ঘটনা রয়েছে– যা মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত মূল্যবান।

(মাআরেফুল কুরআন ২/১৭৩–১৭৬)

ইরশাদ হয়েছে–

وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللّٰهُ وَعْدَهٗ اِذْ تَحُسُّوْنَهُمْ بِاِذْنِهٖ حَتّٰى اِذَا فَشِلْتُمْ
وَتَنَازَعْتُمْ فِى الْاَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِّنْۢ بَعْدِ مَا اَرٰىكُمْ مَّا تُحِبُّوْنَ ط مِنْكُمْ
مَنْ يُّرِيْدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَّنْ يُّرِيْدُ الْاٰخِرَةَ ج ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ
لِيَبْتَلِيَكُمْ ج وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ ط وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ
(١٥٢) اِذْ تُصْعِدُوْنَ وَلَا تَلْوٗنَ عَلٰۤى اَحَدٍ وَّالرَّسُوْلُ يَدْعُوْكُمْ فِيْۤ اُخْرٰىكُمْ
فَاَثَابَكُمْ غَمًّاۢ بِغَمٍّ لِّكَيْلَا تَحْزَنُوْا عَلٰى مَا فَاتَكُمْ وَلَا مَاۤ اَصَابَكُمْ ط
وَاللّٰهُ خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ (١٥٣) ثُمَّ اَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِّنْۢ بَعْدِ الْغَمِّ اَمَنَةً
نُّعَاسًا يَّغْشٰى طَاۤئِفَةً مِّنْكُمْ ۔ وَطَاۤئِفَةٌ قَدْ اَهَمَّتْهُمْ اَنْفُسُهُمْ يَظُنُّوْنَ
بِاللّٰهِ غَيْرَ الْحَقِّ ظَنَّ الْجَاهِلِيَّةِ ط يَقُوْلُوْنَ هَلْ لَّنَا مِنَ الْاَمْرِ مِنْ
شَيْءٍ ط قُلْ اِنَّ الْاَمْرَ كُلَّهٗ لِلّٰهِ يُخْفُوْنَ فِيْۤ اَنْفُسِهِمْ مَّا لَا يُبْدُوْنَ لَكَ ط
يَقُوْلُوْنَ لَوْ كَانَ لَنَا مِنَ الْاَمْرِ شَيْءٌ مَّا قُتِلْنَا هٰهُنَا ط قُلْ لَّوْ كُنْتُمْ
فِيْ بُيُوْتِكُمْ لَبَرَزَ الَّذِيْنَ كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقَتْلُ اِلٰى مَضَاجِعِهِمْ ج

وَلِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا فِىْ صُدُوْرِكُمْ وَلِيُمَحِّصَ مَافِىْ قُلُوْبِكُمْ ط وَاللّٰهُ
عَلِيْمٌۢ بِذَاتِ الصُّدُوْرِ (١٥٤) اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَلَّوْا مِنْكُمْ يَوْمَ الْتَقَى
الْجَمْعٰنِ اِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ بِبَعْضِ مَاكَسَبُوْا ج وَلَقَدْ عَفَا اللّٰهُ
عَنْهُمْ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ حَلِيْمٌ (١٥٥) يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَكُوْنُوْا
كَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَقَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ اِذَا ضَرَبُوْا فِى الْاَرْضِ اَوْ كَانُوْا غُزًّى
لَّوْ كَانُوْا عِنْدَنَا مَامَاتُوْا وَمَا قُتِلُوْا لِيَجْعَلَ اللّٰهُ ذٰلِكَ حَسْرَةً فِىْ
قُلُوْبِهِمْ ط وَاللّٰهُ يُحْيِىْ وَيُمِيْتُ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ (١٥٦)
وَلَئِنْ قُتِلْتُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللّٰهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ
مِّمَّا يَجْمَعُوْنَ (١٥٧) وَلَئِنْ مُّتُّمْ اَوْ قُتِلْتُمْ لَاِلَى اللّٰهِ تُحْشَرُوْنَ
(١٥٨) فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ لِنْتَ لَهُمْ ج وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ
لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ ص فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِى الْاَمْرِ
ج فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِيْنَ (١٥٩)
اِنْ يَّنْصُرْكُمُ اللّٰهُ فَلَا غَالِبَ لَكُمْ ج وَاِنْ يَّخْذُلْكُمْ فَمَنْ ذَا الَّذِىْ
يَنْصُرُكُمْ مِّنْۢ بَعْدِهٖ ط وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ (١٦٠) وَمَا
كَانَ لِنَبِىٍّ اَنْ يَّغُلَّ ط وَمَنْ يَّغْلُلْ يَاْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ ط ثُمَّ تُوَفّٰى
كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَايُظْلَمُوْنَ (١٦١) اَفَمَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَ اللّٰهِ
كَمَنْۢ بَاۤءَ بِسَخَطٍ مِّنَ اللّٰهِ وَمَاْوٰهُ جَهَنَّمُ ط وَبِئْسَ الْمَصِيْرُ (١٦٢) هُمْ
دَرَجٰتٌ عِنْدَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ بَصِيْرٌۢ بِمَا يَعْمَلُوْنَ (١٦٣) لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ
عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ بَعَثَ فِيْهِمْ رَسُوْلًا مِّنْ اَنْفُسِهِمْ يَتْلُوْا عَلَيْهِمْ
اٰيٰتِهٖ وَيُزَكِّيْهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَاِنْ كَانُوْا مِنْ قَبْلُ لَفِىْ

ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ (١٦٤) اَوَلَمَّآ اَصَابَتْكُمْ مُّصِيْبَةٌ قَدْ اَصَبْتُمْ مِّثْلَيْهَا قُلْتُمْ اَنّٰى هٰذَا ط قُلْ هُوَ مِنْ عِنْدِ اَنْفُسِكُمْ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (١٦٥) وَمَآ اَصَابَكُمْ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعٰنِ فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِيْنَ (١٦٦) وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ نَافَقُوْا صلے وَقِيْلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَوِ ادْفَعُوْا ط قَالُوْا لَوْ نَعْلَمُ قِتَالًا لَّا اتَّبَعْنٰكُمْ ط هُمْ لِلْكُفْرِ يَوْمَئِذٍ اَقْرَبُ مِنْهُمْ لِلْاِيْمَانِ ج يَقُوْلُوْنَ بِاَفْوَاهِهِمْ مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ ط وَاللّٰهُ اَعْلَمُ بِمَا يَكْتُمُوْنَ (١٦٧) اَلَّذِيْنَ قَالُوْا لِاِخْوَانِهِمْ وَقَعَدُوْا لَوْ اَطَاعُوْنَا مَاقُتِلُوْا ط قُلْ فَادْرَءُوْا عَنْ اَنْفُسِكُمُ الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِيْنَ (١٦٨) وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتًا ط بَلْ اَحْيَآءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُوْنَ (١٦٩) فَرِحِيْنَ بِمَآ اٰتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ ۔ وَيَسْتَبْشِرُوْنَ بِالَّذِيْنَ لَمْ يَلْحَقُوْا بِهِمْ مِّنْ خَلْفِهِمْ ۔ اَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ (١٧٠) يَسْتَبْشِرُوْنَ بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ ۔ وَّاَنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ (١٧١) (ال عمران: ١٥٢-١٧١)

তরজমাঃ (১৫২) আর আল্লাহ্ সে ওয়াদাকে সত্যে পরিণত করেছেন, যখন তোমরা তাঁরই নির্দেশে ওদের খতম করেছিলে। এমনকি যখন তোমরা ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছ ও কর্তব্য স্থির করার ব্যাপারে বিবাদে লিপ্ত হয়েছ, আর যা তোমরা চাইতে তা দেখার পর কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করেছ, তাতে তোমাদের কারো কাম্য ছিল দুনিয়া আর কারো বা কাম্য ছিল আখেরাত। অতঃপর তোমাদিগকে সরিয়ে দিলেন ওদের উপর থেকে যাতে তোমাদিগকে পরীক্ষা করেন। বস্তুতঃ তিনি তোমাদিগকে ক্ষমা করেছেন। আর আল্লাহ্ মুমিনদের প্রতি অনুগ্রহশীল। (১৫৩) আর তোমরা উপরে উঠে যাচ্ছিলে এবং পিছন দিকে ফিরে তাকাচ্ছিলে না কারো প্রতি, অথচ রাসূল ডাকছিলেন তোমাদিগকে তোমাদের পিছন দিক থেকে। অতঃপর তোমাদের উপর

এলো শোকের উপরে শোক, যাতে তোমরা হাত থেকে বেরিয়ে যাওয়া বস্তুর জন্য দুঃখ না কর এবং যার সম্মুখীন হচ্ছো সেজন্য বিমর্ষ না হও। আর আল্লাহ্ তোমাদের কাজের ব্যাপারে অবহিত রয়েছেন। (১৫৪) অতঃপর তোমাদের উপর শোকের পর শান্তি অবতীর্ণ করলেন, যা ছিল তন্দ্রার মত। সে তন্দ্রায় তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ ঝিমোচ্ছিল আর কেউ কেউ প্রাণের ভয়ে ভাবছিল। আল্লাহ্ সম্পর্কে তাদের মিথ্যা ধারণা হচ্ছিল মুর্খদের মত। তারা বলছিল আমাদের হাতে কি কিছুই করার নেই? তুমি বল, সবকিছুই আল্লাহর হাতে। তারা যা কিছু মনে লুকিয়ে রাখে– তোমার নিকট প্রকাশ করে না সে সবও। তারা বলে আমাদের হাতে যদি কিছু করার থাকত, তাহলে আমরা এখানে নিহত হতাম না। তুমি বল, তোমরা যদি নিজেদের ঘরেও থাকতে, তবে তারা অবশ্যই বেরিয়ে আসত নিজেদের অবস্থান থেকে যাদের মৃত্যু লিখে দেয়া হয়েছে। তোমাদের বুকে যা রয়েছে তার পরীক্ষা করা ছিল আল্লাহর ইচ্ছা। আর তোমাদের অন্তরে যা কিছু রয়েছে তা পরিষ্কার করা ছিল তাঁর কাম্য। আল্লাহ মনের গোপন বিষয় জানেন। (১৫৫) তোমাদের যে দুটি দল লড়াইয়ের দিনে ঘুরে দাঁড়িয়েছিল শয়তান তাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল, তাদেরই পাপের দরুন। অবশ্য আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাপরায়ণ ও পরম সহনশীল। (১৫৬) হে ঈমানদারগণ! তোমরা তাদের মত হয়ো না, যারা কাফের হয়েছে এবং নিজেদের ভাই বন্ধুরা যখন কোন অভিযানে বের হয় কিংবা জিহাদে যায়, তখন তাদের সম্পর্কে বলে, তারা যদি আমাদের সাথে থাকত, তাহলে মরতোও না, নিহতও হতো না। যাতে তারা এ ধারণা সৃষ্টির মাধ্যমে সংশ্লিষ্টদের মনে অনুতাপ সৃষ্টি করতে পারে। অথচ আল্লাহই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দেন। তোমরা যা কিছুই কর না কেন, আল্লাহ সবকিছুই দেখেন। (১৫৭) আর তোমরা যদি আল্লাহর পথে নিহত হও কিংবা মৃত্যুবরণ কর, তারা যা কিছু সংগ্রহ করে থাকে আল্লাহ তাআলার ক্ষমা ও করুণা সে সবকিছুর চেয়ে উত্তম। (১৫৮) আর তোমরা মৃত্যুই বরণ কর অথবা নিহতই হও অবশ্য আল্লাহ তাআলার সামনেই সমবেত হবে। (১৫৯) আল্লাহর রহমতেই আপনি তাদের জন্য কোমল হৃদয় হয়েছেন। পক্ষান্তরে আপনি যদি রূঢ় ও কঠিন– হৃদয় হতেন, তাহলে তারা আপনার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে

যেত। কাজেই আপনি তাদের ক্ষমা করে দিন এবং তাদের জন্য মাগফেরাত কামনা করুন এবং কাজ-কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন। অতঃপর যখন কোন কাজের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে ফেলেন, তখন আল্লাহ্ তাআলার উপর ভরসা করুন– আল্লাহ্ তাওয়াক্কুলকারীদের ভালবাসেন। (১৬০) যদি আল্লাহ্ তোমাদের সহায়তা করেন, তাহলে কেউ তোমাদের উপর পরাক্রান্ত হতে পারবে না। আর যদি তিনি তোমাদের সাহায্য না করেন, তবে এমন কে আছে যে তোমাদের সাহায্য করতে পারে? আর আল্লাহ্র উপরই মুসলমানগণের ভরসা করা উচিত। (১৬১) আর কোন বিষয় গোপন করে রাখা নবীর কাজ নয়। আর যে লোক গোপন করবে সে কিয়ামতের দিন সেই গোপন বস্তু নিয়ে আসবে। অতঃপর পরিপূর্ণভাবে পাবে প্রত্যেকে, যা সে অর্জন করেছে। আর তাদের প্রতি কোন অন্যায় করা হবে না। (১৬২) যে লোক আল্লাহ্র ইচ্ছার অনুগত, সে কি ঐ লোকের সমান হতে পারে, যে আল্লাহর রোষ অর্জন করেছে? বস্তুতঃ তার ঠিকানা হল দোযখ। আর তা কতই না নিকৃষ্ট অবস্থান। (১৬৩) আল্লাহর নিকট মানুষের মর্যাদা বিভিন্ন স্তরের আর আল্লাহ দেখেন যা কিছু তারা করে। (১৬৪) আল্লাহ্ ঈমানদারদের উপর অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকে নবী পাঠিয়েছেন। তিনি তাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ পাঠ করেন। তাদেরকে পরিশোধন করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও কাজের কথা শিক্ষা দেন। বস্তুতঃ তারা ছিল পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট। (১৬৫) যখন তোমাদের উপর একটি মুসীবত এসে পৌঁছল অথচ তোমরা তার পূর্বেই দ্বিগুণ কষ্টে পৌঁছে গিয়েছ, তখন কি তোমরা বলবে, এটা কোথা থেকে এল? তাহলে বলে দাও, এ কষ্ট তোমাদের উপর পৌঁছেছে তোমাদেরই পক্ষ থেকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ প্রত্যেক বিষয়ের উপর ক্ষমতাশীল। (১৬৬) আর যে দিন দু'দল সৈন্যের মোকাবেলা হয়েছে। সে দিন তোমাদের উপর যা আপতিত হয়েছে তা আল্লাহর হুকুমেই হয়েছে এবং তা এ জন্য যে, যাতে ঈমানদারদিগকে জানা যায়। (১৬৭) এবং তাদেরকে যাতে সনাক্ত করা যায় যারা মুনাফিক ছিল। আর তাদেরকে বলা হল, এসো, আল্লাহর রাহে লড়াই কর কিংবা শত্রুদিগকে প্রতিহত কর। তারা বলেছিল আমরা যদি জানতাম যে, লড়াই হবে। তাহলে অবশ্যই তোমাদের সাথে থাকতাম। সে দিন তারা ঈমানের তুলনায় কুফরীর

কাছাকাছি ছিল। যা তাদের অন্তরে নেই তারা নিজের মুখে সে কথাই বলে। বস্তুতঃ আল্লাহ ভালভাবে জানেন তারা যা কিছু গোপন করে থাকে। (১৬৮) ওরা হলো সেসব লোক, যারা বসে থেকে নিজেদের ভাইদের সম্বন্ধে বলে, যদি তারা আমাদের কথা শুনতো, তবে নিহত হতো না। তাদেরকে বলে দিন, এবার তোমাদের নিজেদের উপর থেকে মৃত্যুকে সরিয়ে দাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হয়ে থাক। (১৬৯) আর যারা আল্লাহর রাহে নিহত হয়, তাদেরকে তুমি কখনো মৃত মনে করো না। বরং তারা নিজেদের পালনকর্তার নিকট জীবিত ও জীবিকাপ্রাপ্ত। (১৭০) আল্লাহ নিজের অনুগ্রহ থেকে যা দান করেছেন তার প্রেক্ষিতে তারা আনন্দ উদযাপন করছে। আর যারা এখনও তাদের কাছে এসে পৌঁছেনি তাদের পিছনে তাদের জন্যে আনন্দ প্রকাশ করে। কারণ তাদের কোন ভয়-ভীতিও নেই এবং কোন চিন্তা-ভাবনাও নেই। (১৭১) আল্লাহর নি'আমত ও অনুগ্রহের জন্যে তারা আনন্দ প্রকাশ করে এবং তা এভাবে যে, আল্লাহ ঈমানদারদের শ্রমফল বিনষ্ট করেন না। (আলে ইমরানঃ ১৫২-১৭১)

তাফসীরঃ উল্লেখিত আয়াতসমূহে কিছু সংখ্যক সাহাবীর যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে চলে যাওয়া এবং স্বয়ং হুযূরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক আহবান করার পরও ফিরে না আসা আর সেজন্য হুযূরের দুঃখিত হওয়া এবং সে কারণে শেষ পর্যন্ত সাহাবায়ে কেরামের দুঃখিত হওয়ার বিষয় আলোচিত হয়েছে। হাদীসের বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে যে, হযরত কা'আব ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহুর ডাকে সাহাবীগণ পুণরায় সমবেত হয়েছিলেন। তাফসীরে রূহুল মাআনী প্রণেতা এই ঘটনার বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, প্রথমে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আহবান করেন যা সাহাবায়ে কেরাম শুনতে পাননি এবং তাঁরা বহু দূরে চলে যান। শেষ পর্যন্ত হযরত কা'আব ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহুর ডাক শুনতে পেয়ে সবাই এসে সমবেত হন। তাফসীরে বয়ানুল কুরআনে হযরত হাকীমুল উম্মত বলেন, (সাহাবীগণের যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সরে পড়ার) মূল কারণ ছিল হুযূরে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাহাদতের সংবাদ। পক্ষান্তরে হুযূর যখন ডাকলেন, তখন তাতে একে তো এ দুঃসংবাদের কোন খন্ডন ছিল না। তদুপরি আওয়াজ যদি পৌঁছেও থাকে। তাঁরা তা চিনতে পারেননি। তারপর

যখন হযরত কা'আব ইবনে মালেক রাযিয়াল্লাহু আনহু ডাকেন তখন তাতে সে সংবাদের খণ্ডন এবং সাথে সাথে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বেঁচে থাকার কথাও বলা হয়েছিল। কাজেই একথা শুনে সবাই শান্ত হলেন এবং ফিরে এসে একত্রে সমবেত হলেন। তবে প্রশ্ন থাকে যে, এতে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে ভর্ৎসনা এবং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুঃখিত হলেন কেন? তার কারণ এই হতে পারে যে, সাহাবায়ে কেরাম যদি সে সময়টায় মনের দিক দিয়ে দৃঢ় থাকতেন, তাহলে হুযূরের ডাকের শব্দ চিনতে পারতেন।

উহুদের মহাপরীক্ষার তাৎপর্য

وَلِيَبْتَلِيَ اللّٰهُ مَا فِىْ صُدُوْرِكُمْ

আয়াতের দ্বারা বুঝা গেল যে, উহুদের যুদ্ধে যে বিপদ এসেছিল এবং সাহাবায়ে কেরামের উপর যে মুসীবত এসে পতিত হয়েছিল তা শাস্তি হিসেবে নয়। বরং পরীক্ষা স্বরূপ ছিল। এই পরীক্ষার মাধ্যমে নিষ্ঠাবান মুমিন এবং মুনাফিকদের মাঝে পার্থক্য প্রকাশ করা উদ্দেশ্য ছিল। আর اثابكم غما বাক্যের দ্বারা যে শাস্তির কথা বুঝা যায়, তার ব্যাখ্যা এই যে, এর প্রকৃত রূপটি ছিল শাস্তির মতই। কিন্তু এই শাস্তিটি যে অভিভাবক সুলভ এবং সংশোধনের জন্য ছিল, তা সুস্পষ্ঠ। যে কোন পিতা তার পুত্রকে এবং উস্তাদ তাঁর শাগদেরকে যে যৎসামান্য শাসন করে থাকেন, তাকেও প্রচলিত পরিভাষায় শাস্তি বলেই উল্লেখ করা হয়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে সেটা প্রশিক্ষণ ও সংশোধনেরই একটা রূপ এবং শাসকসুলভ শাস্তি থেকে ভিন্নতর।

উহুদের ঘটনায় মুসলমানদের উপর বিপদ আসার কারণ

উল্লেখিত বাক্য لِيَبْتَلِيَكُمْ (যাতে তোমাদেরকে পরীক্ষা করেন) থেকে আয়াতের শেষ পর্যন্ত যা কিছু বলা হয়েছে তাতে তো একথাই বুঝা যায় যে, এসব বিপদের কারণ ছিল একান্তই আল্লাহর ইচ্ছা, কিন্তু পরবর্তী আয়াতে إِنَّمَا اسْتَزَلَّهُمُ الشَّيْطٰنُ بِبَعْضِ مَا كَسَبُوْا বাক্যের দ্বারা বুঝা যায় যে, সেই সাহাবীগণের পূর্ববর্তী কোন কোন পদস্খলনই এই প্রতিক্রিয়ার কারণ।

এর উত্তর এই যে, বাহ্যিক কারণ অবশ্য সে পদস্খলনই ছিল। যার ভিত্তিতে তাদের দ্বারা আরো কিছু পাপ করিয়ে নেওয়ার জন্য শয়তান প্রলুব্ধ হয় এবং ঘটনাচক্রে তার সে লোভ চরিতার্থও হয়ে যায়। কিন্তু এই পদস্খলন এবং তার পশ্চাদবর্তী ফলাফলের মাঝে নিহিত ছিল এই মৌলিক তাৎপর্য– لِيَبْتَلِيَكُمْ বাক্যে যা বর্ণনা করা হয়েছে। রূহুল মাআনী গ্রন্থে যুজাজ থেকে উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, শয়তান তাঁদেরকে এমন কতিপয় পাপের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়, যেগুলো নিয়ে আল্লাহ তাআলার সামনে উপস্থিত হওয়া সমীচীন মনে হয়নি। সে কারণেই তাঁরা জিহাদ থেকে সরে পড়েন, যাতে নিজেদের অবস্থার সংশোধন করে পছন্দনীয় অবস্থায় জিহাদ করতে পারেন এবং শহীদ হয়ে আল্লাহর সান্নিধ্যে উপস্থিত হতে পারেন।

(মাআরেফুল কুরআন ২/২২৪–২২৬)

(গ) হামরাউল আসাদ যুদ্ধ

ইরশাদ হয়েছে–

اَلَّذِيْنَ اسْتَجَابُوْا لِلّٰهِ وَالرَّسُوْلِ مِنْ بَعْدِ مَآ اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ ط لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا اَجْرٌ عَظِيْمٌ (١٧٢) اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا صلے وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ (١٧٣) فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْٓءٌ وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٍ (١٧٤) اِنَّمَا ذٰلِكُمُ الشَّيْطٰنُ يُخَوِّفُ اَوْلِيَآءَهٗ ص فَلَا تَخَافُوْهُمْ وَخَافُوْنِ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ (١٧٥) (ال عمران ١٧٢-١٧٥)

তরজমাঃ (১৭২) যারা আহত হয়ে পড়ার পরও আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ মান্য করেছে, তাদের মধ্যে যারা সৎ ও পরহেযগার, তাদের জন্য রয়েছে মহান সওয়াব। (১৭৩) যাদেরকে লোকেরা বলেছে যে, তোমাদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য লোকেরা সমাবেশ করেছে বহু সাজ-সরঞ্জাম, তাদের ভয় কর। তখন তাদের বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হয়ে যায় এবং তারা বলে, আমাদের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট; (তিনি) কতইনা চমৎকার কামিয়াবী

দানকারী। (১৭৪) অতঃপর ফিরে এল মুসলমানরা আল্লাহর অনুগ্রহ নিয়ে, তাদের কিছুই অনিষ্ঠ হলো না। তারপর তারা আল্লাহর ইচ্ছার অনুগত হল। বস্তুতঃ আল্লাহর অনুগ্রহ বিরাট। (১৭৫) এরা যে রয়েছে এরাই হল শয়তান, এরা নিজেদের বন্ধুদের ব্যাপারে ভীতি প্রদর্শন করে। সুতরাং তোমরা তাদের ভয় করো না। আর তোমরা যদি ঈমানদার হয়ে থাক, তবে আমাকে ভয় কর। (আলে ইমরান, ১৭২–১৭৫)

হামরাউল আসাদ যুদ্ধের বিবরণ

তাফসীরঃ হামরাউল আসাদ হলো মদীনা থেকে আট মাইল দূরে অবস্থিত একটি জায়গার নাম। মক্কার কাফেররা যখন উহুদের ময়দান থেকে ফিরে এল, তখন পথে এসে তাদের আফসোস হলো যে, আমরা বিজয় অর্জন করার পরিবর্তে অনর্থকই ফিরে এলাম। সবাই মিলে একটা কঠিন আক্রমণ চালিয়ে সমস্ত মুসলমানকে খতম করে দেয়াই উচিত ছিল। আর এই কল্পনা তাদের মনে এমনই প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল যে, পুনরায় মদীনায় ফিরে যেতে ইচ্ছা করতে লাগল। কিন্তু আল্লাহ তাআলা তাদের মনে গভীর ভীতির সঞ্চার করে দিলেন। তাতে তারা সোজা মক্কার পথ ধরল। কিন্তু যেতে যেতে মদীনাগামী কোন কোন পথিকের কাছে বলে দিয়ে গেল যে, তোমরা সেখানে গিয়ে কোন প্রকারে মুসলমানদের মনে আমাদের ভয় বিস্তার করবে যে, তারা আবার এদিকে ফিরে আসছে। এ ব্যাপারটি ওহীর মাধ্যমে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জানতে পারলেন। কাজেই তিনি হামরাউল আসাদ পর্যন্ত তাদের পশ্চাদ্ধাবন করলেন।

(ইবনে জারীর, রূহুল বয়ান)

তাফসীরে কুরতুবীতে বর্ণিত রয়েছে যে, উহুদের দ্বিতীয় দিনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বীয় মুজাহিদদের মাঝে ঘোষণা করলেন যে, আমাদেরকে মুশরিকদের পশ্চাদ্ধাবন করতে হবে। কিন্তু এতে শুধুমাত্র সে সমস্ত লোকই যেতে পারবে, যারা গতকালকের যুদ্ধে আমাদের সাথে ছিল। এ ঘোষণায় দু'শ মুজাহিদীন দাঁড়িয়ে গেলেন। আর সহীহ বুখারীতে উল্লেখ রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষনা করলেন, কে আছে যারা মুশরিকদের পশ্চাদ্ধাবন করবে? তখন সত্তরজন সাহাবী প্রস্তুত

হলেন যাদের মধ্যে এমন লোকও ছিলেন যারা গতকালকের যুদ্ধে কঠিনভাবে আহত হয়ে পড়েছিলেন এবং অন্যের সাহায্যে চলাফেরা করছিলেন। এরাই রাসূলে মাকবুল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে মুশরিকদের পশ্চাদ্ধাবনে রওয়ানা হলেন। যখন তাঁরা হামরাউল আসাদ নামক স্থানে গিয়ে পৌঁছলেন, তখন সেখানে নোআইম ইবনে মাসউদের সাথে সাক্ষাত হল। সে সংবাদ দিল যে, আবু সুফিয়ান নিজের সাথে আরও সৈন্য সংগ্রহ করে পুনরায় মদীনা আক্রমণ এবং মদীনাবাসীদের স্বাগত আক্রমণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। আহত, দুর্বল সাহাবায়ে কেরাম এই ভীতিকর সংবাদ শুনে সমস্বরে বলে উঠলেন, আমরা তা জানি না– حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ অর্থাৎ আল্লাহ আমাদের জন্যে যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম সাহায্যকারী।

এদিকে মুসলমানদেরকে ভীতি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে এ সংবাদ দেয়া হলো। কিন্তু মুসলমানগণ তাতে কোনরূপ প্রভাবান্বিত হলেন না। অপরদিকে বনী খুযাআ গোত্রের মাবাদ ইবনে খুযাআ নামক এক ব্যক্তি মদীনা থেকে মক্কার দিকে যাচ্ছিল। যদিও সে লোকটি মুসলমান ছিল না, কিন্তু মুসলমানদের হিতার্থী ছিল এবং তার গোত্র ছিল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বন্ধুত্বের চুক্তিতে আবদ্ধ। কাজেই রাস্তায় মদীনা প্রত্যাগত আবু সুফিয়ানকে যখন দেখতে পেল যে, সে নিজেদের প্রত্যাগমনের জন্য আক্ষেপ করছে এবং পুনরায় মদীনা আক্রমণের চিন্তা-ভাবনা করছে, তখন সে আবু সুফিয়ানকে বলল, তোমরা ধোকায় পড়ে আছ যে, মুসলমানরা দুর্বল হয়ে পড়েছে। আমি তাদের বিরাট বাহিনীকে হামরাউল আসাদে দেখে এসেছি। যারা কিনা পরিপূর্ণ সাজ-সরঞ্জামে সজ্জিত হয়ে তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন উদ্দেশ্যে বেরিয়েছে। এ সংবাদ আবু সুফিয়ানের মনে ভীতির সঞ্চার করে দিল।

প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, গাযওয়ায়ে উহুদে আহত হওয়া সত্ত্বেও এবং কঠিন কষ্ট ভোগ করা সত্ত্বেও যখন তাদেরকে আরেক জিহাদের জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল আহবান জানালেন, তখন তাঁরা তার জন্যেও তৈরী হয়ে গেলেন। এখানে একটি বিষয় লক্ষ্যণীয় যে, এখানে যেসব মুসলমানের প্রশংসা করা হয়েছে তাদের দুটি বৈশিষ্ট্যের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। তার একটি হল– مِنْۢ بَعْدِ مَآ اَصَابَهُمُ الْقَرْحُ অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের

আহবানে তারাই সাড়া দিয়েছেন, যারা উহুদের যুদ্ধে জখমী হয়েছিলেন। তাঁদের সত্তর জন বীর যোদ্ধা শহীদ হয়েছিলেন। তাঁদের নিজেদের শরীরও আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু যখন তাঁদেরকে অন্য আরেক জিহাদের জন্য আহবান জানানো হল অমনি তৈরী হয়ে গেলেন।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য বর্ণনা প্রসঙ্গে– لِلَّذِيْنَ اَحْسَنُوْا مِنْهُمْ وَاتَّقَوْا আয়াতে বলা হয়েছে যে, এঁরা বাস্তব ও কার্যকর প্রচেষ্টা ও আত্মবিসর্জনের মহান কীর্তি স্থাপনের সাথে সাথে অনুগ্রহ ও পরহেযগারীর বৈশিষ্ট্যের দিক দিয়েও পরাকাষ্ঠাসম্পন্ন ছিলেন। আর এই সমন্বিত বৈশিষ্ট্যই তাঁদের মহা প্রতিদান প্রাপ্তির কারণ। (মাআরেফুল কুরআন ২/২৬২–২৬৪)

ইরশাদ হয়েছে–

وَلَا تَهِنُوْا فِى ابْتِغَاءِ الْقَوْمِ ط اِنْ تَكُوْنُوْا تَاْلَمُوْنَ فَاِنَّهُمْ يَاْلَمُوْنَ كَمَا تَاْلَمُوْنَ ج وَتَرْجُوْنَ مِنَ اللّٰهِ مَالَا يَرْجُوْنَ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا (نساء ١٠٤)

তরজমাঃ তাদের পশ্চাদ্ধাবনে শৈথিল্য করো না, যদি তোমরা আঘাতপ্রাপ্ত তবে তারাও তো তোমাদের মতই হয়েছে আঘাতপ্রাপ্ত এবং তোমরা আল্লাহর কাছে আশা কর, যা তারা আশা করে না। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

(নিসা ১০৪)

তাফসীরঃ যখন কাফেরদের পশ্চাদ্ধাবনের প্রয়োজন হয় তখন সাহস হারিওনা। যখমের কারণে যদি তোমরা কষ্টে থাকো, তারাও কষ্টে জর্জরিত। সুতরাং তারা তোমাদের চেয়ে বেশী শক্তিশালী নয়। কাজেই ভয় কিসের তোমাদের মধ্যে একটি অতিরিক্ত বিষয় এই যে, তোমরা আল্লাহর নিকট সওয়াবের আশা রাখো। অতএব মনের শক্তিতে তোমরা বেশী– আর দৈহিক দুর্বলতায় তোমরা তাদের অনুরূপ। কাজেই তোমাদের কর্মঠ হওয়া উচিত। কাফেররা যে দুর্বলমনা ও দুর্বল দেহ তা আল্লাহ জানেন বিধায় তিনি তোমাদের ক্ষমতার অতিরিক্ত কোন বিষয়ের নির্দেশ দেননি।

(ঘ) হুনাইন যুদ্ধ

قُلْ اِنْ كَانَ اٰبَاؤُكُمْ وَاَبْنَاؤُكُمْ وَاِخْوَانُكُمْ وَاَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيْرَتُكُمْ
وَاَمْوَالُ نِ اقْتَرَفْتُمُوْهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسٰكِنُ تَرْضَوْنَهَا
اَحَبَّ اِلَيْكُمْ مِنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَجِهَادٍ فِيْ سَبِيْلِهٖ فَتَرَبَّصُوْا حَتّٰى يَأْتِيَ
اللّٰهُ بِاَمْرِهٖ ط وَاللّٰهُ لَا يَهْدِى الْقَوْمَ الْفٰسِقِيْنَ (٢٤) لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّٰهُ
فِيْ مَوَاطِنَ كَثِيْرَةٍ وَّيَوْمَ حُنَيْنٍ اِذْ اَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ
عَنْكُمْ شَيْئًا وَّضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ ثُمَّ وَلَّيْتُمْ مُّدْبِرِيْنَ
(٢٥) ثُمَّ اَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَاَنْزَلَ
جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَذٰلِكَ جَزَاۤءُ الْكٰفِرِيْنَ (٢٦) ثُمَّ
يَتُوْبُ اللّٰهُ مِنْ بَعْدِ ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَاۤءُ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (٢٧)
يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنَّمَا الْمُشْرِكُوْنَ نَجَسٌ فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ
الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ هٰذَا وَاِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيْكُمُ اللّٰهُ مِنْ
فَضْلِهٖ اِنْ شَاۤءَ ط اِنَّ اللّٰهَ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ (٢٨) قَاتِلُوا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُوْنَ
بِاللّٰهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَلَا يُحَرِّمُوْنَ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَلَا يَدِيْنُوْنَ
دِيْنَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ حَتّٰى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَّدٍ
وَّهُمْ صٰغِرُوْنَ (٢٩) (التوبة ٢٤-٢٩)

তরজমাঃ (২৪) বল, তোমাদের নিকট যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নী, তোমাদের গোত্র, তোমাদের অর্জিত ধন-সম্পদ, তোমাদের ব্যবসা যা বন্ধ হয়ে যাওয়ার ভয় কর এবং তোমাদের বাসস্থান যাকে তোমরা পছন্দ কর, আল্লাহ তাঁর রাসূল ও তাঁর রাহে জিহাদ করা থেকে অধিক প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা কর। আল্লাহর বিধান আসা পর্যন্ত, আর আল্লাহ ফাসেক সম্প্রদায়কে হেদায়াত করেন না। (২৫) আল্লাহ

তোমাদের সাহায্য করেছেন অনেক ক্ষেত্রে এবং হুনাইনের দিনে, যখন তোমাদের সংখ্যাধিক্য তোমাদের প্রফুল্ল করেছিল। কিন্তু তা তোমাদের কোন কাজে আসেনি এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের জন্যে সংকুচিত হয়েছিল। অতঃপর তোমরা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পলায়ন করেছিলে। (২৬) তারপর আল্লাহ্ নাযিল করেন নিজের পক্ষ থেকে সান্ত্বনা তাঁর রাসূল ও মুমিনদের প্রতি এবং অবতীর্ণ করেন এমন সেনাবাহিনী যাদের তোমরা দেখতে পাওনি। আর শাস্তি প্রদান করেন কাফেরদের এবং এটি হল কাফেরদের কর্মফল। (২৭) এরপর আল্লাহ্ যাদের প্রতি ইচ্ছা তাওবার তাওফীক দেবেন, আর আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (২৮) হে ঈমানদারগণ! মুশরিকরা তো অপবিত্র। সুতরাং এ বছরের পর তারা যেন মসজিদুল হারামের নিকট না আসে। আর যদি তোমরা দারিদ্রের আশংকা কর। তবে আল্লাহ্ চাইলে নিজ করুণায় ভবিষ্যতে তোমাদের অভাবমুক্ত করে দেবেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (২৯) তোমরা যুদ্ধ কর আহলে কিতাবের ঐ লোকদের সাথে, যারা আল্লাহ্ ও রোজ হাশরে ঈমান রাখে না, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যা হারাম করে দিয়েছেন তা হারাম করে না এবং গ্রহণ করে না সত্য ধর্ম, যতক্ষণ না করজোড়ে তাঁরা জিযিয়া প্রদান করে। (তাওবাঃ ২৪-২৯)

তাফসীরঃ উল্লেখিত আয়াতসমূহে হুনাইন যুদ্ধের জয়-পরাজয় এবং এ প্রসঙ্গে অনেকগুলো মৌলিক ও আনুষাঙ্গিক মাসায়েল এবং কিছু দরকারী বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে।

'হুনাইন' মক্কা ও তায়েফের মধ্যবর্তী একটি জায়গার নাম। যা মক্কা শরীফ থেকে প্রায় দশ মাইল দূরত্বে অবস্থিত। অষ্টম হিজরীর রামাযান মাসে যখন মক্কা বিজীত হয় আর মক্কার কুরাইশগণ অস্ত্র সমর্পণ করে, তখন আরবের বিখ্যাত ধনী ও যুদ্ধবাজ হাওয়াজিব গোত্রের- (যার একটি শাখা তায়েফের বনু সাকীফ নামে পরিচিত) মাঝে হৈ চৈ পড়ে যায়। ফলে তারা একত্রিত হয়ে আশংকা প্রকাশ করতে থাকে যে, মক্কা বিজয়ের পর মুসলমানদের বিপুল শক্তি সঞ্চিত হয়েছে। এখন পরবর্তী আক্রমণের শিকার হব আমরা। তাই তাদের আগে আমাদের আক্রমণ পরিচালনা হবে বুদ্ধিমানের কাজ। পরামর্শ মতে এ উদ্দেশ্যে হাওয়াজিন গোত্র মক্কা থেকে

তায়েফ পর্যন্ত বিস্তৃত তার শাখা গোত্রগুলোকে একত্র করে। আর সে গোত্রের মুষ্টিমেয় শ' খানেক লোক ছাড়া বাকী সবাই যুদ্ধের জন্যে সমবেত হয়।

এখানে আন্দোলনের নেতা ছিলেন মালেক বিন আউফ। অবশ্য পরে তিনি মুসলমান হয়ে ইসলামের অন্যতম ঝাণ্ডাবাহী হন। তবে প্রথমে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার তীব্র প্রেরণা ছিল তাঁর মনে। তাই স্বগোত্রের সংখ্যাগুরু অংশ তার সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিতে আরম্ভ করে। কিন্তু এ গোত্রের অপর দুটি ছোট শাখা বনু কাআব ও বনু কেলাব মতানৈক্য প্রকাশ করে। আল্লাহ তাদের কিছু দিব্য দৃষ্টি দান করেছিলেন। এজন্যে তারা বলে 'পূর্ব থেকে পশ্চিম পর্যন্ত সমগ্র দুনিয়াও যদি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে একত্রিত হয়, তথাপি তিনি সকলের উপর জয়ী হবেন। আমরা খোদায়ী শক্তির সাথে যুদ্ধ করতে পারব না।

যাহোক এই দুই গোত্র ছাড়া বাকী সবাই যুদ্ধ তালিকায় অন্তর্ভুক্ত হয়। সেনানায়ক মালেক বিন আউফ পূর্ণ শক্তির সাথে রণাঙ্গনে তাদেরকে সুদৃঢ় রাখার জন্যে এ কৌশল অবলম্বন করেন যে, যুদ্ধক্ষেত্রে সকলের পরিবার-পরিজনও উপস্থিতি থাকবে এবং যার যার সহায়-সম্পত্তিও সাথে রাখবে। উদ্দেশ্য কেউ যেন পরিবার-পরিজন ও সহায়-সম্পদের টানে রণক্ষেত্র ত্যাগ না করে। এ কৌশলের ফলে যেন কারো পক্ষে পলায়নের সুযোগ না থাকে। তাদের সংখ্যা সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের বিভিন্ন মত রয়েছে। হাফেজুল-হাদীস আল্লামা ইবনে হাজর (রহঃ) চব্বিশ বা আটাশ হাজারের সংখ্যাকে সঠিক মনে করেন। আর কেউ বলেন, এদের সংখ্যা চার হাজার ছিল। তবে এও হতে পারে যে, পরিবার-পরিজনসহ ছিল তারা চব্বিশ বা আটাশ হাজার। আর যোদ্ধা ছিল চার হাজার।

মোটকথা এদের দুরভিসন্ধি সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কা শরীফে অবহিত হন এবং তিনিও এদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সংকল্প নেন। মক্কায় হযরত আত্তাব বিন আসাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে আমীর নিয়োগ করেন এবং মাআয বিন জাবাল রাযিয়াল্লাহু আনহুকে লোকদের ইসলামী তালীম দানের জন্য তাঁর সাথে রাখেন। অতঃপর মক্কার কুরাইশদের থেকে অস্ত্র-শস্ত্র ধার স্বরূপ সংগ্রহ করেন। কুরাইশের সরদার

সাফওয়ান বিন উমাইয়াহ্ এতে ক্ষেপে উঠে বলে, আমাদের অস্ত্র-শস্ত্র কি আপনি জোর করে নিয়ে যেতে চান? হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, না, না। বরং ধার স্বরূপ নিচ্ছি। যুদ্ধ শেষে ফিরিয়ে দেব। একথা শুনে সে একশত লৌহবর্ম এবং নওফেল বিন হারিস তিন হাজার বর্শা তার হাতে তুলে দেয়। ইমাম জুহরীর (রহঃ) বর্ণনা মতে চৌদ্দ হাজার মুসলিম সেনা নিয়ে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ যুদ্ধের প্রস্তুতি নেন। এতে ছিলেন মদীনার বার হাজার আনসার যাঁরা মক্কা বিজয়ের জন্য তাঁর সাথে এসেছিলেন। বাকী দু' হাজার ছিলেন আশপাশের অধিবাসী। যারা মক্কা বিজয়ের দিন মুসলমান হয়েছিলেন এবং যাদের 'তোলাকা' বলা হত। ৬ই শাওয়াল শুক্রবার হযরতের নেতৃত্বে মুসলমান সেনা দলের যুদ্ধযাত্রা শুরু হয়। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, ইনশাআল্লাহ আগামীকাল আমাদের অবস্থান হবে খায়কে বনী কিনানার সে স্থানে, যেখানে মক্কার কুরাইশগণ ইতিপূর্বে মুসলমানদের সাথে সামাজিক বয়কটের চুক্তিপত্র সই করেছিল।

চৌদ্দ হাজারের এই বিরাট সেনাদল জিহাদের উদ্দেশ্যে বের হয়ে পড়ে, তাদের সাথে মক্কার অসংখ্য নারী-পুরুষ ও রণদৃশ্য উপভোগের জন্যে বের হয়ে আসে। তাদের সাধারণ মনোভব ছিল। এ যুদ্ধ মুসলিম সেনারা হেরে গেলে আমাদের পক্ষে প্রতিশোধ নেয়ার একটা ভাল সুযোগ হবে। আর তারা জয়ী হলেও আমাদের অবশ্য ক্ষতি নেই।

এ মনোভাব সম্পন্ন লোকদের মধ্যে শায়বা বিন উসমানও ছিলেন। যিনি পরে মুসলমান হয়ে নিজের ইতিবৃত্ত শোনান। তিনি বলেন, বদর যুদ্ধে আমার পিতা হযরত হামযা রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে এবং আমার চাচা হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাতে মারা পড়েন। ফলে অন্তরে প্রতিশোধের যে আগুন জ্বলছিল, তা বর্ণনার বাইরে। আমি এটাকে অপূর্ব সুযোগ মনে করে মুসলমানদের সহযাত্রী হলাম। যেন মওকা পেলেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আক্রমণ করতে পারি। তাই আমি তাঁদের সাথে থেকে সদা সুযোগের সন্ধানে রইলাম। এক সময় যখন পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ শুরু হয় এবং যুদ্ধের সূচনায় দেখা যায় মুসলমানরা হতোদ্যম হয়ে পালাতে শুরু করেছে, আমি এ সুযোগে ত্বড়িত বেগে হযরত সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে পৌঁছি। কিন্তু দেখি যে, ডান দিকে হযরত আব্বাস, বাম দিকে আবু সুফিয়ান বিন হারিস হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হেফাযতে আছেন। এজন্যে পশ্চাৎ দিকে অগ্রসর হয়ে তাঁর কাছে পৌঁছি এবং সংকল্প নেই যে, তরবারীর অতর্কিত আঘাত হেনে তাঁর আয়ু শেষ করব। ঠিক এ সময় আমার প্রতি তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় এবং তিনি আমাকে ডাক দিয়ে বলেন, শায়বা! এদিকে এসো। আমি তাঁর পাশে গেলে তাঁর পবিত্র হাত আমার বক্ষের উপর রাখেন আর দু'আ করেন, হে আল্লাহ! এর থেকে শয়তানকে দূর করে দাও। অতঃপর আমি যখন দৃষ্টি উঠাই, আমার চোখ, কান ও প্রাণ থেকেও হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অধিক প্রিয় মনে হচ্ছিল। তারপর তিনি আদেশ দেন, যাও কাফেরদের সাথে যুদ্ধ কর। আমার তখন এ অবস্থা যে, হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্যে প্রাণ বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত। তাই কাফেরদের সাথে সর্বশক্তি দিয়ে যুদ্ধ করি। যুদ্ধ শেষে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মক্কায় প্রত্যাবর্তন করলে তাঁর খেদমতে হাজির হই। তিনি আমার মনের গোপন দুরভিসন্ধিকে প্রকাশ করে বলেন, মক্কা থেকে মন্দ উদ্দেশ্য নিয়ে চলেছিলে আর আমাকে হত্যার জন্যে আশপাশে ঘুরছিলে। কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা ছিল তোমার দ্বারা সৎ কাজ করানো, পরিশেষে তাই হলো।

এ ধরনের ঘটনা ঘটে নজর বিন হারেসের সাথেও– তিনিও এ উদ্দেশ্যে হুনাইন গিয়েছিলেন। কিন্তু তথায় আল্লাহ তাঁর অন্তরে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভালবাসা প্রবিষ্ঠ করান। ফলে একজন মুসলিম যোদ্ধারূপে কাফেরদের মুকাবিলা করে চলেন।

তেমনই ঘটনা ঘটে আবু বুরদা বিন নায়ার রাযিয়াল্লাহু আনহুর সাথে। তিনি 'আউতাস' নামক স্থানে পৌঁছে দেখেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক বৃক্ষের নীচে উপবিষ্ঠ আছেন। তাঁর পাশে অন্য একজন লোক। ঘটনার বর্ণনা দিয়ে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, এক সময় আমার তন্দ্রা এসে যায়। এ সুযোগে লোকটি আমার তরবারীটি হাতে নিয়ে আমার শির পাশে এসে বলে, হে মুহাম্মদ! এবার বল আমার হাত থেকে তোমাকে কে রক্ষা করবে? বললাম, আল্লাহ আমার হেফাযতকারী। একথা শুনে তরবারিটি হাত থেকে খসে পড়ে। আবু বুরদা

রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অনুমতি দিন, আল্লাহর এই শত্রুর গর্দান বিচ্ছিন্ন করে দেই। একে শত্রু দলের গোয়েন্দা মনে হচ্ছে। হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন, চুপ কর। আমার দ্বীন অপরাপর দ্বীনকে পরাজিত না করা অবধি আল্লাহ আমার হেফাযত করে যাবেন। এ বলে লোকটিকে বিনা তিরস্কারে মুক্তি দিলেন, সে যা হোক। মুসলিম সেনাদল হুনাইন নামক স্থানে পৌছে শিবির স্থাপন করে। এ সময় হযরত সুহাইল বিন হানযালা রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এসে বলেন, জনৈক অশ্বারোহী এসে শত্রু দলের সংবাদ দিয়েছে যে, তারা পরিবার-পরিজন ও সহায়-সম্পদসহ রণাঙ্গনে জমায়েত হয়েছে। স্মিত হাস্যে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, চিন্তা করো না। ওদের সবকিছু গনীমতের মালামাল হিসেবে মুসলমানদের হস্তগত হবে।

রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনাইনে অবস্থান নিয়ে হযরত আবদুল্লাহ বিন হাদ্দাদ রাযিয়াল্লাহু আনহুকে শত্রু দলের অবস্থান পর্যবেক্ষনের জন্য গোয়েন্দা রূপে পাঠান। তিনি দু' দিন তাদের সাথে অবস্থান করে তাদের সকল যুদ্ধ প্রস্তুতি অবলোকন করেন। এক সময় শত্রু সেনা নায়ক মালেক বিন আউফকে স্বীয় লোকদের একথা বলতে শুনেন, মুহাম্মদ এখনো কোন সাহসী যুদ্ধবাজ জাতির সাথে পাল্লায় পড়েনি। মক্কার নিরীহ কুরাইশদের দমন করে তিনি বেশ দাম্ভিক হয়ে উঠেছেন। কিন্তু এখন বুঝতে পারবেন কার সাথে তাঁর মোকাবেলা। আমরা তার সকল দম্ভ চূর্ণ করে দেব। তোমরা কাল ভোরেই রণাঙ্গনে এরূপ সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে যে, প্রত্যেকের পিছনে তার স্ত্রী পরিজন ও মালামাল উপস্থিত থাকবে। তরবারীর কোষ ভেঙ্গে ফেলবে এবং সকলে এক সাথে আক্রমণ করবে। বস্তুতঃ এদের ছিল প্রচুর যুদ্ধ অভিজ্ঞতা তাই তারা বিভিন্ন ঘাটিতে কয়েকটি সেনাদল লুকায়িত রেখে দেয়।

এ হল শত্রুদের রণ প্রস্তুতির একটি চিত্র। কিন্তু অন্যদিকে এক হিসেবে এটি ছিল মুসলমানদের প্রথম যুদ্ধ, যাতে অংশ নিয়েছে চৌদ্দ হাজার এক বিরাট বাহিনী। এছাড়া অস্ত্রশস্ত্রও ছিল আগের তুলনায় প্রচুর। ইতিপূর্বের উহুদ ও বদর যুদ্ধে মুসলমানদের এ অভিজ্ঞতা হয় যে, মাত্র তিনশ' তেরজন প্রায় নিরস্ত লোকের হাতে পরাজয় বরণ করেছে এক হাজার কাফের সেনা। তাই হুনাইনের বিরাট যুদ্ধ প্রস্তুতির প্রেক্ষিতে 'হাকেম' ও 'বাজ্জার'-এর বর্ণনা মতে

কতিপয় মুসলিম সেনা উৎসাহের আতিশয্যে এ দাবী করে বসে যে, আজকের জয় অনিবার্য, পরাজয় অসম্ভব। যুদ্ধের প্রথম ধাক্কায়ই শত্রুদল পালাতে বাধ্য হবে।

কিন্তু সর্বশক্তিমান আল্লাহর না-পছন্দ যে, কোন মানুষ নিজের শক্তি-সামর্থ্যের উপর ভরসা করে থাকুক। তাই মুসলমানদেরকে আল্লাহ এ কথাটি বুঝিয়ে দিতে চান।

হাওয়াযিন গোত্র পূর্ব পরিকল্পনা মতে মুসলমানদের প্রতি সম্মিলিত আক্রমণ পরিচালনা করে। একই সাথে বিভিন্ন ঘাটিতে লুকায়িত কাফের সেনারা চতুর্দিক থেকে মুসলমানদের ঘিরে ফেলে। এ সময় আবার ধুলি-ঝড় উঠে সর্বত্র অন্ধকারাচ্ছন্ন করে ফেলে। এতে সাহাবীগণের পক্ষে স্ব স্ব অবস্থানে টিকে থাকা সম্ভব হল না। ফলে তাঁরা পালাতে শুরু করেন। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু অশ্ব চালিয়ে সামনের দিকে বাড়তে থাকেন। আর তাঁর সাথে ছিলেন অল্প সংখ্যক সাহাবী। যাঁদের সংখ্যা ছিল মাত্র তিনশ' অন্য রেওয়ায়েত মতে একশ' কিংবা তারও কম, যাঁরা হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে অটল ছিলেন। কিন্তু তাদেরও মনোবাঞ্ছা ছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেন আর অগ্রসর না হন।

এ অবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আব্বাস (রাযিঃ)কে বলেনঃ উচ্চ স্বরে ডাক দাও, বৃক্ষের নীচে জিহাদের বাইয়াত গ্রহণকারী সাহাবীগণ কোথায়? সূরা বাকারা ওয়ালারা কোথায়? জান কুরবানের প্রতিশ্রুতি দানকারী আনসারগণই বা কোথায়? সবাই ফিরে এসো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এখানে আছেন।

হযরত আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহুর এ আওয়াজ রণাঙ্গণকে প্রকম্পিত করে তুলে। পলায়নরত সাহাবীগণ ফিরে দাঁড়ান এবং প্রবল সাহসিকতার সাথে বীর-বিক্রমে যুদ্ধ করে চলে। ঠিক এ সময় আল্লাহ এদের সাহায্যে ফেরেশতা দল পাঠিয়ে দেন। এরপর যুদ্ধের মোড় ঘুরে যায়। কাফের সেনানায়ক মালেক বিন আউফ পরিবার-পরিজন ও মালামালের মায়া ত্যাগ করে পালিয়ে যায় এবং তায়েফ দূর্গে আত্মগোপন করে। এরপর গোটা শত্রুদল পালাতে শুরু করে। এ যুদ্ধে সত্তর জন কাফের নেতা মারা পড়ে।

কতিপয় মুসলমানদের হাতে কিছু শিশু আহত হয়। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটাকে শক্ত ভাষায় নিষেধ করেন। যুদ্ধ শেষে মুসলমানদের হাতে আসে তাদের সকল মালামাল, ছয় হাজার যুদ্ধ বন্দী, চব্বিশ হাজার উষ্ট্র, চব্বিশ হাজার বকরী এবং চার হাজার উকিয়া রৌপ্য।

আলোচ্য ২৫ ও ২৬ আয়াতে যুদ্ধের এ দিকটি তুলে ধরে বলা হয় যে, তোমরা নিজেদের সংখ্যাধিক্যে বেশ আত্মপ্রসাদ লাভ করেছিলে। কিন্তু সেই সংখ্যাধিক্য তোমাদের কাজে আসল না। প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও পৃথিবী তোমাদের জন্যে সংকুচিত হয়ে গেল, তারপর তোমরা পালিয়ে গিয়েছিলে। অতঃপর আল্লাহ তাআলা সান্ত্বনা নাযিল করলেন আপন রাসূলের উপর ও মুসলমানদের উপর এবং ফেরেশতাদের এমন সৈন্যদল প্রেরণ করলেন, যাদের তোমরা দেখনি। তারপর তোমাদের হাতে কাফেরদের শাস্তি দিলেন। দ্বিতীয় আয়াতে বলেন– ثُمَّ اَنزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ

অতঃপর আল্লাহ তাআলা সান্ত্বনা নাযিল করলেন আপন রাসূলের উপর ও মুসলমানদের উপর, এ বাক্যের অর্থ হল হুনাইন যুদ্ধের প্রথম আক্রমণে যে সকল সাহাবী নিজ স্থান ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন তাঁরা আল্লাহর সান্ত্বনা লাভের পর স্ব স্ব অবস্থানে ফিরে আসেন আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আপন অবস্থানে সুদৃঢ় হন। সাহাবীদের প্রতি সান্ত্বনা প্রেরনের অর্থ হল, তাঁরা বিজয়কে খুব নিকটে দেখেছিলেন, এতে বুঝা গেল আল্লাহর সান্ত্বনা ছিল দুই প্রকার। এক প্রকার পলায়নরত সাহাবীদের জন্যে, অন্য প্রকার হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে যারা সুদৃঢ় রয়েছেন তাঁদের জন্যে। এ কথায় ইঙ্গিত দানের জন্যে 'উপর' শব্দটি দু'বার ব্যবহার করা হয়। যেমন, অতঃপর আল্লাহ সান্ত্বনা নাযিল করলেন তাঁর রাসূলের উপর ও মুসলমানদের উপর। অতঃপর বলা হয় وَاَنزَلَ جُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا এবং প্রেরণ করলেন এমন সৈন্য দল যাদের তোমরা দেখনি। এটি হল সাধারণ লোকের ব্যাপারে। তাই কেউ কেউ দেখেছেন বলে কতিপয় রেওয়ায়েতে যে বর্ণিত আছে, তা উপরোক্ত উক্তির বিরোধী নয়। এ আয়াতের শেষ বাক্য হল وَعَذَّبَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَذَالِكَ جَزَاءُ الْكٰفِرِيْنَ আর শাস্তি দিলেন, কাফেরদের এবং এটি হল কাফেরদের পরিণাম। এ শাস্তি বলতে বুঝায় মুসলমানদের হাতে

পরাস্ত ও বিজিত হওয়া যা স্পষ্ট প্রতিভাত হল। আর এটি ছিল দুনিয়াবী শাস্তি, যা দ্রুত কার্যকর হল। পরবর্তী আয়াতে আখেরাতের ব্যাপারে উল্লেখ হয় নিম্নরূপেঃ

ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

অতঃপর আল্লাহ্ যার প্রতি ইচ্ছা তাওবা নসীব করবেন। আল্লাহ্ অতীব মার্জনাকারী, পরম দয়ালু। এ আয়াতে ইঙ্গিত রয়েছে যারা মুসলমানদের হাতে পরাস্ত ও বিজিত হওয়ার শাস্তি পেয়েছে এবং এখনো কুফরী আদর্শের উপর অটল রয়েছে। তাদের কিছু সংখ্যক লোককে আল্লাহ্ ঈমানের তাওফীক দিবেন। নিম্নে এ ধরনের ঘটনার বিবরণ দেয়া হল।

হুনাইন যুদ্ধে হাওয়াযিন ও সাকীফ গোত্রের কতিপয় সরদার মারা পড়ে, কিছু পালিয়ে যায়। তাদের পরিবার-পরিজন বন্দীরূপে এবং মালামাল গনীমতরূপে মুসলমানদের আয়ত্বে আসে। এর মধ্যে ছিল ছয় হাজার বন্দী, চব্বিশ হাজার উষ্ট্রী, চল্লিশ হাজারেরও অধিক বকরী এবং চার হাজার ওকিয়া রূপা যা ওজনে চার মনের সমান। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু সুফিয়ান বিন হারবকে গনীমতের এসব মালামালের তত্ত্বাবধায়ক নিয়োগ করেন।

অতঃপর পরাজিত হাওয়াযিন ও সাকীফ গোত্রদ্বয় বিভিন্ন স্থানে মুসলমানদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত হয়। কিন্তু প্রত্যেক স্থানে তারা পরাজিত হয়। শেষ পর্যন্ত তারা তায়েফের এক মজবুত দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পনের বিশ দিন পর্যন্ত এই দুর্গ অবরোধ করে রাখেন। ওরা দুর্গ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে বান নিক্ষেপ করতে থাকে। কিন্তু সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার সাহস তাদের কারো ছিল না। সাহাবায়ে কেরাম বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এদের বদদু'আ দিন। কিন্তু তিনি এদের জন্যে হেদায়েতের দু'আ করেন। অতঃপর সাহাবায়ে কেরামের সাথে পরামর্শ করে সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের উদ্যোগ গ্রহণ করেন। জি'ইরানা নামক স্থানে পৌঁছে প্রথমে মক্কা গিয়ে ওমরা আদায় ও পরে মদীনা প্রত্যাবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। অপর দিকে মক্কাবাসীদের যারা মুসলমানদের শেষ পরিণতি দেখার উদ্দেশ্যে দর্শকরূপে যুদ্ধ প্রাঙ্গণে এসেছিল, তাদের অনেকে ইসলামের সত্যতা প্রত্যক্ষ করে উক্ত জি'ইরানা

নামক স্থানে ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ্যে ঘোষণা করেন।

এখানে মালে গনীমতরূপে প্রাপ্ত শত্রুর পরিত্যক্ত সম্পদের ভাগ-বাটোয়ারার ব্যবস্থা নেয়া হয়। ঠিক ভাগ-বাটোয়ারার সময় হাওয়াযিন গোত্রের চৌদ্দ সদস্যের এক প্রতিনিধি যোহাইর বিন ছরফের নেতৃত্বে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে উপস্থিত হয়। এদের মধ্যে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধ সম্পর্কীয় চাচা আবু ইয়ারকানও ছিলেন। তারা এসে বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি। আমাদের অনুরোধ আমাদের পরিবার-পরিজন ও অর্থ-সম্পদ আমাদের ফিরিয়ে দিন। আমরা আবু ইয়ারকান সূত্রে আপনার আত্মীয়ও হই। আমরা যে দুর্দশায় পতিত হয়েছি, তা আপনার অজানা নয়। আমাদের প্রতি অনুগ্রহশীল হোন। প্রতিনিধিদের নেতা ছিলেন একজন খ্যাতিবান কবি। তিনি বলেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! এমনি দুর্দশার পরিপ্রেক্ষিতে যদি আমরা রোমান বা ইরাক সম্রাটের কাছে কোন অনুরোধ পেশ করি, তবে আশা যে তাঁরা প্রত্যাখ্যান করবেন না। কিন্তু আল্লাহ আপনার আদর্শ চরিত্রকে সবার উর্ধ্বে রেখেছেন। তাই আপনার কাছে আমরা বিশেষভাবে আশান্বিত।

রাহমাতুললিল আলামীনের জন্যে এ অনুরোধ ছিল উভয় সংকটের কারণ। তাঁর দয়া ও উদার নীতির দাবী ছিল ওদের সকল বন্দী ও মালামাল ফিরিয়ে দেয়া। অপর দিকে শত্রুর পরিত্যক্ত সম্পদের উপর রয়েছে মুজাহিদদের নায্য দাবী। তাদের সে দাবী থেকে বঞ্চিত করা অন্যায়। তাই বুখারী শরীফের বর্ণনা মতে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে জবাব দিয়েছিলেন তা হলঃ

আমার সাথে আছে অসংখ্য মুসলিম সেনা, এরা এ সকল মালামালের দাবীদার। আমি সত্য ও স্পষ্ট কথা পছন্দ করি। তাই তোমাদের ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিচ্ছি দু'টির একটি; হয় বন্দীদের ফেরত নাও, নয়তো মালামাল নিয়ে যাও। যেটি চাইবে তোমাদিগকে দিয়ে দেয়া হবে। তারা বন্দী মুক্তি গ্রহণ করল। এতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকল সাহাবীকে একত্র করে একটি খুৎবা পাঠ করেন। খুৎবায় আল্লাহর প্রশংসা করার পর বলেনঃ

তোমাদের এই ভাইয়েরা তাওবা করে এখানে এসেছে। তাদের বন্দীদের

মুক্তি দান সঙ্গত মনে করছি। তোমাদের যারা সন্তুষ্ট মনে নিজেদের অংশ ফিরিয়ে দিতে প্রস্তুত হতে পারে, তারা যেন এদের প্রতি দয়াবান হয়। আর যারা প্রস্তুত হতে না পার, ভবিষ্যতের 'মালে ফাই' থেকে তাদের উপযুক্ত বদলা দেব।'

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ খুৎবার পর সর্বস্তর থেকে আওয়াজ আসে, 'বন্দী প্রত্যার্পণে আমরা সন্তুষ্ট চিত্তে রাজী।' কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ন্যায়নীতি ও পরের হকের ক্ষেত্রে যথাযথ সতর্কতা অবলম্বনে আবশ্যক আছে বিধায় সমস্বরে তাদের এ সন্তুষ্টি প্রকাশকে যথেষ্ট মনে করলেন না। তাই বলেন, আমি বুঝতে পারছি না তোমাদের কে সন্তুষ্টচিত্তে নিজের প্রাপ্য ত্যাগ করতে রাজী হয়েছে, কে লজ্জার খাতিরে নীরব রয়েছ। এটি মানুষের পারস্পরিক হক। সুতরাং প্রত্যেক গোত্র ও দলের সর্দারগণ আপন লোকদের সঠিক রায় নিয়ে আমাকে যেন অবহিত করেন।

সেমতে তারা নিজ লোকদের ব্যক্তিগত মতামত নিয়ে হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জানান যে, প্রত্যেকে নিজেদের অধিকার ছাড়তে রাজী আছে। একথা জানার পরই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হুনাইন যুদ্ধ বন্দীদের মুক্তি দান করেন।

এই লোকদের কথাই আলোচ্য আয়াতে বলা হয়েছে।

ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ مِنْۢ بَعْدِ ذٰلِكَ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ

অর্থাৎ এরপর আল্লাহর যাদের প্রতি ইচ্ছা তাওবার তাওফীক দিবেন। হুনাইন যুদ্ধের যে বিস্তারিত বিবরণ এখানে দেয়া হল, তার কিছু অংশ কুরআন থেকে এবং বাকী অংশ নির্ভরযোগ্য হাদীস থেকে নেয়া হয়েছে।

(মাযহারী, ইবনে কাসীর, মাআরেফুল কুরআন ৪/৪২৪-৪৩২)

(৬) তাবুক যুদ্ধ

ইরশাদ হয়েছে-

لَوْ كَانَ عَرَضًا قَرِيْبًا وَّسَفَرًا قَاصِدًا لَّاتَّبَعُوْكَ وَلٰكِنْۢ بَعُدَتْ عَلَيْهِمُ الشُّقَّةُ ؕ وَسَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَوِ اسْتَطَعْنَا لَخَرَجْنَا مَعَكُمْ ۚ

يُهْلِكُوْنَ اَنْفُسَهُمْ ج وَاللّٰهُ يَعْلَمُ اِنَّهُمْ لَكٰذِبُوْنَ (٤٢) عَفَا اللّٰهُ عَنْكَ ج
لِمَ اَذِنْتَ لَهُمْ حَتّٰى يَتَبَيَّنَ لَكَ الَّذِيْنَ صَدَقُوْا وَتَعْلَمَ الْكٰذِبِيْنَ (٤٣)
لَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ
وَاَنْفُسِهِمْ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ م بِالْمُتَّقِيْنَ (٤٤) اِنَّمَا يَسْتَاْذِنُكَ الَّذِيْنَ
لَا يُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَارْتَابَتْ قُلُوْبُهُمْ فَهُمْ فِيْ رَيْبِهِمْ
يَتَرَدَّدُوْنَ (٤٥) وَلَوْ اَرَادُوا الْخُرُوْجَ لَاَعَدُّوْا لَهٗ عُدَّةً وَّلٰكِنْ كَرِهَ اللّٰهُ
انْۢبِعَاثَهُمْ فَثَبَّطَهُمْ وَقِيْلَ اقْعُدُوْا مَعَ الْقٰعِدِيْنَ (٤٦) لَوْ خَرَجُوْا
فِيْكُمْ مَا زَادُوْكُمْ اِلَّا خَبَالًا وَّلَا اَوْضَعُوْا خِلٰلَكُمْ يَبْغُوْنَكُمُ الْفِتْنَةَ ج
وَفِيْكُمْ سَمّٰعُوْنَ لَهُمْ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌۢ بِالظّٰلِمِيْنَ (٤٧) لَقَدِ ابْتَغَوُا
الْفِتْنَةَ مِنْ قَبْلُ وَقَلَّبُوْا لَكَ الْاُمُوْرَ حَتّٰى جَآءَ الْحَقُّ وَظَهَرَ اَمْرُ اللّٰهِ
وَهُمْ كٰرِهُوْنَ (٤٨) وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّقُوْلُ ائْذَنْ لِّيْ وَلَا تَفْتِنِّيْ اَلَا فِي
الْفِتْنَةِ سَقَطُوْا ط وَاِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيْطَةٌۢ بِالْكٰفِرِيْنَ (٤٩) اِنْ تُصِبْكَ
حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ ج وَاِنْ تُصِبْكَ مُصِيْبَةٌ يَّقُوْلُوْا قَدْ اَخَذْنَا اَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ
وَيَتَوَلَّوْا وَّهُمْ فَرِحُوْنَ (٥٠) قُلْ لَّنْ يُّصِيْبَنَآ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَنَا ج هُوَ
مَوْلٰنَا وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ (٥١) قُلْ هَلْ تَرَبَّصُوْنَ بِنَآ اِلَّآ
اِحْدَى الْحُسْنَيَيْنِ ط وَنَحْنُ نَتَرَبَّصُ بِكُمْ اَنْ يُّصِيْبَكُمُ اللّٰهُ بِعَذَابٍ
مِّنْ عِنْدِهٖٓ اَوْ بِاَيْدِيْنَا فَتَرَبَّصُوْٓا اِنَّا مَعَكُمْ مُّتَرَبِّصُوْنَ (٥٢) قُلْ اَنْفِقُوْا
طَوْعًا اَوْ كَرْهًا لَّنْ يُّتَقَبَّلَ مِنْكُمْ ط اِنَّكُمْ كُنْتُمْ قَوْمًا فٰسِقِيْنَ (٥٣)
وَمَا مَنَعَهُمْ اَنْ تُقْبَلَ مِنْهُمْ نَفَقٰتُهُمْ اِلَّآ اَنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَبِرَسُوْلِهٖ
وَلَا يَاْتُوْنَ الصَّلٰوةَ اِلَّا وَهُمْ كُسَالٰى وَلَا يُنْفِقُوْنَ اِلَّا وَهُمْ كٰرِهُوْنَ (٥٤)
فَلَا تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَلَا اَوْلَادُهُمْ ط اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ بِهَا فِي

الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ (٥٥) وَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ
اِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ ط وَمَا هُمْ مِّنْكُمْ وَلٰكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَّفْرَقُوْنَ (٥٦) لَوْ يَجِدُوْنَ
مَلْجَاً اَوْ مَغٰرٰتٍ اَوْ مُدَّخَلاً لَّوَلَّوْا اِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُوْنَ (٥٧) وَمِنْهُمْ
مَّنْ يَّلْمِزُكَ فِى الصَّدَقٰتِ ج فَاِنْ اُعْطُوْا مِنْهَا رَضُوْا وَاِنْ لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا
اِذَا هُمْ يَسْخَطُوْنَ (٥٨) وَلَوْ اَنَّهُمْ رَضُوْا مَا اٰتٰهُمُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ وَقَالُوْا
حَسْبُنَا اللّٰهُ سَيُؤْتِيْنَا اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ وَرَسُوْلُهٗٓ اِنَّآ اِلَى اللّٰهِ رٰغِبُوْنَ
(٥٩) اِنَّمَا الصَّدَقٰتُ لِلْفُقَرَاۤءِ وَالْمَسٰكِيْنِ وَالْعٰمِلِيْنَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ
قُلُوْبُهُمْ وَفِى الرِّقَابِ وَالْغٰرِمِيْنَ وَفِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَابْنِ السَّبِيْلِ ط
فَرِيْضَةً مِّنَ اللّٰهِ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ (٦٠) (التوبة ٤٢-٦٠)

তরজমাঃ (৪২) যদি আশু লাভের সম্ভাবনা থাকতো এবং যাত্রা পথও সংক্ষিপ্ত হতো, তবে তারা অবশ্যই আপনার সহযাত্রী হতো, কিন্তু তাদের নিকট যাত্রাপথ সুদীর্ঘ মনে হল। আর তারা এখনই শপথ করে বলবে, আমাদের সাধ্য থাকলে অবশ্যই তোমাদের সাথে বের হতাম। এরা নিজেরাই নিজেদের বিনষ্ট করছে। আর আল্লাহ জানেন যে, এরা মিথ্যাবাদী। (৪৩) আল্লাহ আপনাকে ক্ষমা করুন। আপনি কেন তাদের অব্যাহতি দিলেন, যে পর্যন্ত না আপনার কাছে পরিষ্কার হয়ে যেত সত্যবাদীরা এবং জেনে নিতেন মিথ্যাবাদীদের। (৪৪) আল্লাহ ও রোজ কেয়ামতের প্রতি যাদের ঈমান রয়েছে তারা মাল ও জান দ্বারা জিহাদ করা থেকে আপনার কাছে অব্যাহতি কামনা করবে না, আর আল্লাহ সাবধানীদের ভাল জানেন। (৪৫) নিঃসন্দেহে তারাই আপনার কাছে অব্যাহতি চায়, যারা আল্লাহ ও রোজ কেয়ামতে ঈমান রাখে না এবং তাদের অন্তর সন্দেহগ্রস্ত হয়ে পড়েছে। সুতরাং সন্দেহের আবর্তে তারা ঘুরপাক খেয়ে চলছে। (৪৬) আর যদি তারা বের হওয়ার সংকল্প নিত, তবে অবশ্যই কিছু সরঞ্জাম প্রস্তুত করতো। কিন্তু তাদের উত্থান আল্লাহর পছন্দ নয়। তাই তাদের নিবৃত্ত রাখলেন এবং আদেশ হল বসা লোকদের সাথে তোমরা বসে থাক। (৪৭) যদি তোমাদের সাথে

তারা বের হত, তবে তোমাদের অনিষ্ঠ ছাড়া আর কিছু বৃদ্ধি করতো না, আর অশ্ব ছুটাতো তোমাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে। আর তোমাদের মাঝে রয়েছে তাদের গুপ্তচর। বস্তুতঃ আল্লাহ্ জালিমদের ভালভাবেই জানেন। (৪৮) তারা পূর্ব থেকেই বিভেদ সৃষ্টির সুযোগ সন্ধানে ছিল এবং আপনার কার্যসমূহ উলট-পালট করে দিচ্ছিল। শেষ পর্যন্ত সত্য প্রতিশ্রুতি এসে গেল এবং জয়ী হল আল্লাহর হুকুম, যে অবস্থায় তারা মন্দ বোধ করল। (৪৯) আর তাদের কেউ বলে, আমাকে অব্যাহতি দিন এবং পথভ্রষ্ট করবেন না। শুনে রাখ, তারা তো পূর্ব থেকেই পথভ্রষ্ট এবং নিঃসন্দেহে জাহান্নাম এই কাফেরদের পরিবেষ্টন করে রয়েছে। (৫০) আপনার কোন কল্যাণ হলে তারা মন্দ বোধ করে এবং কোন বিপদ উপস্থিত হলে তারা বলে, আমরা পূর্ব থেকেই নিজেদের কাজ সামলে নিয়েছি এবং ফিরে যায় উল্লসিত মনে। (৫১) আপনি বলুন, আমাদের কাছে কিছুই পৌঁছবে না, কিন্তু যা আল্লাহ আমাদের জন্য রেখেছেন। তিনি আমাদের কার্য নির্বাহক। আল্লাহর উপরই মুমিনদের ভরসা করা উচিত। (৫২) আপনি বলুন, তোমরা তো আমাদের জন্যে দু' কল্যাণের একটি প্রত্যাশা কর। আর আমরা প্রত্যাশায় আছি তোমাদের জন্যে যে, আল্লাহ্ তোমাদের আবার দান করুন আযাব নিজের পক্ষ থেকে অথবা আমাদের হস্তে। সুতরাং তোমরা অপেক্ষা কর। আমরাও তোমাদের সাথে অপেক্ষমান। (৫৩) আপনি বলুন, তোমরা ইচ্ছায় অর্থ ব্যয় কর বা অনিচ্ছায়, তোমাদের থেকে তা কখনো কবুল হবে না, তোমরা নাফরমানের দল। (৫৪) তাদের অর্থ ব্যয় কবুল না হওয়ার এ ছাড়া আর কোন কারণ নেই যে, তারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের প্রতি অবিশ্বাসী। তারা নামাযে আসে অলসতার সাথে আর ব্যয় করে সংকুচিত মনে। (৫৫) সুতরাং তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি যেন আপনাকে বিস্মিত না করে। আল্লাহর ইচ্ছা হল এগুলো দ্বারা দুনিয়ার জীবনে তাদের আযাবে নিপতিত রাখা এবং প্রাণ বিয়োগ হওয়া কুফরী অবস্থায়। (৫৬) তারা আল্লাহ্র নামে হলফ করে বলে যে, তারা তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত অথচ তারা তোমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়। অবশ্য তারা তোমাদের ভয় করে। (৫৭) তারা কোন আশ্রয়স্থল, কোন গুহা বা মাথা গোঁজার ঠাঁই পেলে সেদিকে পলায়ন করবে দ্রুতগতিতে। (৫৮) তাদের মধ্যে এমন লোকও রয়েছে যারা সদকা বন্টনে আপনাকে

দোষারোপ করে। এর থেকে কিছু পেলে সন্তুষ্ট হয় এবং না পেলে বিক্ষুব্ধ হয়। (৫৯) কতইনা ভাল হত, যদি তারা সন্তুষ্ট হত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর এবং বলত, আল্লাহই আমাদের জন্যে যথেষ্ট। আল্লাহ আমাদের দেবেন নিজ করুণায় এবং তার রাসূলও, আমরা শুধু আল্লাহকেই কামনা করি। (৬০) যাকাত হল কেবল ফকীর, মিসকীন, যাকাত আদায়কারী ও যাদের চিত্ত আকর্ষণ প্রয়োজন তাদের হক এবং তা দাস মুক্তির জন্যে। ঋণগ্রস্তদের জন্যে আল্লাহর পথে জিহাদকারীদের জন্যে এবং মুসাফিরদের জন্যে এই হল আল্লাহর নির্ধারিত বিধান। আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময়। (তাওবাঃ ৪২-৬০)

তাফসীরঃ উপরোক্ত আয়াত সমূহে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক পরিচালিত এক গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধের বর্ণনা এবং এ প্রসঙ্গে অনেকগুলো হুকুম ও পথ নির্দেশ উল্লেখ করা হয়েছে। তা হল তাবুক যুদ্ধ, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রায় সর্বশেষ যুদ্ধ। তাবুক মদীনার উত্তর দিকে অবস্থিত সিরিয়া সীমান্তের নিকটবর্তী একটি জায়গার নাম। সিরিয়া ছিল তৎকালে রোমান সাম্রাজ্যের একটি প্রদেশ। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অষ্টম হিজরীতে মক্কা বিজয় ও হুনাইন যুদ্ধ সমাপণ করে যখন মদীনায় প্রত্যাবর্তন করেন, তখন আরব 'ব'দ্বীপের গুরুত্বপূর্ণ অংশগুলো ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল এবং মক্কার মুশরিকদের সাথে একটানা আট বৎসর যুদ্ধ চালিয়ে মুসলমানগণ একটু স্বস্তির নিঃশ্বাস নেয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন। কিন্তু যে রাব্বুল আলামীন ইতিপূর্বে সকল দ্বীনের উপর ইসলামের বিজয় সম্বলিত আয়াত لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ নাযিল করে সারা বিশ্বে ইসসলামের বিজয় কেতন উড়ানোর সংবাদ দিয়েছেন। তাঁর পক্ষের লোকের অবসর যাপনের সময় কোথায়? মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা পৌঁছামাত্র সিরিয়া প্রত্যাগত যয়তুন তৈল ব্যবসায়ী দলের মুখে সংবাদ পেলেন যে, রোমান সম্রাট হিরাক্লিয়াস সিরিয়ার সীমান্তবর্তী তাবুকে তার সেনাবাহিনী সমাবেশ করছে এবং এক বছরের অগ্রিম বেতন দিয়ে তাদের পরিতুষ্ট রেখেছে। আরও সংবাদ পাওয়া গেল যে, আরবের কতিপয় গোত্রের সাথেও তাদের যোগসাজশ রয়েছে। তাদের পরিকল্পনা হল, মদীনায় অতর্কিত আক্রমণ চালিয়ে সবকিছু তছনছ করে দেবে। এ সংবাদ পেয়ে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের আক্রমণের আগে ঠিক তাদের অবস্থান ক্ষেত্রে অভিযান পরিচালনার সংকল্পন নিলেন। (তাফসীরে মাযহারী)

ঘটনা চক্রে তখন ছিল গ্রীষ্মকাল। মদীনার অধিবাসীরা সাধারণ কৃষিজীবী। তখন তাদের ফসল কাটার সময়, যা ছিল তাদের গোটা বছরের জীবিকা। বলা বাহুল্য, চাকুরীজীবীদের অর্থ-কড়ি যেমন মাস শেষে ফুরিয়ে আসে তেমনই নতুন মৌসুমের আগে কৃষিজীবিদের গোলাও খালি হয়ে যায়। তাই একদিকে অভাব-অনটন, অন্যদিকে ঘরে ফসল তোলার আশা, তদুপরি গ্রীষ্মের প্রচণ্ড খরা দীর্ঘ আট বছরের রণক্লান্ত মুসলমানদের জন্যে ছিল এক বিরাট পরীক্ষার বিষয়। কিন্তু সময়ের দাবী উপেক্ষা করা যায় না। বিশেষতঃ এ যুদ্ধ হল সম্পূর্ণ স্বাতন্ত্র ধরনের। আগেকার যুদ্ধগুলো সংঘটিত হয়েছিল নিজেদের সাধারণ মানুষের সাথে। কিন্তু বর্তমান যুদ্ধটি হবে রোমান সম্রাটের সুশিক্ষিত সেনাবাহিনীর সাথে। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনার সকল মুসলমানকে যুদ্ধে বের হওয়ার আদেশ দেন এবং আশপাশের অন্যান্য গোত্রগুলোকেও এতে অংশ নেয়ার আহবান জানান। যুদ্ধে অংশ গ্রহণের এ সাধারণ আহবান ছিল মুসলমানদের জন্যে অগ্নি পরীক্ষা এবং ইসলামের মৌখিক দাবীদার মুনাফিকদের সনাক্ত করার মোক্ষম উপায়। তাই এদের কথা বাদ দিলেও খোদ মুসলমানরাও অবস্থা বিশেষে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। একদল হল যারা কোনরূপ দ্বিধাদ্বন্দ্ব ছাড়াই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। অপর দল কিছু দ্বিধা-সংকোচের মধ্যে প্রথম দলের সাথে শামিল হয়। এ দু' দল সম্পর্কে কুরআন বলেঃ

اَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِى سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ

অর্থাৎ তারা প্রশংসার যোগ্য, যারা তীব্র সংকটকালে তাঁর আনুগত্য করেছে তাদের এক দলের অন্তরসমূহ বিচ্যুতির কাছাকাছি হওয়ার পরেও।

তৃতীয় দল যারা প্রকৃত কোন ওজরের ফলে যুদ্ধে শরীক হতে পারেনি। কুরআন তাদের সম্পর্কে বলে–

لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَاءِ وَلاَ عَلَى الْمَرْضٰى

অর্থাৎ দুর্বল ও পীড়িত লোকদের জন্যে গোনাহ্‌র কিছু নেই। একথা বলে তাদের ওজর কবুল হওয়ার কথা প্রকাশ করা হয়। চতুর্থ দল হল, যারা কোন ওজর-অসুবিধা ছাড়াই নিছক অলসতার দরুণ যুদ্ধযাত্রা থেকে বিরত থাকে। এদের ব্যাপারে কয়েকটি আয়াত নাযিল হয়েছে। যেমন–

وَاٰخَرُوْنَ اعْتَرَفُوْا بِذُنُوْبِهِمْ - اٰخَرُوْنَ مُرْجَوْنَ لِاَمْرِ اللّٰهِ - وَعَلَى الثَّلٰثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا

আয়াতগুলোতে উক্ত দলের অলসতার দরুণ শাস্তির হুমকী এবং পরিশেষে তাদের তাওবা কবুল হওয়ার সুসংবাদ রয়েছে। পঞ্চম দল হল মুনাফিকদের। এরা পরীক্ষার এই কঠিন মুহূর্তে নিজেদের আর লুকিয়ে রাখতে পারেনি। এরা যুদ্ধ থেকে দূরে সরে থাকে। কুরআনের অনেকগুলো আয়াতে এদের বর্ণনা রয়েছে। ষষ্ঠ দল হল মুনাফিদের সেই উপদল, যারা গোয়েন্দা বৃত্তি ও বিভেদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে মুসলমানদের কাতারে শামিল হয়ে যায়।

(আয়াত وَفِيْكُمْ سَمّٰعُوْنَ لَهُمْ (আয়াত ৪৭) وَلَئِنْ سَاَلْتَهُمْ لَيَقُوْلُنَّ (আয়াত ৬৫) এবং وَهَمُّوْا بِمَا لَمْ يَنَالُوْا (৭৪)

আয়াতসমূহে মুনাফিকদের বর্ণনা দেয়া হয়।

কিন্তু এ সকল প্রতিকূলতা সত্ত্বেও যুদ্ধে অনিচ্ছুক ব্যক্তিদের সংখ্যা ছিল নিতান্ত নগণ্য। সেই মুসলমানদের সংখ্যা ছিল বিপুল, যারা সর্বস্ব বিসর্জন দিয়ে আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করতে প্রস্তুত। তাই এ যুদ্ধে ইসলামী সৈন্যের সংখ্যা ছিল ত্রিশ হাজার যা ইতিপূর্বেকার কোন যুদ্ধে দেখা যায়নি।

এত বিপুল সংখ্যক মুসলমানের যুদ্ধ যাত্রার সংবাদ রোম সম্রাটের কানে গেলে সে ভীষণভাবে সন্ত্রস্ত হয় এবং যুদ্ধ থেকে বিরত থাকে। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবাদের নিয়ে কয়েক দিন রণক্ষেত্রে অবস্থান করার পর তাদের মোকাবেলার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে মদীনায় প্রত্যাবর্তন করলেন।

উপরোল্লেখিত আয়াতগুলোর সম্পর্ক বাহ্যতঃ সেই চতুর্থ দলের সাথে যারা ওজর-আপত্তি ছাড়া শুধু অলসতার দরুণ যুদ্ধ যাত্রা থেকে বিরত ছিল। প্রথম আয়াতে অলসতার জন্যে সাজার হুমকি, তৎসঙ্গে অলসতার মূল কারণ

এবং পরে তার প্রতিকারের উপায় কি, তা বর্ণিত হয়। এ বর্ণনা থেকে যে বিষয়টি বিশেষভাবে পরিষ্কার হয়েছে তা হলঃ

দুনিয়ার মোহ ও আখেরাতের প্রতি উদাসীনতা সকল অপরাধের মূল

অলসতার যে কারণ ও প্রতিকারের উপায় এখানে বর্ণিত হয়েছে, তা এক বিশেষ ঘটনার সাথে সংশ্লিষ্ট হলেও চিন্তা করলে বুঝা যাবে যে দ্বীনের ব্যাপারে সকল আলস্য ও নিষ্ক্রিয়তা ও সকল অপরাধ এবং গোনাহের মূলে রয়েছে দুনিয়ার প্রীতি ও আখেরাতের প্রতি উদাসীনতা। হাদীস শরীফে আছেঃ حب الدنيا رأس كل خطيئة অর্থাৎ দুনিয়ার মোহ সকল গোনাহের মূল। সেজন্য আয়াতে বলা হয়ঃ

হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কি হল, আল্লাহর পথে বের হওয়ার জন্য বলা হলে তোমরা মাটি জড়িয়ে ধর (চলাফেরা করতে চাও না) আখেরাতের পরিবর্তে দুনিয়ার জীবন নিয়েই কি পরিতুষ্ট হয়ে গেলে। রোগ নির্ণয়ের পর পরবর্তী আয়াতে তার প্রতিফল এই বলে উল্লেখ করা হয়ঃ দুনিয়ার যিন্দেগীর ভোগের উপকরণ আখেরাতের তুলনায় অতি নগণ্য।

যার সারকথা হল, আখেরাতের স্থায়ী জীবনের চিন্তা-ভাবনাই মানুষের করা উচিত। বস্তুতঃ আখেরাতের চিন্তা-ফিকিরই সকল রোগের একমাত্র প্রতিকার এবং অপরাধ দমনের স্বার্থক উপায়। (মাআরেফুল কুরআন ৪/৪৬০-৪৬৩)

ইরশাদ হয়েছে–

فَرِحَ الْمُخَلَّفُوْنَ بِمَقْعَدِهِمْ خِلٰفَ رَسُوْلِ اللّٰهِ وَكَرِهُوْٓا اَنْ يُّجَاهِدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَقَالُوا لَا تَنْفِرُوْا فِى الْحَرِّ ط قُلْ نَارُ جَهَنَّمَ اَشَدُّ حَرًّا ط لَوْ كَانُوْا يَفْقَهُوْنَ (٨١) فَلْيَضْحَكُوْا قَلِيْلًا وَّلْيَبْكُوْا كَثِيْرًا ج جَزَآءً بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ (٨٢) فَاِنْ رَّجَعَكَ اللّٰهُ اِلٰى طَآئِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَاْذَنُوْكَ لِلْخُرُوْجِ فَقُلْ لَّنْ تَخْرُجُوْا مَعِىَ اَبَدًا

وَّلَنْ تُقَاتِلُوْا مَعِىَ عَدُوًّا ط اِنَّكُمْ رَضِيْتُمْ بِالْقُعُوْدِ اَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوْا
مَعَ الْخٰلِفِيْنَ (٨٣) وَلَا تُصَلِّ عَلٰى اَحَدٍ مِّنْهُمْ مَّاتَ اَبَدًا وَّلَا تَقُمْ
عَلٰى قَبْرِهٖ ط اِنَّهُمْ كَفَرُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَمَاتُوْا وَهُمْ فٰسِقُوْنَ (٨٤) وَلَا
تُعْجِبْكَ اَمْوَالُهُمْ وَاَوْلَادُهُمْ ط اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ اَنْ يُّعَذِّبَهُمْ بِهَا فِى
الدُّنْيَا وَتَزْهَقَ اَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كٰفِرُوْنَ (٨٥) وَاِذَاۤ اُنْزِلَتْ سُوْرَةٌ اَنْ اٰمِنُوْا
بِاللّٰهِ وَجَاهِدُوْا مَعَ رَسُوْلِهِ اسْتَاْذَنَكَ اُولُوا الطَّوْلِ مِنْهُمْ وَقَالُوْا ذَرْنَا
نَكُنْ مَّعَ الْقٰعِدِيْنَ (٨٦) رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلٰى
قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُوْنَ (٨٧) لٰكِنِ الرَّسُوْلُ وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَعَهٗ جٰهَدُوْا
بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ ط وَاُولٰٓئِكَ لَهُمُ الْخَيْرٰتُ ز وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ
(٨٨) اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِىْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا ط
ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ (٨٩) وَجَآءَ الْمُعَذِّرُوْنَ مِنَ الْاَعْرَابِ لِيُؤْذَنَ لَهُمْ
وَقَعَدَ الَّذِيْنَ كَذَبُوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ط سَيُصِيْبُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ
عَذَابٌ اَلِيْمٌ (٩٠) لَيْسَ عَلَى الضُّعَفَآءِ وَلَا عَلَى الْمَرْضٰى وَلَا عَلَى
الَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ مَا يُنْفِقُوْنَ حَرَجٌ اِذَا نَصَحُوْا لِلّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ ط مَا عَلَى
الْمُحْسِنِيْنَ مِنْ سَبِيْلٍ ط وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ (٩١) وَّلَا عَلَى الَّذِيْنَ اِذَا
مَاۤ اَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ قُلْتَ لَاۤ اَجِدُ مَاۤ اَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ ص تَوَلَّوْا وَّاَعْيُنُهُمْ
تَفِيْضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا اَلَّا يَجِدُوْا مَا يُنْفِقُوْنَ (٩٢) اِنَّمَا السَّبِيْلُ
عَلَى الَّذِيْنَ يَسْتَاْذِنُوْنَكَ وَهُمْ اَغْنِيَآءُ ج رَضُوْا بِاَنْ يَّكُوْنُوْا مَعَ
الْخَوَالِفِ وَطَبَعَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ فَهُمْ لَا يَعْلَمُوْنَ (٩٣) يَعْتَذِرُوْنَ
اِلَيْكُمْ اِذَا رَجَعْتُمْ اِلَيْهِمْ ط قُلْ لَّا تَعْتَذِرُوْا لَنْ نُّؤْمِنَ لَكُمْ قَدْ نَبَّاَنَا

اللّٰهُ مِنْ اَخْبَارِكُمْ ط وَسَيَرَى اللّٰهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُوْلُهٗ ثُمَّ تُرَدُّوْنَ اِلٰى عٰلِمِ
الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُوْنَ (٩٤) سَيَحْلِفُوْنَ
بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ ط
اِنَّهُمْ رِجْسٌ ز وَّمَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ ج جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ (٩٥)
يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ ج فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يَرْضٰى
عَنِ الْقَوْمِ الْفٰسِقِيْنَ (٩٦) اَلْاَعْرَابُ اَشَدُّ كُفْرًا وَّنِفَاقًا وَّاَجْدَرُ اَلَّا
يَعْلَمُوْا حُدُوْدَ مَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ ط وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ (٩٧)
وَمِنَ الْاَعْرَابِ مَنْ يَّتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا وَّيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَآئِرَ ط
عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ط وَاللّٰهُ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ (٩٨) (التوبة: ٨١-٩٨)

তরজমাঃ (৮১) পিছনে থেকে যাওয়া লোকেরা আল্লাহর রাসূল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে বসে থাকতে পেরে আনন্দ লাভ করেছে। আর জান ও মালের দ্বারা আল্লাহর রাহে জিহাদ করতে অপছন্দ করছে এবং বলেছে, এই গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না। বলে দাও, উত্তাপে জাহান্নামের আগুন প্রচণ্ডতম। যদি তাদের বিবেচনাশক্তি থাকত। (৮২) অতএব তারা সামান্য হেসে নিক এবং তারা তাদের কৃতকর্মের বদলাতে অনেক বেশী কাঁদবে। (৮৩) বস্তুতঃ আল্লাহ যদি তোমাকে তাদের মধ্য থেকে কোন শ্রেণী বিশেষের দিকে ফিরিয়ে নিয়ে যান এবং অতঃপর তারা তোমার কাছে অভিযানে বের হওয়ার অনুমতি কামনা করে, তবে তুমি বলো যে, তোমরা কখনো আমার সাথে বের হবে না এবং আমার পক্ষ হয়ে কোন শত্রুর সাথে যুদ্ধ করবে না, তোমরা তো প্রথম বারে বসে থাকা পছন্দ করেছ। কাজেই পিছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথে বসেই থাক। (৮৪) আর তাদের মধ্য থেকে কারো মৃত্যু হলে তার উপর কখনও নামায পড়বেন না এবং তার কবরে দাঁড়াবেন না। তারা তো আল্লাহর প্রতি অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেছে এবং রাসূলের প্রতিও। বস্তুতঃ তারা নাফরমান অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে (৮৫) আর বিস্মিত হয়ো না তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততির দরুন। আল্লাহ তো এই চান যে, এ

সবের কারণে তাদেরকে আযাবের ভিতরে রাখবেন দুনিয়ায় এবং তাদের প্রাণ নির্গত হওয়া পর্যন্ত যেন তারা কাফেরই থাকে। (৮৬) আর যখন নাযিল হয় কোন সূরা যে তোমরা ঈমান আন আল্লাহর উপর, তাঁর রাসূলের সাথে একাত্ম হয়ে জিহাদ করো। তখন বিদায় কামনা করে তাদের সামর্থ্যবান লোকেরা এবং বলে আমাদের অব্যাহতি দিন, যাতে আমরা (নিষ্ক্রিয়ভাবে) বসে থাকা লোকদের সাথে থেকে যেতে পারি। (৮৭) তারা পিছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথে থেকে যেতে পেরে আনন্দিত হয়েছে এবং মোহর এঁটে দেয়া হয়েছে তাদের অন্তর সমূহের উপর। বস্তুতঃ তারা বুঝে না। (৮৮) কিন্তু রাসূল এবং সেসব লোক যারা ঈমান এনেছে তাঁর সাথে, তারা যুদ্ধ করেছে নিজেদের জান ও মালের দ্বারা তাদেরই জন্য নির্ধারিত রয়েছে কল্যাণসমূহ এবং তারাই মুক্তির লক্ষ্যে উপণীত হয়েছে। (৮৯) আল্লাহ তাদের জন্য তৈরী করে রেখেছেন কানন কুঞ্জ, যার তলদেশে প্রবাহিত রয়েছে প্রস্রবন। তারা তাতে বাস করবে অনন্তকাল। এটাই হল বিরাট কৃতকার্যতা। (৯০) আর ছলনাকারী বেদুঈন লোকেরা এলো, যাতে তাদের অব্যাহতি লাভ হতে পারে এবং নিবৃত্ত থাকতে পারে তাদেরই (মত) যারা আল্লাহ ও রাসূলের সাথে মিথ্যা বলেছিল। এবার তাদের উপর শীঘ্রই আসবে বেদনাদায়ক আযাব যারা কাফের। (৯১) দুর্বল, রুগ্ন ব্যয়ভার বহনে অসমর্থ লোকদের জন্য কোন অপরাধ নেই, যখন তারা মনের দিক থেকে পবিত্র হবে আল্লাহ ও রাসূলের সাথে। নেককারদের উপর অভিযোগের কোন পথ নেই। আর আল্লাহ হচ্ছেন ক্ষমাকারী দয়ালু। (৯২) আর না আছে তাদের উপর যারা এসেছে তোমার নিকট যেন তুমি তাদের বাহন দান কর এবং তুমি বলেছ, আমার কাছে এমন কোন বস্তু নেই যে, তার উপর তোমাদের সওয়ার করাব তখন তারা ফিরে গেছে অথচ তখন তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু বইছিল এ দুঃখে যে তারা এমন কোন বস্তু পাচ্ছে না যা ব্যয় করবে। (৯৩) অভিযোগের পথ তো তাদের ব্যাপারে রয়েছে, যারা তোমার নিকট অব্যাহতি কামনা করে অথচ তারা সম্পদশালী। যারা পিছনে পড়ে থাকা লোকদের সাথে থাকতে পেরে আনন্দিত হয়েছে। আর আল্লাহ মোহর এঁটে দিয়েছেন তাদের অন্তরসমূহে। বস্তুতঃ তারা জানতেও পারেনি। (৯৪) তুমি যখন তাদের কাছে ফিরে আসবে। তখন তারা তোমাদের নিকট ছল-ছুতা নিয়ে উপস্থিত

হবে। তুমি বলো, ছল করো না। আমি কখনো তোমাদের কথা শুনব না। আমাকে আল্লাহ্ তাআলা তোমাদের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে দিয়েছেন। আর এখন তোমাদের কর্ম আল্লাহ্ই দেখবেন এবং তাঁর রাসূল। তারপর তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে সেই গোপন ও অগোপন বিষয়ে অবগত সত্তার নিকট। তিনিই তোমাদের বাতলে দেবেন যা তোমরা করছিলে। (৯৫) এখন তারা তোমার সামনে আল্লাহ্র কসম খাবে, যখন তুমি তাদের কাছে ফিরে যাবে, যেন তুমি তাদের ক্ষমা করে দাও। সুতরাং তুমি তাদের ক্ষমা কর নিঃসন্দেহে এরা অপবিত্র এবং তাদের কৃতকর্মের বদলা হিসেবে তাদের ঠিকানা হলো দোযখ। (৯৬) তারা তোমার সামনে কসম খাবে যাতে তুমি তাদের প্রতি রাজী হয়ে যাও। অতএব তুমি যদি রাজী হয়ে যাও তাদের প্রতি তবু আল্লাহ্ তাআলা রাজী হবেন না, এ নাফরমান লোকদের প্রতি। (৯৭) বেদুঈনরা কুফর ও মুনাফেকীতে অত্যন্ত কঠোর হয়ে থাকে এবং এরা যেসব নীতি-কানুন না শেখারই যোগ্য যা আল্লাহ তাআলা তার রাসূলের উপর নাযিল করেছেন। বস্তুতঃ আল্লাহ সবকিছুই জানেন এবং তিনি অত্যন্ত কুশলী। (৯৮) আবার কোন কোন বেদুঈন এমনও রয়েছে যারা নিজেদের ব্যয় করাকে জরিমানা বলে গণ্য করে এবং তোমার উপর কোন দুর্দিন আসে কিনা সে অপেক্ষায় থাকে। তাদেরই উপর দুর্দিন আসুক। আর আল্লাহ হচ্ছেন শ্রবণকারী, পরিজ্ঞাত। (তাওবাঃ ৮১-৯৮)

তাফসীরঃ উল্লেখিত আয়াতগুলোতেও সেসব মুনাফিকের কথাই বর্ণনা করা হয়েছে যারা তাবুক যুদ্ধে অংশগ্রহণে নানা রকম ছলনার আশ্রয়ে বিরত থেকে ছিল। সেসব মুনাফিকের মাঝে কেউ কেউ সম্পদশালীও ছিল। তাদের অবস্থা থেকে মুসলমানদের ধারণা হতে পারত যে, এরা যখন আল্লাহ্র নিকট ধিকৃত, তখন দুনিয়াতে এরা কেন এসব নি'আমত পাবে?

এর উত্তরে প্রথম আয়াতে বলা হয়েছে যে, যদি লক্ষ্য করে দেখা যায়, তবে দেখা যাবে, তাদের এ ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন রহমত ও নি'আমত নয়। বরং পার্থিব জীবনেও এগুলো তাদের জন্য আযাব বিশেষ। আখেরাতের আযাব তো এর বাইরে আছেই। দুনিয়াতে আযাব হওয়ার ব্যাপারটি এভাবে যে, ধন-সম্পদের মহব্বত, তার রক্ষণাবেক্ষণ ও বৃদ্ধির চিন্তা-ভাবনা তাদেরকে এমন কঠিনভাবে পেয়ে বসে যে, কোন সময় কোন

অবস্থাতেই স্বস্তি পেতে দেয় না। আরাম-আয়েশের যত উপকরণই তাদের কাছে থাক না কেন, তাদের ভাগ্যে সে আরাম জুটে না যা মনের শান্তি ও স্বস্তি হিসেবে গণ্য হতে পারে। এছাড়া দুনিয়ার এসব ধন-সম্পদ যেহেতু তাদেরকে আখেরাত সম্পর্কে গাফেল করে দিয়ে কুফর ও পাপে নিমজ্জিত করে রাখার কারণ হয়ে থাকে, সেহেতু আযাবের কারণ হিসেবেও এগুলোকে আযাব বলা যেতে পারে। এ কারণেই কুরআনের ভাষায়– ليعذبهم بها বলা হয়েছে। আল্লাহ তাআলা এ সমস্ত ধন-সম্পদের মাধ্যমেই তাদেরকে শাস্তি দিতে চান। اولوا الطول শব্দটি সম্পন্ন লোকদের নির্দিষ্ট করার জন্য ব্যবহৃত হয়নি; বরং এর দ্বারা যারা সম্পন্ন নয় অর্থাৎ যারা অসম্পন্ন এতে তাদের অবস্থা সুস্পষ্টভাবে বুঝা গেল যে, তাদের কাছে একটি বাহ্যিক ওজরও ছিল (যার ভিত্তিতে তারা যুদ্ধে অংশগ্রহণে অব্যাহতি কামনা করতে পারত)। (তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন ৪/৫৩২)

(চ) খন্দক বা আহযাব যুদ্ধ

ইরশাদ হয়েছে–

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوْا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُوْدٌ
فَاَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا وَّجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا ط وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ
بَصِيْرًا (٩) اِذْ جَآءُوْكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ اَسْفَلَ مِنْكُمْ وَاِذْ زَاغَتِ
الْاَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّوْنَ بِاللّٰهِ الظُّنُوْنَا (١٠)
هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالًا شَدِيْدًا (١١) وَاِذْ يَقُوْلُ
الْمُنٰفِقُوْنَ وَالَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗٓ اِلَّا
غُرُوْرًا (١٢) وَاِذْ قَالَتْ طَّآئِفَةٌ مِّنْهُمْ يٰٓاَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ
فَارْجِعُوْا ج وَيَسْتَاْذِنُ فَرِيْقٌ مِّنْهُمُ النَّبِيَّ يَقُوْلُوْنَ اِنَّ بُيُوْتَنَا عَوْرَةٌ ط وَمَا
هِيَ بِعَوْرَةٍ ج اِنْ يُّرِيْدُوْنَ اِلَّا فِرَارًا (١٣) وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِّنْ
اَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَاٰتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوْا بِهَآ اِلَّا يَسِيْرًا (١٤)

وَلَقَدْ كَانُوْا عَاهَدُوا اللّٰهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّوْنَ الْاَدْبَارَ ط وَكَانَ عَهْدُ اللّٰهِ
مَسْئُوْلًا (١٥) قُلْ لَّنْ يَّنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ اِنْ فَرَرْتُمْ مِّنَ الْمَوْتِ اَوِ الْقَتْلِ
وَاِذًا لَّا تُمَتَّعُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا (١٦) قُلْ مَنْ ذَا الَّذِيْ يَعْصِمُكُمْ مِّنَ اللّٰهِ اِنْ
اَرَادَ بِكُمْ سُوْٓءًا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ط وَلَا يَجِدُوْنَ لَهُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ
وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا (١٨) قَدْ يَعْلَمُ اللّٰهُ الْمُعَوِّقِيْنَ مِنْكُمْ وَالْقَائِلِيْنَ
لِاِخْوَانِهِمْ هَلُمَّ اِلَيْنَا وَلَا يَاْتُوْنَ الْبَاْسَ اِلَّا قَلِيْلًا (١٨) اَشِحَّةً عَلَيْكُمْ
صلے فَاِذَا جَآءَ الْخَوْفُ رَاَيْتَهُمْ يَنْظُرُوْنَ اِلَيْكَ تَدُوْرُ اَعْيُنُهُمْ كَالَّذِيْ
يُغْشٰى عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ ج فَاِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ سَلَقُوْكُمْ بِاَلْسِنَةٍ حِدَادٍ
اَشِحَّةً عَلَى الْخَيْرِ ط اُولٰٓئِكَ لَمْ يُؤْمِنُوْا فَاَحْبَطَ اللّٰهُ اَعْمَالَهُمْ ط وَكَانَ
ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرًا (١٩) يَحْسَبُوْنَ الْاَحْزَابَ لَمْ يَذْهَبُوْا ج وَاِنْ يَّاْتِ
الْاَحْزَابُ يَوَدُّوْا لَوْ اَنَّهُمْ بَادُوْنَ فِى الْاَعْرَابِ يَسْاَلُوْنَ عَنْ اَنْۢبَآئِكُمْ ط
وَلَوْ كَانُوْا فِيْكُمْ مَّا قٰتَلُوْٓا اِلَّا قَلِيْلًا (٢) لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ
اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا
(٢١) وَلَمَّا رَاَ الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ
وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهٗ ز وَمَا زَادَهُمْ اِلَّآ اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا (٢٢) مِنَ
الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ ج فَمِنْهُمْ مَّنْ قَضٰى
نَحْبَهٗ وَمِنْهُمْ مَّنْ يَّنْتَظِرُ صلے وَمَا بَدَّلُوْا تَبْدِيْلًا (٢٣) لِيَجْزِيَ اللّٰهُ
الصّٰدِقِيْنَ بِصِدْقِهِمْ وَيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ اِنْ شَآءَ اَوْ يَتُوْبَ عَلَيْهِمْ ط اِنَّ
اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا (٢٤) وَرَدَّ اللّٰهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِغَيْظِهِمْ لَمْ
يَنَالُوْا خَيْرًا ط وَكَفَى اللّٰهُ الْمُؤْمِنِيْنَ الْقِتَالَ ط وَكَانَ اللّٰهُ قَوِيًّا عَزِيْزًا

(٢٥) وَاَنْزَلَ الَّذِيْنَ ظَاهَرُوْهُمْ مِّنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ صَيَاصِيْهِمْ وَقَذَفَ
فِىْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ فَرِيْقًا تَقْتُلُوْنَ وَتَاْسِرُوْنَ فَرِيْقًا (٢٦) وَاَوْرَثَكُمْ
اَرْضَهُمْ وَدِيَارَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ وَاَرْضًا لَّمْ تَطَئُوْهَا ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ
شَىْءٍ قَدِيْرًا (٢٧) (الاحزاب ٩-٢٨)

তরজমাঃ (৯) হে মুমিনগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর নি'আমতের কথা স্মরণ কর। যখন শত্রু বাহিনী তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল। অতঃপর আমি তাদের বিরুদ্ধে ঝঞ্ঝা বায়ু এবং এমন সৈন্য বাহিনী প্রেরণ করেছিলাম, যাদেরকে তোমরা দেখতে না। তোমরা যা কর, আল্লাহ তা দেখেন। (১০) যখন তারা তোমাদের নিকটবর্তী হয়েছিল উচ্চ ভূমি ও নিম্নভূমি থেকে এবং যখন তোমাদের দৃষ্টিভ্রম হচ্ছিল, প্রাণ কণ্ঠাগত হয়েছিল এবং তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানা বিরূপ ধারণা পোষণ করতে শুরু করেছিলে। (১১) সে সময়ে মুমিনগণ পরীক্ষিত হয়েছিল এবং ভীষণভাবে প্রকম্পিত হচ্ছিল। (১২) এবং যখন মুনাফিক ও যাদের অন্তরে রোগ ছিল তারা বলছিল, আমাদেরকে প্রদত্ত আল্লাহ ও রাসূলের প্রতিশ্রুতি প্রতারণা বৈ নয়। (১৩) এবং যখন তাদের একদল বলেছিল হে ইয়াসরেববাসী! একটা টিকবার মত জায়গা নয়, তোমরা ফিরে চল। তাদেরই একদল নবীর কাছে অনুমতি প্রার্থনা করে বলেছিল, আমাদের বাড়ী-ঘর খালী। অথচ সেগুলো খালি ছিল না, পলায়ন করাই ছিল তাদের ইচ্ছা। (১৪) যদি শত্রু পক্ষ চতুর্দিক থেকে নগরে প্রবেশ করে তাদের সাথে মিলিত হত, অতঃপর বিদ্রোহ করতে প্ররোচিত করত, তবে তারা অবশ্যই বিদ্রোহ করত এবং তারা মোটেই বিলম্ব করত না। (১৫) অথচ তারা পূর্বে আল্লাহর সাথে অঙ্গীকার করেছিল যে, তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। আল্লাহর অঙ্গীকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। (১৬) বলুন, তোমরা যদি মৃত্যু অথবা হত্যা থেকে পলায়ন কর, তবে এ পলায়ন তোমাদের কাজে আসবে না। তখন তোমাদেরকে সামান্যই ভোগ করতে দেয়া হবে। (১৭) বলুন, কে তোমাদেরকে আল্লাহ থেকে রক্ষা করবে যদি তিনি তোমাদের অমঙ্গল ইচ্ছা করেন অথবা তোমাদের প্রতি অনুকম্পার ইচ্ছা (করেন)? তারা আল্লাহ ব্যতীত নিজেদের কোন অভিভাবক ও সাহায্যদাতা পাবে না। (১৮) আল্লাহ খুব জানেন তোমাদের মধ্যে কারা

তোমাদেরকে বাধা দেয় এবং কারা তাদের ভাইদেরকে বলে আমাদের কাছে এসো। তারা কমই যুদ্ধ করে। (১৯) তারা তোমাদের প্রতি কুণ্ঠাবোধ করে। যখন বিপদ আসে, তখন আপনি দেখবেন মৃত্যু ভয়ে অচেতন ব্যক্তির মত চোখ উল্টিয়ে তারা আপনার প্রতি তাকায়। অতঃপর যখন বিপদ টলে যায়, তখন তারা ধন-সম্পদ লাভের আশায় তোমাদের সাথে বাক চাতুরীতে অবতীর্ণ হয়। তারা মুমিন নয়। তাই আল্লাহ তাদের কর্মসমূহ নিস্ফল করে দিয়েছেন। এটা আল্লাহর জন্য সহজ। (২০) তারা মনে করে শত্রু বাহিনী চলে যায়নি। যদি শত্রু বাহিনী আবার এসে পড়ে, তবে তারা কামনা করবে যে, যদি তারা গ্রামবাসীদের মধ্যে থেকে তোমাদের সংবাদাদি জেনে নিত, তবেই ভাল হত। তারা তোমাদের মধ্যে অবস্থান করলেও যুদ্ধ সমান্যাই করত। (২১) যারা আল্লাহ ও শেষ দিবসের আশা রাখে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে তাদের জন্যে রাসূলুল্লাহর মধ্যে উত্তম নমুনা রয়েছে। (২২) যখন মুমিনরা শত্রু বাহিনীকে দেখল, তখন বলল আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এরই ওয়াদা আমাদেরকে দিয়েছিলেন এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সত্য বলেছেন। এতে তাদের ঈমান ও আত্মসমর্পণই বৃদ্ধি পেল। (২৩) মুমিনদের মধ্যে কতক আল্লাহর সাথে কৃত ওয়াদা পূর্ণ করেছে। তাদের কেউ কেউ মৃত্যু বরণ করেছে এবং কেউ কেউ প্রতীক্ষা করেছে। তারা তাদের সংকল্প মোটেই পরিবর্তন করেনি। (২৪) এটা এজন্যে যাতে আল্লাহ সত্যবাদীদেরকে তাদের সত্যবাদীতার কারণে প্রতিদান দেন এবং ইচ্ছা করলে মুনাফিকদেরকে শাস্তি দেন অথবা ক্ষমা করেন। নিশ্চয় আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (২৫) আল্লাহ কাফেরদের ক্রুদ্ধাবস্থায় ফিরিয়ে দিলেন। তারা কোন কল্যাণ পায়নি। যুদ্ধ করার জন্য আল্লাহ মুমিনদের জন্যে যথেষ্ট হয়ে গেলেন। আল্লাহ শক্তিধর পরাক্রমশালী। (২৬) কিতাবীদের মধ্যে যারা কাফেরদের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিল, তাদেরকে তিনি তাদের দুর্গ থেকে নামিয়ে দিলেন এবং তাদের অন্তরে ভীতি নিক্ষেপ করলেন। ফলে তোমরা এক দলকে হত্যা করছ এবং একদলকে বন্দী করছ। (২৭) তিনি তোমাদেরকে তাদের ভূমির, ঘর-বাড়ীর, ধন-সম্পদের এবং এমন এক ভূখণ্ডের মালিক করে দিয়েছেন যেখানে তোমরা অভিযান (পরিচালনা) করনি। আল্লাহ সর্ববিষয়ে সর্বশক্তিমান। (আহযাব ৯–২৭)

খন্দক বা আহযাব যুদ্ধের বিবরণ

তাফসীর ঃ أَحْزَابٌ শব্দটি حِزْبٌ এর বহুবচন। যার অর্থ পার্টি বা দল। এ যুদ্ধে কাফেরদের বিভিন্ন দল ও গোত্র একতাবদ্ধ হয়ে মুসলমানদেরকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করার সংকল্প নিয়ে মদীনার উপর চড়াও হয়েছিল বলে এর নাম আহযাবের (সম্মিলিত বাহিনীর) যুদ্ধ রাখা হয়েছে। যেহেতু এ যুদ্ধ শত্রুদের আগমন পথে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশানুযায়ী পরীখা খনন করা হয়েছিল, এজন্য একে খন্দক (পরিখার) যুদ্ধও বলা হয়। আর আহযাব যুদ্ধের অব্যাবহিত পরেই যেহেতু বনু কুরায়যার যুদ্ধও সংঘটিত হয় উল্লেখিত আয়াতসমূহে এরও বর্ণনা রয়েছে। সুতরাং এ যুদ্ধও আহযাব যুদ্ধেরই অংশ বিশেষ– যা বিস্তারিত ঘটনার মাধ্যমে জানা যাবে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে বছর মক্কা থেকে হিজরত করে মদীনায় আসেন। তার পরের বছরই বদরের যুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং তৃতীয় বছর হয় উহুদের যুদ্ধ। আহযাবের যুদ্ধ সংঘটিত হয় চতুর্থ বছর। আবার কোন কোন রেওয়ায়েতে এটা পঞ্চম হিজরীর ঘটনা বলে উল্লেখ করা হয়েছে। যা হোক হিজরতের সূচনা থেকে এ যাবত মুসলমানদের উপর পর্যায়ক্রমে কাফেরদের আক্রমণ চলে আসছিল। আহযাবের যুদ্ধের এ আক্রমণ হয়েছিল দৃঢ় সংকল্প, অটুট মনোবল, অভূতপূর্ব শক্তি-পরাক্রম ও পরিপূর্ণ প্রস্তুতি সহকারে। তাই হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরামের পক্ষে এ যুদ্ধ ছিল অপরাপর সকল যুদ্ধের চেয়ে সর্বাধিক কঠিন ও সংকট সংকুল। কেননা এ যুদ্ধে আক্রমণকারী কাফেরদের সম্মিলিত বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা পনের হাজারের মত ছিল বলে বলা হয়। পক্ষান্তরে মুসলমানদের মোট সংখ্যা মাত্র তিন হাজার তাও আবার প্রয়োজনীয় সাজ-সরাম ও অস্ত্র-শস্ত্রহীন। তদুপরি সময়টা ছিল কঠিন শীতের। কুরআনে কারীম ঘটনার ভয়াবহতা এরূপভাবে বর্ণনা করেছে– زَاغَتِ الْاَبْصَارُ (চোখ বিস্ফোরিত হয়ে উঠেছিল– وَبَلَغَتِ الْقُلُوْبُ الْحَنَاجِرَ (হৃদপিণ্ড অর্থাৎ প্রাণ ছিল কণ্ঠাগত) وَزُلْزِلُوْا زِلْزَالاً شَدِيْدًا (এবং তারা কঠিন কম্পনে নিপতিত হয়)।

এ ঘটনা মুসলমানদের জন্য যেমন কঠিন ও সংকটময় ছিল ঠিক

তেমনই আল্লাহ পাকের অদৃশ্য সাহায্য-সহযোগিতার বদৌলতে মুসলমানগণের পক্ষে এর পরিণাম ফল এমন মহান বিজয় সাফল্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে যে, বিপক্ষ মুশরিক ইয়াহুদী ও কপট বিশ্বাসী মুনাফিকদের সম্মিলিত বাহিনীর মেরুদণ্ড ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যায় এবং মুসলমানদের উপর ভবিষ্যতে আবার আক্রমণের দুঃসাহস দেখাতে পারে তারা এমন যোগ্য আর রইল না। তাই এটা ছিল কুফর ও ইসলামের মধ্যকার একটা চূড়ান্ত ফায়সালার যুদ্ধ, যা চতুর্থ বা পঞ্চম হিজরীতে মদীনার মূল ভূখণ্ডে সংঘটিত হয়েছিল।

ঘটনার সূচনা এরূপভাবে হয় যে, নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানগণের প্রতি চরম শত্রুতা পোষণকারী বনু নাযীর ও আবু ওয়ায়েল গোত্রভুক্ত বিশ জন ইয়াহুদী মক্কায় গিয়ে কুরাইশ নেতৃবৃন্দকে মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে অনুপ্রাণিত করলো। কুরাইশ নেতৃবৃন্দ মনে করত যে, যেরূপভাবে মুসলমানগণ আমাদের প্রতিমা পূজাকে কুফরী বলে আখ্যায়িত করে আমাদের ধর্মকে অপ্রকৃষ্ট বলে ধারণা করে। আমাদের ধর্ম সম্পর্কে ইয়াহুদীদের ধারণাও ঠিক একই রকম। সুতরাং তাদের সহযোগিতা ও একাত্মতার আশা কিভাবে করা যেতে পারে। তাই তারা ইয়াহুদীদেরকে প্রশ্ন করলো যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও আমাদের মাঝে ধর্মীয় ব্যাপারে যে বিরোধ ও মত পার্থক্য রয়েছে তা আপনারা জানেন আপনারা ঐশী গ্রন্থানুসারী প্রজ্ঞাবান লোক। সুতরাং একথা বলুন যে, আপনাদের দৃষ্টিতে আমাদের ধর্ম উত্তম না তাদের (মুসলমানের) ধর্ম।

রাজনীতি ক্ষেত্রে মিথ্যার আশ্রয় নতুন ব্যাপার নয়

সে সব ইয়াহুদীরা নিজেদের অন্তরস্থ জ্ঞান ও বিশ্বাসের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধে তাদেরকে নিঃসংকোচে এ উত্তর দিয়ে দিল যে, তোমাদের ধর্ম মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ধর্মের চেয়ে উত্তম। এ উত্তরে তারা খানিকটা সান্ত্বনা লাভ করল। এতদসত্ত্বেও ব্যাপার এ পর্যন্ত গড়াল যে, আগত এই বিশ জন ইয়াহুদী পঞ্চাশ জন কুরাইশ নেতৃবৃন্দ সহ মসজিদে হারামে প্রবেশ করে বায়তুল্লাহর দেয়ালে নিজদের বুক লাগিয়ে আল্লাহর সামনে এ অঙ্গীকার করলো যে, এক ব্যক্তিও জীবিত থাকা পর্যন্ত তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবে।

আল্লাহর ধৈর্য

আল্লাহর ঘরে সে ঘরেরই দেয়ালে বুক লাগিয়ে আল্লাহর শক্ররা তদীয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিরুদ্ধে যুদ্ধের অঙ্গীকার ও সংকল্প গ্রহণ করছে এবং যুদ্ধের নতুন প্রেরণা নিয়ে পূর্ণ তৃপ্তিসহ নিশ্চিন্তে ফিরে আসছে। এটা ছিল আল্লাহর ধৈর্য ও অনুগ্রহের বিস্ময়কর প্রকাশ। কাহিনীর শেষ ভাগে তাদের এ অঙ্গীকারের করুণ পরিণতি সম্পর্কেও অবহিত হওয়া যাবে যে, এ যুদ্ধে তারা সবাই পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে পালিয়ে যায়।

এই ইয়াহুদীরা মক্কার কুরাইশদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে আরবের এক খ্যাতনামা সমর কুশলী গোত্র বনী গাতফানের নিকটে পৌঁছে তাদেরকে বলল যে, আমরা মক্কার কুরাইশদের সাথে এ ব্যাপারে ঐক্যবদ্ধ হয়েছি যে, নতুন ধর্ম ইসলামের বাহক ও সম্প্রসারকদেরকে এক যৌথ আক্রমণের মাধ্যমে সমূলে উৎপাটিত করে দেব। আপনারাও এ বিষয়ে আমাদের সাথে চুক্তিবদ্ধ হোন। সাথে সাথে ঘুষ হিসেবে এ প্রস্তাবও পেশ করল যে, এক বছর খায়বারে যে পরিমাণে খেজুর উৎপন্ন হবে তা সম্পূর্ণটুকু কোন কোন বর্ণনা মতে তার অর্ধেক বনু গাতফানকে প্রদান করা হবে। গাতফান গোত্র প্রধান উরাইনা বিন হাসান উপরোক্ত শর্তে তাদের সাথে সহযোগিতার আশ্বাস দিয়ে যথারীতি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে।

পারস্পরিক চুক্তিপত্র মোতাবেক আবু সুফিয়ানের নেতৃত্বে যুদ্ধের সাজ-সারঞ্জাম সহ তিনশ ঘোড়া ও এক হাজার উট সহ চার হাজার কুরাইশ সৈন্য মক্কা থেকে রওয়ানা হয়ে মাররে যাহরান নামক স্থানে অবস্থান গ্রহণ করে। এখানে বনু আসলাম, বনু আশজা, বনু মুররাহ বনু কেনানাহ, বনু কাবারাহ, বনু গাতফান প্রমুখ গোত্রের লোক এদের সাথে মিলিত হয়। যাদের মোট সংখ্যা কোন সূত্রানুযায়ী দশ হাজার, কোন সূত্রানুযায়ী বার হাজার, আবার কোন সূত্রানুযায়ী পনের হাজার বর্ণনা করা হয়েছে।

মদীনার উপর বৃহত্তর আক্রমণ

বদরের যুদ্ধে মুসলমানদের বিপক্ষীয় কাফের সৈন্যের সংখ্যা ছিল এক হাজার। আবার উহুদের যুদ্ধে আক্রমণকারী সৈন্য ছিল তিন হাজার। এবার সৈন্য সংখ্যাও পূর্ববর্তী প্রত্যেক বারের চেয়ে অনেক বেশী। সাজ-সরঞ্জাম ও প্রচুর আর এটা সমগ্র আরব ও ইয়াহুদী গোত্রের সম্মিলিত শক্তি।

মুসলমানগণের যুদ্ধ প্রস্তুতি

(১) আল্লাহর উপর নির্ভরশীলতা, (২) পারস্পরিক পরামর্শ, (৩) সাধ্যানুসারে বাহ্যিক বস্তুগত বাহন ও উপকরণ সংগ্রহ।

হযরত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সম্মিলিত বাহিনীর সংবাদ প্রাপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে তাঁর মুখ নিঃসৃত সর্বপ্রথম বাক্যটি ছিল- حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ। (মহান আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ঠ এবং তিনিই আমাদের সর্বোত্তম নিয়ামক।) অতঃপর মুহাজের ও আনসারদের নেতৃস্থানীয় বিশিস্ট ব্যক্তিবর্গকে একত্রিত করে তাঁদের পরামর্শ গ্রহণ করলেন। যদিও প্রত্যাদেশ প্রাপ্ত ব্যক্তির জন্য অপরের সাথে পরামর্শের প্রয়োজন নেই তিনি সরাসরি বিধাতার ইঙ্গিত ও অনুমতি সাপেক্ষে কাজ করেন। কিন্তু পরামর্শে দু ধরনের লাভ রয়েছে।

(১) উম্মতের মাঝে পরামর্শের রীতি চালু করা, (২) মুমিনগণের অন্তঃকরণে পারস্পরিক ঐক্য ও সংহতির উন্মেষ সাধন এবং পরস্পরের মধ্যে সাহায্য-সহযোগিতার প্রেরণা পূনঃজাগরণ, উপরন্তু যুদ্ধ ও দেশ রক্ষা সংক্রান্ত বাহ্যিক উপকরণ সম্পর্কেও চিন্তা-ভাবনা করা হয়েছে। পরামর্শ সভায় হযরত সালমান ফারসী রাযিয়াল্লাহু আনহুও উপস্থিত ছিলেন যিনি সদ্য জনৈক ইয়াহুদীর দাসত্ব শৃংখল থেকে মুক্তি লাভ করে ইসলামের খেদমতের জন্য প্রস্তুতি নিয়েছিলেন। তিনি পরামর্শ দিলেন যে, এরূপ পরিস্থিতিতে পারসিকদের রণকৌশল হচ্ছে শত্রুর আক্রমণ প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে পরিখা খনন করে তাদের প্রবেশ পথ রুদ্ধ করে দেওয়া। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পরামর্শ গ্রহণ করে পরিখা খননের নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি নিজেও সক্রিয়ভাবে এ কাজে অংশগ্রহণ করেন।

পরিখা খনন

শত্রুদের মদীনার সম্ভাব্য প্রবেশ দ্বার সালা পর্বতের পশ্চাদবর্তী পথের সমান্তরালে এ পরিখা খননের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। পরিখার দৈর্ঘ-প্রস্থের নক্সা নবীজী স্বয়ং অংকন করেন। এই পরিখা 'শায়খাইন নামক স্থান থেকে আরম্ভ করে 'সালা' পর্বতের পশ্চিম প্রান্ত পর্যন্ত সম্প্রসারিত ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে তা

বাতজান উপত্যকা ও রাতুনা উপত্যকার সংযোগ স্থল পর্যন্ত বর্ধিত করা হয়। এই পরিখার দৈর্ঘ ছিল প্রায় সাড়ে তিন মাইল। এর প্রশস্থতা ও গভীরতার সঠিক পরিমাণ কোন রেওয়ায়েত থেকে পাওয়া যায় না। তবে একথা পরিষ্কার যে এতটুকু গভীর ও প্রশস্থ অবশ্যই ছিল যাতে শত্রু সৈন্য তা সহজে অতিক্রম করতে সক্ষম না হয়। হযরত সালমান রাযিয়াল্লাহু আনহু পরিখা খনন প্রসঙ্গে বলা হয় যে, তিনি প্রত্যহ পাঁচ গজ দীর্ঘ ও পাঁচ গজ গভীর– এ পরিমাণ পরিখা খনন করতেন। (মাযহারী) এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, পরিখার গভীরতা পাঁচ গজ পরিমাণ ছিল।

মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যাঃ এ যুদ্ধে মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা ছিল সর্বমোট তিন হাজার এবং ঘোড়া ছিল সর্বমোট ৩৬ টি।

(মাআরেফুল কুরআন ৭/৯৮–১০২)

(ছ) হুদায়বিয়ার সন্ধি ও বায়আতে রিদওয়ান

إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُّبِينًا (١) لِّيَغْفِرَ لَكَ اللّٰهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُّسْتَقِيْمًا (٢) وَّيَنْصُرَكَ اللّٰهُ نَصْرًا عَزِيْزًا (٣) هُوَ الَّذِيْٓ أَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ فِيْ قُلُوْبِ الْمُؤْمِنِيْنَ لِيَزْدَادُوْٓا إِيْمَانًا مَّعَ إِيْمَانِهِمْ ط وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَلِيْمًا حَكِيْمًا (٤) لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنٰتِ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَا وَيُكَفِّرَ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ ط وَكَانَ ذٰلِكَ عِنْدَ اللّٰهِ فَوْزًا عَظِيْمًا (٥) وَيُعَذِّبَ الْمُنٰفِقِيْنَ وَالْمُنٰفِقٰتِ وَالْمُشْرِكِيْنَ وَالْمُشْرِكٰتِ الظَّآنِّيْنَ بِاللّٰهِ ظَنَّ السَّوْءِ ط عَلَيْهِمْ دَآئِرَةُ السَّوْءِ ج وَغَضِبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ وَلَعَنَهُمْ وَأَعَدَّ لَهُمْ جَهَنَّمَ ط وَسَآءَتْ مَصِيْرًا (٦) وَلِلّٰهِ جُنُوْدُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا حَكِيْمًا (٧) إِنَّآ أَرْسَلْنٰكَ شَاهِدًا وَّمُبَشِّرًا وَّنَذِيْرًا

(٨) لِتُؤْمِنُوْا بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ وَتُعَزِّرُوْهُ وَتُوَقِّرُوْهُ ط وَتُسَبِّحُوْهُ بُكْرَةً
وَّاَصِيْلًا (٩) اِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُوْنَكَ اِنَّمَا يُبَايِعُوْنَ اللّٰهَ ط يَدُ اللّٰهِ فَوْقَ
اَيْدِيْهِمْ ج فَمَنْ نَّكَثَ فَاِنَّمَا يَنْكُثُ عَلٰى نَفْسِهٖ ج وَمَنْ اَوْفٰى بِمَا
عٰهَدَ عَلَيْهُ اللّٰهَ فَسَيُؤْتِيْهِ اَجْرًا عَظِيْمًا (١٠) سَيَقُوْلُ لَكَ الْمُخَلَّفُوْنَ
مِنَ الْاَعْرَابِ شَغَلَتْنَا اَمْوَالُنَا وَاَهْلُوْنَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا ج يَقُوْلُوْنَ
بِاَلْسِنَتِهِمْ مَّا لَيْسَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ ط قُلْ فَمَنْ يَّمْلِكُ لَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ
شَيْئًا اِنْ اَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا اَوْ اَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا ط بَلْ كَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ
خَبِيْرًا (١١) بَلْ ظَنَنْتُمْ اَنْ لَّنْ يَّنْقَلِبَ الرَّسُوْلُ وَالْمُؤْمِنُوْنَ اِلٰٓى
اَهْلِيْهِمْ اَبَدًا وَّزُيِّنَ ذٰلِكَ فِيْ قُلُوْبِكُمْ وَظَنَنْتُمْ ظَنَّ السَّوْءِ صلے وَكُنْتُمْ
قَوْمًا بُوْرًا (١٢) وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِهٖ فَاِنَّآ اَعْتَدْنَا لِلْكٰفِرِيْنَ
سَعِيْرًا (١٣) وَلِلّٰهِ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ ط يَغْفِرُ لِمَنْ يَّشَآءُ وَيُعَذِّبُ
مَنْ يَّشَآءُ ط وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا (١٤) سَيَقُوْلُ الْمُخَلَّفُوْنَ اِذَا
انْطَلَقْتُمْ اِلٰى مَغَانِمَ لِتَاْخُذُوْهَا ذَرُوْنَا نَتَّبِعْكُمْ ج يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّبَدِّلُوْا
كَلٰمَ اللّٰهِ ط قُلْ لَّنْ تَتَّبِعُوْنَا كَذٰلِكُمْ قَالَ اللّٰهُ مِنْ قَبْلُ ج فَسَيَقُوْلُوْنَ
بَلْ تَحْسُدُوْنَنَا ط بَلْ كَانُوْا لَا يَفْقَهُوْنَ اِلَّا قَلِيْلًا (١٥) قُلْ لِّلْمُخَلَّفِيْنَ
مِنَ الْاَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ اِلٰى قَوْمٍ اُولِيْ بَاْسٍ شَدِيْدٍ تُقَاتِلُوْنَهُمْ اَوْ
يُسْلِمُوْنَ ج فَاِنْ تُطِيْعُوْا يُؤْتِكُمُ اللّٰهُ اَجْرًا حَسَنًا ج وَاِنْ تَتَوَلَّوْا كَمَا
تَوَلَّيْتُمْ مِّنْ قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا اَلِيْمًا (١٦) لَيْسَ عَلَى الْاَعْمٰى
حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْاَعْرَجِ حَرَجٌ وَّلَا عَلَى الْمَرِيْضِ حَرَجٌ ط وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ
وَرَسُوْلَهٗ يُدْخِلْهُ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهٰرُ ج وَمَنْ يَّتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ
عَذَابًا اَلِيْمًا (١٧) لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ

تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَافِيْ قُلُوْبِهِمْ فَاَنْزَلَ السَّكِيْنَةَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابَهُمْ
فَتْحًا قَرِيْبًا (١٨) وَمَغَانِمَ كَثِيْرَةً يَّاْخُذُوْنَهَا ط وَكَانَ اللّٰهُ عَزِيْزًا
حَكِيْمًا (١٩) وَعَدَكُمُ اللّٰهُ مَغَانِمَ كَثِيْرَةً تَاْخُذُوْنَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْ هٰذِهٖ
وَكَفَّ اَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ ج وَلِتَكُوْنَ اٰيَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا
مُّسْتَقِيْمًا (٢٠) وَاُخْرٰى لَمْ تَقْدِرُوْا عَلَيْهَا قَدْ اَحَاطَ اللّٰهُ بِهَا وَكَانَ
اللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا (٢١) وَلَوْ قٰتَلَكُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَوَلَّوُا
الْاَدْبَارَ ثُمَّ لَايَجِدُوْنَ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا (٢٢) سُنَّةَ اللّٰهِ الَّتِيْ قَدْ خَلَتْ
مِنْ قَبْلُ صلے وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللّٰهِ تَبْدِيْلًا (٢٣) وَهُوَ الَّذِيْ كَفَّ
اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ وَاَيْدِيَكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ مِنْ بَعْدِ اَنْ
اَظْفَرَكُمْ عَلَيْهِمْ ط وَكَانَ اللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرًا (٢٤) هُمُ
الَّذِيْنَ كَفَرُوْا وَصَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْهَدْيَ مَعْكُوْفًا اَنْ
يَّبْلُغَ مَحِلَّهٗ ط وَلَوْ لَا رِجَالٌ مُّؤْمِنُوْنَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنٰتٌ لَّمْ تَعْلَمُوْهُمْ اَنْ
تَطَئُوْهُمْ فَتُصِيْبَكُمْ مِّنْهُمْ مَّعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ ج لِيُدْخِلَ اللّٰهُ فِيْ
رَحْمَتِهٖ مَنْ يَّشَاءُ ج لَوْ تَزَيَّلُوْا لَعَذَّبْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْهُمْ عَذَابًا
اَلِيْمًا (٢٥) اِذْ جَعَلَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا فِيْ قُلُوْبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ
الْجَاهِلِيَّةِ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلٰى رَسُوْلِهٖ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ
وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَكَانُوْا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا ط وَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ
شَيْءٍ عَلِيْمًا (٢٦) لَقَدْ صَدَقَ اللّٰهُ رَسُوْلَهُ الرُّءْيَا بِالْحَقِّ ج لَتَدْخُلُنَّ
الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ اٰمِنِيْنَ مُحَلِّقِيْنَ رُءُوْسَكُمْ وَمُقَصِّرِيْنَ
لَاتَخَافُوْنَ ط فَعَلِمَ مَالَمْ تَعْلَمُوْا فَجَعَلَ مِنْ دُوْنِ ذٰلِكَ فَتْحًا قَرِيْبًا

(٢٨) هُوَ الَّذِيْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ ط وَكَفٰى بِاللّٰهِ شَهِيْدًا (٢٨) مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ ط وَالَّذِيْنَ مَعَهٗٓ اَشِدَّآءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَآءُ بَيْنَهُمْ تَرٰهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا ز سِيْمَاهُمْ فِيْ وُجُوْهِهِمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُوْدِ ذٰلِكَ مَثَلُهُمْ فِى التَّوْرٰةِ وَمَثَلُهُمْ فِى الْاِنْجِيْلِ قف كَزَرْعٍ اَخْرَجَ شَطْاَهٗ فَاٰزَرَهٗ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوٰى عَلٰى سُوْقِهٖ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيْظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ ط وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ مِنْهُمْ مَّغْفِرَةً وَّاَجْرًا عَظِيْمًا (٢٩) (سورة الفتح ٢٩ - ١)

তরজমাঃ (১) নিশ্চয় আমি আপনার জন্যে এমন একটি বিজয় দিয়েছি, যা সুস্পষ্ট। (২) যাতে আল্লাহর আপনার অতীত ও ভবিষ্যত ত্রুটিসমূহ মার্জনা করে দেন এবং আপনার প্রতি তাঁর নি'আমত পূর্ণ করেন ও আপনাকে সরল পথে পরিচালিত করেন। (৩) এবং আপনাকে দান করেন বলিষ্ঠ সাহায্য। (৪) তিনি মুমিনদের অন্তরে প্রশান্তি নাযিল করেন, যাতে তাদের ঈমানের সাথে আরও ঈমান বেড়ে যায়। নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের বাহিনীসমূহ আল্লাহরই এবং আল্লাহ সর্বজ্ঞ, প্রজ্ঞাময়। (৫) (ঈমান এ জন্যে বেড়ে যায়,) যাতে তিনি ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারীদেরকে জান্নাতে প্রবেশ করান। যার তলদেশে নদী প্রবাহিত। সেথায় তারা চিরকাল বসবাস করবে এবং যাতে তিনি তাদের পাপ মোচন করেন। এটাই আল্লাহর কাছে মহা সাফল্য। (৬) এবং যাতে তিনি কপট বিশ্বাসী পুরুষ ও কপট বিশ্বাসিনী নারী এবং অংশীবাদী পুরুষ ও অংশীবাদিনী নারীদেরকে শাস্তি দেন। যারা আল্লাহ সম্পর্কে মন্দ ধারণা পোষণ করে। তাদের জন্য মন্দ পরিণাম। আল্লাহ তাদের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়েছেন, তাদেরকে অভিসম্পাত করেছেন এবং তাদের জন্যে জাহান্নাম প্রস্তুত রেখেছেন। তাদের প্রত্যাবর্তনস্থল অত্যন্ত মন্দ। (৭) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের বাহিনীসমূহ আল্লাহরই। আল্লাহ পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাময়। (৮) আমি আপনাকে প্রেরণ করেছি অবস্থা ব্যক্তকারীরূপে, সুসংবাদাতা ও ভয়

প্রদর্শনকারী রূপে। (৯) যাতে তোমরা আল্লাহ্ ও রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর এবং তাঁকে সাহায্য ও সম্মান কর এবং সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহ্র পবিত্রতা ঘোষণা কর। (১০) যারা আপনার কাছে আনুগত্যের শপথ করে, তারা তো আল্লাহ্র কাছে আনুগত্যের শপথ করে। আল্লাহ্র হাত তাদের হাতের উপর রয়েছে। অতএব যে শপথ ভঙ্গ করে, অতি অবশ্যই সে তা নিজের ক্ষতির জন্যেই করে এবং যে আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ করে। আল্লাহ সত্ত্বরই তাকে মহা পুরস্কার দান করবেন। (১১) মরুবাসীদের মধ্যে যারা গৃহে বসে রয়েছে, তারা আপনাকে বলবে, আমরা আমাদের ধন-সম্পদ ও পরিবার-পরিজনের কাজে ব্যস্ত ছিলাম। অতএব আমাদের পাপ মার্জনা করান। তারা মুখে এমন কথা বলবে, যা তাদের অন্তরে নেই। বলুন, আল্লাহ তোমাদের ক্ষতি অথবা উপকার সাধনের ইচ্ছা করলে কে তাঁকে বিরত রাখতে পারে? বরং তোমরা যা কর আল্লাহ্ সে বিষয় পরিপূর্ণ জ্ঞাত। (১২) বরং তোমরা ধারণা করেছিলে যে, রাসূল ও মুমিনগণ তাদের বাড়ী-ঘরে কিছুতেই ফিরে আসতে পারবে না এবং এই ধারনা তোমাদের জন্যে খুবই সুখকর ছিল। তোমরা মন্দ ধারনার বশবর্তী হয়েছিলে। তোমরা ছিলে ধ্বংসমুখী এক সম্প্রদায়। (১৩) যারা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলে বিশ্বাস করে না, আমি সে সব কাফেরদের জন্যে জ্বলন্ত অগ্নি প্রস্তুত রেখেছি। (১৪) নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের রাজত্ব আল্লাহ্রই। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। তিনি ক্ষমাশীল, পরম মেহেরবান। (১৫) তোমরা যখন যুদ্ধলব্ধ ধন-সম্পদ সংগ্রহের জন্যে যাবে, তখন যারা পশ্চাতে থেকে গিয়েছিল তারা বলবেঃ আমাদেরকেও তোমাদের সঙ্গে যেতে দাও। তারা আল্লাহ্র কালাম পরিবর্তন করতে চায়। বলুন, তোমরা কখনও আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে না। আল্লাহ্ পূর্ব থেকেই এরূপ বলে দিয়েছেন। তারা বলবে, বরং তোমরা আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করছ। পরন্তু তারা সামান্যই বুঝে। (১৬) গৃহে অবস্থানকারী মরুবাসীদেরকে বলে দিন, আগামীতে তোমরা এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতির সাথে যুদ্ধ করতে আহূত হবে। তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তারা মুসলমান হয়ে যায়। তখন যদি তোমরা নির্দেশ পালন কর, তবে আল্লাহ্ তোমাদেরকে উত্তম পুরস্কার দিবেন। আর যদি পৃষ্ঠ প্রদর্শন কর যেমন ইতিপূর্বে পৃষ্ঠ প্রদর্শন

করেছ, তবে তিনি তোমাদেকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন। (১৭) অন্ধের জন্য, খঞ্জের জন্য ও রুগ্নের জন্য কোন অপরাধ নেই এবং যে কেউ আল্লাহ ও তার রাসূলের আনুগত্য করবে তাকে তিনি জান্নাতে দাখিল করবেন। যার তলদেশে নদী প্রবাহিত হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে, তাকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন। (১৮) আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তারা বৃক্ষের নীচে আপনার কাছে শপথ করল। আল্লাহ অবগত ছিলেন যা তাদের অন্তরে ছিল। অতঃপর তিনি তাদের প্রতি প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদেরকে আসন্ন বিজয় পুরস্কার দিলেন। (১৯) এবং বিপুল পরিমাণে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ যা তারা লাভ করবে। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (২০) আল্লাহ তোমাদেরকে বিপুল পরিমাণ যুদ্ধলব্ধ সম্পদের ওয়াদা দিয়েছেন, যা তোমরা লাভ করবে। তিনি তা তোমাদের জন্য ত্বরান্বিত করবেন। তিনি তোমাদের থেকে শত্রুদের স্তব্ধ করে দিয়েছেন, যাতে এটা মুমিনদের জন্য এক নিদর্শন হয় এবং তোমাদেরকে সরল পথে পরিচালিত করেন। (২১) আরও একটি বিজয় রয়েছে, যা এখনও তোমাদের অধিকারে আসেনি। আল্লাহ তা বেষ্টন করে আছেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে ক্ষমতাবান। (২২) যদি কাফেররা তোমাদের মোকাবিলা করত, তবে অবশ্যই তারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করত। তখন তারা কোন অভিভাবক ও সাহায্যকারী পেত না। (২৩) এটাই আল্লাহর রীতি, যা পূর্ব থেকে চালু আছে। তুমি আল্লাহর রীতিতে কোন পরিবর্তন পাবে না। (২৪) তিনি মক্কা শহরে তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত তাদের থেকে নিবারিত করেছেন, তাদের উপর তোমাদেরকে বিজয়ী করার পর। তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ তা দেখেন। (২৫) তারাই তো কুফরী করেছে এবং বাধা দিয়েছে তোমাদেরকে মসজিদে হারাম থেকে এবং অবস্থানরত কুরবানীর জন্তুদেরকে যথাস্থানে পৌঁছতে। যদি মক্কায় কিছু সংখ্যক ঈমানদার পুরুষ ও ঈমানদার নারী না থাকত, যাদেরকে তোমরা জানতে না। অর্থাৎ তাদের পিষ্ট হয়ে যাওয়ার আশংকা না থাকত। অতঃপর তাদের কারণে তোমরা অজ্ঞাতসারে ক্ষতিগ্রস্থ হতে। তবে সব কিছু চুকিয়ে দেয়া হত। কিন্তু এ কারণে চুকানো হয়নি, যাতে আল্লাহ তাআলা যাকে ইচ্ছা স্বীয় রহমতে দাখিল করে নেন। যদি তারা সরে যেত, তবে আমি অবশ্যই তাদের মধ্যে যারা কাফের তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি

দিতাম। (২৬) কেননা কাফেররা তাদের অন্তরে মুর্খতা যুগের জেদ পোষণ করত। অতঃপর আল্লাহ্ তাঁর রাসূল ও মুমিনদের উপর স্বীয় প্রশান্তি নাযিল করলেন এবং তাদের জন্য সংযমের দায়িত্ব অপরিহার্য করে দিলেন। বস্তুতঃ তারাই ছিল এর অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত। আল্লাহ্ সর্ববিষয়ে সম্যক জ্ঞাত। (২৭) আল্লাহ্ তাঁর রাসূলকে সত্য স্বপ্ন দেখিয়েছেন। আল্লাহ্ চাহেন তো তোমরা অবশ্যই মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে মস্তক মুণ্ডিত অবস্থায় এবং কেশ কর্তিত অবস্থায়। তোমরা কাউকে ভয় করবে না। অতঃপর তিনি জানেন যা তোমরা জান না। এছাড়াও তিনি দিয়েছেন তোমাদেরকে একটি আসন্ন বিজয়। (২৮) তিনিই তাঁর রাসূলকে হেদায়েত ও সত্য ধর্মসহ প্রেরণ করেছেন, যাতে একে অন্য সমস্ত ধর্মের উপর জয়যুক্ত করেন। সত্য প্রতিষ্ঠাতারূপে আল্লাহ্ যথেষ্ট। (২৯) মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল এবং তাঁর সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর নিজেদের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতিশীল। আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় আপনি তাদেরকে রুকূ ও সেজদারত দেখবেন। তাদের মুখমণ্ডলে রয়েছে সেজদার চিহ্ন। তাওরাতে তাদের অবস্থা এরূপ এবং ইঞ্জিলে তাদের অবস্থা এরূপ যেমন একটি চারাগাছ যা থেকে নির্গত হয় কিশলয়, অতঃপর তা শক্ত ও মজবুত হয় এবং কাণ্ডের উপর দাঁড়ায় দৃঢ়ভাবে– চাষীকে আনন্দে আভিভূত করে। যাতে আল্লাহ তাদের দ্বারা কাফেরদের অন্তর্জালা সৃষ্টি করেন। তাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সৎকর্ম করে আল্লাহ্ তাদেরকে ক্ষমা ও মহা পুরস্কারের ওয়াদা দিয়েছেন। (ফাতাহ্ ১–২৯)

হুদায়বিয়ার ঘটনা

তাফসীর ঃ হুদায়বিয়া মক্কার বাইরে হেরেমের সীমানার সন্নিকটে অবস্থিত একটি স্থানের নাম। আজকাল এই স্থানটিকে ‘শমীসা’ বলা হয়। ঘটনাটি এই স্থানেই ঘটে।

প্রথম অংশ ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর স্বপ্ন

আবদ ইবনে হুমায়দ ইবনে জরীর বায়হাকী প্রমুখের বর্ণনা অনুযায়ী এই ঘটনার এক অংশ এই যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনায়

স্বপ্ন দেখলেন তিনি সাহাবায়ে কেরামসহ মক্কায় নির্ভয়ে ও নির্বিঘ্নে প্রবেশ করছেন এবং ইহরামের কাজ সমাপ্ত করে কেউ কেউ নিয়মানুযায়ী মাথা মুণ্ডন করেছেন, কেউ কেউ চুল কাটিয়েছেন এবং তিনি বায়তুল্লায় প্রবেশ করেছেন ও বায়তুল্লাহর চাবি তাঁর হস্তগত হয়েছে। এটা সূরায় বর্ণিত ঘটনার একটা অংশ। পয়গম্বরগণের স্বপ্ন ওহী হয়ে থাকে। তাই স্বপ্নটি যে বাস্তব রূপ লাভ করবে তা নিশ্চিত ছিল। কিন্তু স্বপ্নে এই ঘটনার কোন সন, তারিখ বা মাস নির্দিষ্ট করা হয়নি। প্রকৃতপক্ষে স্বপ্নটি মক্কা বিজয়ের সময় প্রতিফলিত হওয়ার ছিল। কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন সাহাবায়ে কেরামকে স্বপ্নের বৃত্তান্ত শুনালেন, তখন তাঁরা সবাই পরম আগ্রহের সাথে মক্কা যাওয়ার প্রস্তুতি শুরু করে দিলেন। সাহাবায়ে কেরামের প্রস্তুতি দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও ইচ্ছা করে ফেললেন। কেননা স্বপ্নে কোন বিশেষ সন অথবা মাস নির্দিষ্ট ছিল না। কাজেই এই মুহূর্তেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনাও ছিল। (বয়ানুল কুরআন)

দ্বিতীয় অংশঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবায়ে কেরাম ও মরুবাসী মুসলমানদের সাথে চলার জন্য ডাকা এবং কারও অস্বীকার করা

ইবনে সাদ প্রমুখ বর্ণনা করেন, যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবায়ে কেরাম ওমরা পালনের ইচ্ছা করলেন তখন আশংকা দেখা দিল যে, মক্কার কুরাইশরা সম্ভবতঃ বাধা দিতে পারে এবং প্রতিরক্ষার্থে যুদ্ধ বেঁধে যেতে পারে। তাই তিনি মদীনার নিকটবর্তী গ্রামবাসীকে সাথে চলার জন্য দাওয়াত দিলেন। অনেক গ্রামবাসী সাথে চলতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করল এবং বলল, মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও তাঁর সহচরগণ আমাদেরকে শক্তিশালী কুরাইশদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত করতে চায়। তাদের পরিণাম এটাই হবে যে, তারা এই সফর থেকে জীবিত ফিরে আসতে পারবে না। (মাযহারী)

তৃতীয় অংশ ঃ মক্কাভিমুখে যাত্রা

ইমাম আহমদ, বুখারী, আবু দাউদ, নাসায়ী প্রমুখের বর্ণনা অনুযায়ী রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রওয়ানা হওয়ার পূর্বে গোসল করতঃ নতুন পোশাক পরিধান করলেন এবং স্বীয় উষ্ট্রী কাসওয়ার পৃষ্ঠে সওয়ার হলেন। তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমাকে সঙ্গে নিলেন এবং সাথে মুহাজির, আনসার ও গ্রামবাসী মুসলমানদের একটি বিরাট দল রওনা হল। অধিকাংশ রেওয়ায়েতে তাদের সংখ্যা চৌদ্দশত বর্ণনা করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্বপ্নের কারণে এই মুহূর্তেই মক্কা বিজিত হয়ে যাওয়ার ব্যাপারে তাদের কারও মনে কোনরূপ সন্দেহ ছিল না। অথচ তরবারী ব্যতীত তাদের কাছে অন্য কোন অস্ত্র ছিল না। তিনি সাহাবায়ে কেরাম সহ যিলকদ মাসের শুরুতে সোমবার দিন রওনা হন এবং যুলহুলায়ফায় পৌঁছে ইহরাম বাঁধেন। (মাযহারী)

চতুর্থ অংশ ঃ মক্কাবাসীদের মোকাবিলায় প্রস্তুতি

রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বড় দল নিয়ে মক্কা রওনা হয়ে গেছেন। এই খবর যখন মক্কাবাসীদের কাছে পৌঁছল। তখন তারা পরামর্শ সভায় একত্রিত হল এবং বললঃ মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সহচরগণ সহ ওমরার জন্যে আগমন করেছেন। যদি আমরা তাকে নির্বিঘ্নে মক্কায় প্রবেশ করতে দিই, তবে সমগ্র আরবে একথা ছড়িয়ে পড়বে যে, সে আমাদেরকে পরাজিত করে মক্কায় পৌঁছে গেছে। অথচ আমাদের ও তার মধ্যে একাধিক যুদ্ধ হয়ে গেছে। অতঃপর তারা শপথ করে বললঃ আমরা কখনো এরূপ হতে দেব না। সেমতে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বাধা দেয়ার জন্যে খালেদ ইবনে ওলীদের নেতৃত্বে একটি দল মক্কার বাইরে 'কুরাউল-গামীম' নামক স্থানে প্রেরণ করা হল। তারা আশেপাশের গ্রামবাসীদেরকেও দলে ভিড়িয়ে নিল এবং তায়েফের বনী সকীক গোত্রও তাদের সহযোগী হয়ে গেল। তারা বালদাহ নামক স্থানে শিবির স্থাপন করল। অতঃপর তারা সবাই পরস্পরে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মক্কা প্রবেশে বাধা দেয়ার এবং তাঁর মোকাবিলায় যুদ্ধ করার শপথ করল।

সংবাদ পৌঁছানোর একটি অভাবনীয় সরল পদ্ধতি

তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অবস্থা সম্পর্কে অবহিত থাকার জন্য এই ব্যবস্থা গ্রহণ করে যে, বালদাহ থেকে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পৌঁছার স্থান পর্যন্ত প্রত্যেকটি পাহাড়ের শৃঙ্গে কিছু লোক মোতায়েন করে দেয়– যাতে মুসলমানদের সম্পূর্ণ গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করে তাদের নিকটবর্তী পাহাড়ওয়ালা উচ্চস্বরে দ্বিতীয় পাহাড়ওয়ালা পর্যন্ত, সে তৃতীয় পর্যন্ত এবং সে চতুর্থ পর্যন্ত সংবাদ পৌঁছিয়ে দেয়। এভাবে কয়েক মিনিটের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গতিবিধি সম্পর্কে বালদাহ অবস্থানকারীরা অবহিত হয়ে যেত।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংবাদ প্রেরক

মক্কাবাসীদের অবস্থা গোপনে পর্যবেক্ষণ করে সংবাদ প্রেরণের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিশর ইবনে সুফিয়ানকে আগেই মক্কা পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি মক্কা থেকে ফিরে এসে মক্কাবাসীদের উপরোক্ত সামরিক প্রস্তুতি ও পূর্ণ শক্তিতে বাধা দানের সংকল্পের কথা অবহিত করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ কুরাইশদের জন্য আক্ষেপ, কয়েকটি যুদ্ধে ক্ষত-বিক্ষত হওয়া সত্ত্বেও তাদের রণোদনা এতটুকু দমেনি। আমাকে ও আরবের অন্যান্য গোত্রকে স্বাধীন ছেড়ে দিয়ে তারা নিজেরা সরে বসে থাকলেই পারত। যদি আরব গোত্র সমূহ আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধে বিজয়ী হয়ে যেত তবে তাদের মনোবাঞ্ছা ঘরে বসেই হাসিল হয়ে যেত। পক্ষান্তরে যদি আমি বিজয়ী হতাম, তবে হয় তারাও মুসলমান হয়ে যেত, না হয় যুদ্ধ করার ইচ্ছা থাকলেও তখন সবল ও সতেজ অবস্থায় আমার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারত। জানিনা কুরাইশরা কি মনে

করছে। আল্লাহর কসম! তিনি আমাকে যে নির্দেশসহ প্রেরণ করেছেন, তার জন্য আমি একাকী হলেও চিরকাল ওদের বিরুদ্ধে এ জিহাদ করতে থাকব।

পঞ্চম অংশঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উষ্ট্রীর পথিমধ্যে বসে যাওয়া

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সবাইকে একত্রিত করে ভাষণ দিলেন এবং পরামর্শ চাইলেন যে, এখন আমাদেরকে এখান থেকেই তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করে দেয়া উচিত, না আমরা বায়তুল্লাহর দিকে অগ্রসর হব এবং কেউ বাধা দিলে তার সাথে যুদ্ধ করব? হযরত আবু বকর সিদ্দীক ও অন্যান্য সাহাবী বললেনঃ আপনি বায়তুল্লাহর উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছেন। কারও সাথে যুদ্ধ করার জন্য বের হননি। কাজেই আপনি উদ্দেশ্যে অটল থাকুন। হাঁ, যদি কেউ আমাদেরকে মক্কা গমনে বাধা দেয়, তবে আমরা তার সাথে যুদ্ধ করব। এরপর হযরত মেকদাদ ইবনে আসওয়াদ দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা বনী ইসরাঈলের মত নই যে আপনাকে বলে দিব– اِذْهَبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا اِنَّا هٰهُنَا قَاعِدُوْنَ (আপনি ও আপনার পালনকর্তা যান এবং যুদ্ধ করুন। আমরা তো এখানেই বসলাম) বরং আমরা সর্বাবস্থায় আপনার সঙ্গে থেকে যুদ্ধ করব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একথা শুনে বললেনঃ ব্যস, এখন আল্লাহর নাম নিয়ে মক্কাভিমুখে রওনা হও। যখন তিনি মক্কার নিকট পৌছলেন এবং খালেদ ইবনে ওলীদ ও তার সঙ্গীরা তাঁকে মক্কার দিকে অগ্রসর হতে দেখল, তখন তিনি সৈন্যদেরকে কেবলামুখী সারিবদ্ধ করে দাঁড় করিয়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওব্বাদ ইবনে বিশরকে একদল সৈন্যের আমীর নিযুক্ত করে সম্মুখে প্রেরণ করলেন। তিনি খালেদ ইবনে ওলীদের বাহিনীর বিপরীত দিকে সৈন্য সমাবেশ করলেন। এমতাবস্থায় যোহরের নামাযের সময় হয়ে গেল। হযরত বেলাল রাযিয়াল্লাহু আনহু আযান দিলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সকলকে নিয়ে নামায আদায় করলেন। খালেদ ইবনে ওলীদ ও তার সিপাহীরা এই দৃশ্য দেখতে লাগল।

পরে খালেদ ইবনে ওলীদ বলেনঃ আমরা চমৎকার সুযোগ নষ্ট করে দিয়েছি। তারা যখন নামাযরত ছিল, তখনই তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত ছিল। যাক, অপেক্ষা কর তাদের আরও নামায আসবে। কিন্তু ইতিমধ্যে জিবরাঈল (আঃ) সালাতুল খওফ তথা আপদকালীন নামাযের বিধান নিয়ে উপস্থিত হলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শত্রুদের দুরভিসন্ধি সম্পর্কে জ্ঞাত করিয়ে নামাযের সময় সৈন্যদেরকে দুই ভাগে ভাগ করার পদ্ধতি বলে দিলেন। ফলে তাঁরা শত্রুপক্ষের অনিষ্ঠ থেকে নিরাপদ হয়ে যান।

ষষ্ঠ অংশ ঃ হুদায়বিয়ায় একটি মুজেযা

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হুদায়বিয়ার নিকটবর্তী হন, তখন তাঁর উষ্ট্রীর সামনের পা পিছনে যায় এবং উষ্ট্রী বসে পড়ে। সাহাবায়ে কেরাম চেষ্টা করেও উষ্ট্রীকে উঠাতে পারলেন না। তখন সবাই বলতে লাগলেন, কাসওয়া অবাধ্য হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ কাসওয়ার কোন কসুর নেই। তার এরূপ অভ্যাস কখনও ছিল না। তাকে তো সেই আল্লাহ বাধা দিচ্ছেন, যিনি আসহাবে ফীল তথা হস্তী বাহিনীকে বাধা দিয়েছিলেন। –রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্ভবতঃ তখন বুঝতে পেরেছিলেন যে, স্বপ্নে দেখা ঘটনা বাস্তবায়িত হওয়ার সময় এটা নয়।) তিনি বললেন, যার হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ, সেই সত্ত্বার কসম! আজিকার দিনে আল্লাহর নির্দেশাবলীর প্রতি সম্মান প্রদর্শন মূলক যে কোন কথা কুরাইশরা আমাকে বলবে, আমি অবশ্যই তা মেনে নেব। এরপর তিনি উষ্ট্রীকে একটি আওয়াজ দিতেই উষ্ট্রী উঠে দাঁড়াল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খালেদ ইবনে ওলীদের দিক থেকে সরে গিয়ে হুদায়বিয়ার অপর প্রান্তে অবস্থান গ্রহণ করলেন। সেখানে পানি খুবই কম ছিল। পানির জায়গা খালেদ ইবনে ওলীদ করায়ত্ত করে নিয়েছিল। মুসলানদের অংশে একটি মাত্র কুপ ছিল। যাতে অল্প পানি চুয়ে চুয়ে কুপে পড়ত। সেমতে এই কুপের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের একটি মুজেযা প্রকাশ পেল। তিনি কুপের মধ্যে কুলি করলেন এবং একটি তীর কুপের ভিতরে গেড়ে দিতে বললেন। ফলে কুপের পানি ফুলে ফেঁপে কুপের প্রাচীর পর্যন্ত পৌঁছে গেল। অতঃপর পানির কোন অভাব হলো না।

সপ্তম অংশ ঃ প্রতিনিধিদের মধ্যস্থতায় মক্কাবাসীদের সাথে আলাপ-আলোচনা

অতঃপর প্রতিনিধিদের মাধ্যমে মক্কাবাসীদের সাথে আলাপ-আলোচনা শুরু হল। প্রথমে বুদায়েল ইবনে ওয়ারাকা সঙ্গীগণসহ আগমন করল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে শুভেচ্ছার ভঙ্গিতে বললঃ কুরাইশরা পূর্ণ শক্তি সহকারে মোকাবিলা করার জন্য এসে গেছে এবং পানির জায়গা দখল করে নিয়েছে। তারা কিছুতেই আপনাকে মক্কায় প্রবেশ করতে দেবে না। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, আমরা কারও সাথে যুদ্ধ করতে আসিনি। তবে কেউ যদি আমাদেরকে ওমরা পালন করতে বাধা দেয়, তবে আমরা যুদ্ধ করব। অতঃপর তিনি ইতিপূর্বে বিশরকে যা বলেছিলেন, তারই পুনরাবৃত্তি করে বললেনঃ কুরাইশদেরকে কয়েকটি যুদ্ধ দুর্বল করে দিয়েছে। তারা ইচ্ছা করলে নির্দিষ্ট মেয়াদের জন্য আমাদের সাথে সন্ধি করে নিতে পারে। যাতে তারা নির্বিঘ্নে প্রস্তুতি গ্রহণের সুযোগ পায়। এরপর আমাদেরকে অবশিষ্ট আরবদের মোকাবিলায় ছেড়ে দিতে পারে। যদি তারা বিজয়ী হয়, তবে কুরাইশদের মনোবাঞ্ছা ঘরে বসেই পূর্ণ হয়ে যাবে। পক্ষান্তরে যদি আমরা বিজয়ী হই, তবে তারা হয় মুসলমান হয়ে যাবে, না হয় আমাদের বিরুদ্ধে নব বলে যুদ্ধ করবে। কুরাইশরা যদি এতে সম্মত না হয়, তবে আল্লাহর কসম! আমি একাকী হলেও ইসলামের ব্যাপারে তাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে যাব। কুরাইশদেরকে এই পয়গাম পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে বুদায়েল ফিরে গেল। সেখানে পৌঁছার পর কিছু লোক তার কথা শুনতেই চাইল না। তারা যুদ্ধের নেশায় মত্ত হয়ে রইল। অতঃপর গোত্র সরদার ওরওয়া ইবনে মাসউদ বলল, বুদায়েল কি বলতে চায় তা শোনা দরকার।

কথাবার্তা শুনে ওরওয়া কুরাইশ সরদারকে বললঃ মুহাম্মাদ যা প্রস্তাব দিয়েছে তা সঠিক। এটা মেনে নাও এবং আমাকে তার সাথে কথা বলার অনুমতি দাও। সেমতে দ্বিতীয়বার ওরওয়া ইবনে মাসউদ আলাপ-আলোচনার জন্য উপস্থিত হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আরজ করল, আপনি যদি স্বগোত্র কুরাইশকে নিশ্চিহ্নই করে দেন, তবে এটা কি করে ভাল কথা হবে? দুনিয়াতে আপনি কি কখনো শুনেছেন যে, কোন ব্যক্তি তার স্বজাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছে? অতঃপর সাহাবায়ে কেরামের সাথে তার নরম গরম কথাবার্তা হতে থাকে। ইতিমধ্যেই সে সাহাবায়ে কেরামের এই আত্মোৎসর্গমূলক অবস্থা প্রত্যক্ষ করল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থুথু ফেললে তারা তা হাতে নিয়ে নিজ নিজ মুখমণ্ডলে মালিশ করে। তিনি ওযু করলে সাহাবায়ে কেরাম ওযুর পানির উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং মুখমণ্ডলে মালিশ করে। তিনি কথা বললে সবাই নিশ্চুপ হয়ে যায়। ওরওয়া ফিরে গিয়ে কুরাইশ সরদারদের কাছে বর্ণনা করল, আমি কায়সার ও কেসরার ন্যায় বড় বড় রাজকীয় দরবারে গমন করেছি এবং নাজ্জাশীর কাছে গিয়েছি। কিন্তু আল্লাহর কসম! আমি এমন কোন রাজা-বাদশাহ দেখিনি, যার জাতি তার প্রতি এতটুকু আত্মোৎসর্গকারী, যতটুকু মুহাম্মাদের প্রতি তার সহচরগণ আত্মোৎসর্গকারী। মুহাম্মাদের কথা সঠিক। আমার অভিমত এই যে, তোমরা তার প্রস্তাব মেনে নাও। কিন্তু কুরাইশরা বলে দিল আমরা তার প্রস্তাব মেনে নিতে পারি না। তাকে এ বছর ফিরে যেতে হবে এবং পরবর্তী বছরে এসে ওমরা পালন করতে পারবে। আমরা এ ছাড়া অন্য কিছু মানিনা। যখন ওরওয়ার কথায় কর্ণপাত করা হল না, তখন সে তার দল নিয়ে চলে গেল। এরপর জনৈক গ্রাম্য সরদার জলীম ইবনে আলকামা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে আগমন করল। সাহাবায়ে কেরামকে ইহরাম অবস্থায় কুরবানীর জন্তুসহ দেখে সেও ফিরে গিয়ে স্বজাতিকে বুঝাতে চাইল যে, তারা বায়তুল্লাহর ওমরা পালন করতে এসেছে। তাদেরকে বাধা দেয়া উচিত নয়। যখন কেউ তার কথা শুনল না, তখন সেও তার দল নিয়ে চলে গেল। অতঃপর একজন চতুর্থ ব্যক্তি আলাপ-আলোচনার জন্য আগমন

করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকেও সেই কথাই বললেন, যা ইতিপূর্বে বুদায়েল ও ওরওয়াকে বলেছিলেন। সে ফিরে গিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জওয়াব কুরাইশদেরকে শুনিয়ে দিল।

অষ্টম অংশঃ হযরত উসমান (রাযিঃ)কে পয়গামসহ প্রেরণ

ইমাম বায়হাকী হযরত ওরওয়া থেকে বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন হুদায়বিয়ায় পৌঁছে অবস্থান গ্রহন করলেন, তখন কুরাইশরা ঘাবড়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছে নিজের কোন লোক পাঠিয়ে একথা বলে দিতে চাইলেন যে, আমরা যুদ্ধ করতে নয়, ওমরাহ্ পালন করতে এসেছি। অতএব আমাদের বাধা দিও না। এ কাজের জন্যে তিনি হযরত উমর রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ডাকলেন। তিনি বললেনঃ কুরাইশরা আমার ঘোর শত্রু। কারণ তারা আমার কঠোরতার বিষয়ে অবগত আছে। এছাড়া আমার গোত্রের এমন কোন লোক মক্কায় নেই, যে আমাকে সাহায্য করতে পারে। তাই আমি আপনার কাছে এমন একজন লোকের নাম প্রস্তাব করছি, যিনি মক্কায় গোত্রগত কারণে বিশেষ শক্তি ও মর্যাদার অধিকারী। তিনি হলেন হযরত উসমান ইবনে আফফান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে এ কাজের আদেশ দিয়ে পাঠিয়ে দিলেন। তাঁকে আরও বলে দিলেন যে, যেসব মুসলমান দুর্বল পুরুষ ও নারী মক্কা থেকে হিজরত করতে সক্ষম হয়নি এবং বাধা-বিপত্তির সম্মুখীন আছে। তাদের কাছে যেয়ে সান্ত্বনা দিবে যে, তোমরা অস্থির হয়ো না। ইনশাআল্লাহ্ মক্কা বিজিত হয়ে তোমাদের বিপদাপদ দূর হওয়ার সময় নিকটবর্তী। হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু বালদাহে অবস্থানকারী কুরাইশ বাহিনীর কাছে পৌঁছলেন এবং তাদেরকে সেই পয়গাম শুনিয়ে দিলেনঃ যা ইতিপূর্বে বুদায়েল ও ওরওয়া ইবনে মাসউদকে শুনানো হয়েছিল। তারা বলল, আমরা পয়গাম শুনলাম। আপনি ফিরে গিয়ে বলে দিন যে, এটা কিছুতেই সম্ভবপর নয়। তাদের জওয়াব শুনে হযরত উসমান

রাযিয়াল্লাহু আনহু যখন মক্কার দিকে রওনা হলেন, তখন পথিমধ্যে আবান ইবনে সাঈদের সাথে দেখা হলো। আবান তাঁকে পেয়ে খুবই আনন্দিত হল এবং নিজ আশ্রয়ে নিয়ে বললঃ আপনি মক্কায় পয়গাম নিয়ে যেখানে ইচ্ছা যেতে পারেন। এ ব্যাপারে আপনি মোটেও চিন্তা করবেন না। অতঃপর নিজের অশ্বে হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে আরোহন করিয়ে মক্কায় প্রবেশ করল। আবানের গোত্র বনু-সাঈদ মক্কায় অসাধারণ প্রভাব-প্রতিপত্তির অধিকারী ছিল। হযরত ওসমান রাযিয়াল্লাহ আনহু এক একজন সরদারের কাছে পৌঁছলেন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়গাম পৌঁছালেন। কিন্তু সবাই তা প্রত্যাখ্যান করল। অতঃপর হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু দুর্বল ও অক্ষম মুসলমানদের সাথে সাক্ষাৎ করলেন এবং তাদের কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পয়গাম পৌঁছালেন। তারা খুবই আনন্দিত হল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম বলল, পয়গাম পৌঁছানো সমাপ্ত হলে মক্কাবাসীরা হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বলল আপনি ইচ্ছা করলে তওয়াফ করতে পারেন। হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহ আনহু বললেনঃ আমি তওয়াফ করতে পারি না, যে পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তওয়াফ না করেন। হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু মক্কায় তিন দিন অবস্থান করেন এবং কুরাইশদের রাজী করানোর প্রচেষ্টা চালান।

নবম অংশ ঃ মক্কাবাসী ও মুসলমানদের মধ্যে সংঘর্ষ এবং মক্কাবাসীদের সত্তর জনের গ্রেফতারী

ইতিমধ্যে কুরাইশরা তাদের পঞ্চাশ জন লোককে রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌঁছে সুযোগ বুঝে তাঁকে হত্যা করার জন্য নিযুক্ত করল। তারা সুযোগের অপেক্ষায়ই ছিল। এমতাবস্থায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হেফাযত ও দেখাশুনায় নিযুক্ত হযরত মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা তাদের সবাইকে গ্রেফতার করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে উপস্থিত করলেন। অপরদিকে হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু মক্কায় ছিলেন এবং তাঁর সাথে আরও প্রায় দশ জন

মুসলমান মক্কা পৌঁছেছিলেন। কুরাইশরা তাদের পঞ্চাশ জনের গ্রেফতারীর সংবাদ শুনে হযরত উসমান সহ সব মুসলমানকে আটক করল। এতদ্ব্যতীত কুরাইশদের একদল সৈন্য মুসলমান সৈন্যবাহিনীর দিকে অগ্রসর হয়ে তাদের প্রতি তীর ও প্রস্তর নিক্ষেপ করল। এতে একজন সাহাবী ইবনে যনীম শহীদ হলেন। মুসলমানরা কুরাইশদের দশজন অশ্বারোহীকে গ্রেফতার করে নিল। অপর পক্ষে হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুকে হত্যা করা হয়েছে বলেও গুযব ছড়িয়ে পড়ল।

দশম অংশ ঃ বায়আতে রিদওয়ানের ঘটনা

হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহুর হত্যাকাণ্ডের সংবাদ শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে একটি বৃক্ষের নীচে একত্রিত করলেন, যাতে সবাই জিহাদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হাতে বায়আত করে। সকলেই তাঁর হাতে বায়আত করলেন। এই সূরায় বায়আতের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। সহীহ হাদীসসমূহে এই বায়আতে অংশগ্রহণকারীদের অসাধারণ ফযীলত বর্ণিত হয়েছে। হযরত উসমান রাযিয়াল্লাহু আনহু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নির্দেশে মক্কা গমন করেছিলেন। তাই তাঁর পক্ষ থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের এক হাতের উপর অপর হাত রেখে বললেনঃ এটা উসমানের বায়আত। তিনি নিজের হাতকেই উসমানের হাত গণ্য করে বায়আত করলেন। এই বিশেষ ফযীলত হযরত উসমানেরই বৈশিষ্ট্য।

একাদশ অংশ ঃ হুদায়বিয়ার ঘটনা

অপরদিকে মক্কাবাসীদের মনে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের প্রতি ভয়-ভীতি সঞ্চার করে দিলেন। তারা স্বয়ং সন্ধি স্থাপনে উদ্যোগী হয়ে সুহাইল ইবনে আমর হুয়ায়তাব ইবনে আবদুল উযযা ও মুকরিম ইবনে হিফসকে ওজর পেশ করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রেরণ করল। তাদের মধ্যে প্রথমোক্ত দুইজন পরে মুসলমান

হয়েছিল। সুহাইল ইবনে আমর এসে আরয করলঃ হে মুহাম্মাদ! হযরত উসমান ও তাঁর সঙ্গীদের হত্যা সম্পর্কিত যে সংবাদ আপনার কাছে পৌঁছেছে, তা সম্পূর্ণ মিথ্যা। আপনি আমাদের বন্দীদেরকে মুক্ত করে দিন। আমরাও তাদের আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাফের বন্দীদেরকে মুক্ত করে দিলেন। মুসনাদে আহমদ ও মুসলিমে হযরত আনাস রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত আছে যে, এই সুরার هُوَ الَّذِىْ كَفَّ اَيْدِيَهُمْ عَنْكُمْ আয়াতটি এই ঘটনা সম্পর্কেই অবতীর্ণ হয়েছে। অতঃপর সুহাইল ও তার সঙ্গীরা ফিরে গিয়ে বায়আতে রিদওয়ানে সাহাবায়ে কেরামের প্রাণ চাঞ্চল্য ও আত্মনিবেদনের অভূতপূর্ভ অবস্থা কুরাইশদের সামনে বর্ণনা করল। দূতদের মুখে এসব অবস্থা শুনে শীর্ষস্থানীয় কুরাইশ নেতৃবৃন্দ পরস্পরে বললঃ এখন মুহাম্মদের সাথে এই শর্তে সন্ধি করে নেয়াই আমাদের পক্ষে উত্তম যে, তিনি এ বছর ফিরে যাবেন, যাতে সমগ্র আরবে একথা খ্যাত না হয়ে পড়ে যে, আমাদের বাধা দান সত্ত্বেও তারা জোরপূর্বক মক্কায় প্রবেশ করেছে এবং পরবর্তী বছর ওমরা করার জন্যে আগমন করবেন ও তিন দিন মক্কায় অবস্থান করবেন। সেমতে এই সুহাইল ইবনে আমরই এই পয়গাম নিয়ে পুণরায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হল। তিনি সুহাইলকে দেখামাত্রই বললেনঃ মনে হয় মক্কাবাসীরা সন্ধি স্থাপনে সম্মত হয়েছে। তাই সুহাইলকে আবার প্রেরণ করেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসে গেলেন এবং ওব্বাদ ইবনে বিশর ও মাসলামা অস্ত্র সজ্জিত হয়ে তাঁর কাছে দাঁড়িয়ে গেলেন। সুহাইল উপস্থিত হয়ে সসম্ভ্রমে তাঁর সামনে বসে গেল এবং কুরাইশদের পয়গাম পৌঁছে দিল। সাহাবায়ে কেরাম তখন ওমরা না করে ইহরাম খুলে ফেলতে সম্মত ছিলেন না। তাঁরা সুহাইলের সাথে কঠোর ভাষায় কথাবার্তা বললেন। সুহাইলের কণ্ঠ কখনও উচ্চ এবং কখনও নম্র হল। ওব্বাদ সুহাইলকে শাসিয়ে বললেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে উচ্চ স্বরে কথা বলো না। দীর্ঘ আলাপ-আলোচনার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশদের শর্ত মেনে সন্ধি করতে সম্মত হলেন। সুহাইল বললঃ আসুন, আমি নিজের ও আপনার মধ্যকার সন্ধি পত্র লিপিবদ্ধ করি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে ডাকলেন এবং বললেন, লিখ "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম"। সুহাইল এখান থেকেই বিতর্ক শুরু করে বললঃ রাহমান ও রাহীম শব্দ আমাদের বাক পদ্ধতিতে নেই। আপনি এখানে সেই শব্দই লিখেন, যা পূর্বে লিখতেন। অর্থাৎ 'বিইসমিকা আল্লাহুমা'। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাও মেনে নিলেন এবং হযরত আলীকে তদ্রূপই লিখতে বললেন। এরপর তিনি হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বললেন, লিখ। এই অঙ্গীকারনামা মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পাদন করছেন। সুহাইল এতেও আপত্তি জানিয়ে বললঃ যদি আমরা আপনাকে আল্লাহর রাসূল স্বীকারই করতাম, তবে কখনও বায়তুল্লাহ্ থেকে বাধা দান করতাম না। সন্ধি পত্রে কোন এক পক্ষের বিশ্বাসের বিপরীত কোন শব্দ থাকা উচিত নয়। আপনি শুধু মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ লিপিবদ্ধ করান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাও মেনে নিয়ে হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুকে বললেনঃ যা লিখেছ তা কেটে ফেল এবং মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ লিখ। হযরত আলী আনুগত্যের মূর্ত প্রতীক হওয়া সত্ত্বেও আরয করলেনঃ আমি আপনার নাম কেটে দিতে পারব না। উপস্থিত সাহাবীদের মধ্যে ওসায়দ ইবনে হুযায়র ও সাদ ইবনে ওবাদা দৌড়ে এসে হযরত আলী রাযিয়াল্লাহু আনহুর হাত ধরে ফেললেন এবং বললেনঃ কাটবেন না এবং মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত আর কিছুই লিখবেন না। যদি তারা না মানে, তবে আমাদের ও তাদের মধ্যে তরবারীই ফায়সালা করবে। চতুর্দিক থেকে আরও কিছু আওয়াজ উচ্চারিত হল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সন্ধি পত্রটি নিজের হাতে নিয়ে নিলেন এবং নিরক্ষর হওয়া ও লেখার অভ্যাস না থাকা সত্ত্বেও স্বহস্তে একথাগুলো লিখে দিলেনঃ

هذا ما قضى محمد بن عبد الله وسهيل بن عمرو اصلح

على وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن فيه الناس ويكف بعضهم عن بعض

অর্থাৎ এই চুক্তি মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ও সুহাইল ইবনে আমর দশ বছর পর্যন্ত 'যুদ্ধ নয়' সম্পর্কে সম্পাদন করেছেন। এই সময়ের মধ্যে সবাই নিরাপদ থাকবে এবং একে অপরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা থেকে বিরত থাকবে।

অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেনঃ আমাদের একটি শর্ত এই যে, আপাততঃ আমাদেরকে তওয়াফ করতে দিতে হবে। সুহাইল বলল, আল্লাহর কসম! এটা হতে পারে না। শেষ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাও মেনে নিলেন। এরপর সুহাইল নিজের একটি শর্ত এই মর্মে লিপিবদ্ধ করল যে, মক্কাবাসীদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি তার অভিভাবকের অনুমতি ব্যতিরেকে আপনার কাছে আগমন করবে, তাকে আপনি ফেরত দেবেন যদিও সে আপনার ধর্মাবলম্বী হয়। এতে সাধারণ মুসলমানদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদের ধ্বনি উত্থিত হল। তারা বললঃ সুবহানাল্লাহ! আমরা আমাদের মুসলমান ভাইকে মুশরিকদের হাতে ফিরিয়ে দেব– এটা কিরূপে সম্ভবপর? কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই শর্তও মেনে নিলেন এবং বললেন, আমাদের কোন ব্যক্তি যদি তাদের কাছে যায়, তবে তাকে আল্লাহ তাআলা আমাদের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দেন। তার জন্য আমরা চিন্তা করব কেন? তাদের কোন ব্যক্তি আমাদের কাছে আগমন করলে আমরা যদি তাকে ফিরিয়েও দেই, তবে আল্লাহ তাআলা তার জন্য সহজ পথ বের করে দিবেন।

হযরত বারা রাযিয়াল্লাহু আনহু এই সন্ধির সারমর্মে তিনটি শর্ত বর্ণনা করেছেনঃ (এক) তাদের কোন লোক আমাদের কাছে আসলে আমরা তাকে ফিরিয়ে দেব। (২) আমাদের কোন লোক তাদের কাছে চলে গেলে তারা ফেরত দিবে না এবং (তিন) আমরা আগামী বছর ওমরার জন্য আগমন করব। তিন দিন মক্কায় অবস্থান করব এবং অধিক অস্ত্র নিয়ে আসবো না। পরিশেষে লেখা হল এই অঙ্গীকারনামা মক্কাবাসী ও মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহর

মধ্যে একটি সংরক্ষিত দলীল। কেউ এর বিরুদ্ধাচরণ করবে না। অবশিষ্ট আরববাসীগণ স্বাধীন। যার মনে চাইবে মুহাম্মদের অঙ্গীকারে দাখিল হবে এবং যার মনে চাইবে কুরাইশদের অঙ্গীকারে দাখিল হবে। একথা শুনে খুযাআ গোত্র লাফিয়ে উঠল এবং বললঃ আমরা মুহাম্মদের অঙ্গীকারে দাখিল হচ্ছি। আর বনু বকর সামনে অগ্রসর হয়ে বলল, আমরা কুরাইশদের অঙ্গীকারে দাখিল হচ্ছি। (মাআরেফুল কুরআন ৮/৪৬-৫৫)

(জ) বনী নযীরের যুদ্ধ

ইরশাদ হয়েছেঃ

هُوَ الَّذِيْٓ اَخْرَجَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ اَهْلِ الْكِتٰبِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِاَوَّلِ الْحَشْرِ ط مَاظَنَنْتُمْ اَنْ يَخْرُجُوْا وَظَنُّوْٓا اَنَّهُمْ مَّانِعَتُهُمْ حُصُوْنُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ فَاَتٰهُمُ اللّٰهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوْا ق وَقَذَفَ فِىْ قُلُوْبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُوْنَ بُيُوْتَهُمْ بِاَيْدِيْهِمْ وَاَيْدِى الْمُؤْمِنِيْنَ ق فَاعْتَبِرُوْا يٰاُولِى الْاَبْصَارِ (٢) وَلَوْ لَا اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمْ فِى الدُّنْيَا ط وَلَهُمْ فِى الْاٰخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ (٣) ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ شَآقُّوا اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ج وَمَنْ يُّشَاقِّ اللّٰهَ فَاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ (٤) مَا قَطَعْتُمْ مِّنْ لِّيْنَةٍ اَوْ تَرَكْتُمُوْهَا قَائِمَةً عَلٰى اُصُوْلِهَا فَبِاِذْنِ اللّٰهِ وَلِيُخْزِىَ الْفٰسِقِيْنَ (٥) وَمَا اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَا اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ط وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ (٦) (سورة الحشر ٢-٦)

তরজমাঃ (২) তিনিই কিতাবধারীদের মধ্যে যারা কাফের, তাদেরকে প্রথমবার একত্রিত করে তাদের বাড়ী-ঘর থেকে বহিষ্কার করেছেন। তোমরা ধারণাও করতে পারনি যে, তারা বের হবে এবং তারা মনে করেছিল যে,

তাদের দুর্গগুলো তাদেরকে আল্লাহর কবল থেকে রক্ষা করবে। অতঃপর আল্লাহর শাস্তি তাদের উপর এমন দিক থেকে আসল, যার কল্পনাও তারা করেনি। আল্লাহ্ তাদের অন্তরে ত্রাস সঞ্চার করে দিলেন। তারা তাদের বাড়ী-ঘর নিজেদের হাতে এবং মুসলমানদের হাতে ধ্বংস করছিল। অতএব হে চক্ষুস্মান ব্যক্তিগণ! তোমরা শিক্ষা গ্রহণ কর। (৩) আল্লাহ্ যদি তাদের জন্য নির্বাসন অবধারিত না করতেন, তবে তাদেরকে দুনিয়াতে শাস্তি দিতেন। আর পরকালে তাদের জন্য রয়েছে জাহান্নামের আযাব। (৪) এটা এ কারণে যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করেছে। যে আল্লাহর বিরুদ্ধাচরণ করে, (তার জানা উচিত যে,) আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা। (৫) তোমরা যে কিছু কিছু খেজুর বৃক্ষ কেটে দিয়েছ এবং কতক না কেটে ছেড়ে দিয়েছ। তা তো আল্লাহরই আদেশে এবং যাতে তিনি অবাধ্যদেরকে লাঞ্ছিত করেন। (৬) আল্লাহ তাদের কাছ থেকে তাঁর রাসূলকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, তজ্জন্যে তোমরা ঘোড়ায় কিংবা উটে চড়ে যুদ্ধ করনি, কিন্তু আল্লাহ যার উপর ইচ্ছা তাঁর রাসূলগণকে প্রাধান্য দান করেন। আল্লাহ্ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। (হাশর ২-৬)

বনু নযীর গোত্রের ইতিহাস

তাফসীর ঃ বনু-নযীর হযরত হারূন (আঃ)-এর সন্তান-সন্ততিদের মধ্যে একটি ইয়াহুদী গোত্র। তাদের পিতৃপুরুষগণ তাওরাতের পণ্ডিত ছিলেন। তাওরাতে খাতামুল আম্বিয়া মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সংবাদ, আকার-অবয়ব ও আলামত বর্ণিত আছে এবং তাঁর মদীনার হিজরতের কথাও উল্লেখিত আছে।

এই পরিবার শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যে থাকার আশায় সিরিয়া থেকে মদীনায় স্থানান্তরিত হয়েছিল। তাদের বর্তমান লোকদের মধ্যেও কিছু সংখ্যক তাওরাতের পণ্ডিত ছিল এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মদীনায় আগমনের পর তাঁকে আলামত দেখে চিনেও নিয়েছিল যে, ইনিই শেষ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। কিন্তু তাদের ধারণা ছিল যে, শেষ নবী হযরত হারূন (আঃ)-এর বংশধরদের

মধ্যে তাদের পরিবার থেকে আবির্ভূত হবেন। তা না হয়ে শেষ নবী প্রেরিত হয়েছেন বনী ইসরাঈলের পরিবর্তে বনী ইসমাঈলের বংশে। এই প্রতিহিংসা তাদেরকে বিশ্বাস স্থাপনে বাধা দিল। এতদসত্ত্বেও তাদের অধিকাংশ লোক মনে মনে জানত এবং চিনত যে, ইনিই শেষ নবী। বদর যুদ্ধে মুসলমানদের বিস্ময়কর বিজয় এবং মুশরিকদের শোচনীয় পরাজয় দেখে তাদের বিশ্বাস আরও বৃদ্ধি পেয়েছিল। এর স্বীকারোক্তি তাদের মুখে শোনাও গিয়েছিল। কিন্তু এই বাহ্যিক জয়-পরাজয়কে সত্য ও মিথ্যা চেনার মাপকাঠি করাটাই ছিল অসার ও দুর্বল ভিত্তি। ফলে উহুদ যুদ্ধের প্রথম দিকে যখন মুসলমানদের বিপর্যয় দেখা দিল এবং কিছু সাহাবী শহীদ হলেন, তখন তাদের বিশ্বাস টলটলয়মান হয়ে গেল। এরপরই তারা মুশরিকদের সাথে বন্ধুত্ব শুরু করে দিল। এর আগে ঘটনা এই হয়েছিল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মদীনা পৌঁছে রাজনৈতিক দুরদর্শিতার কারণে সর্বপ্রথম মদীনায় ও তৎপার্শ্ববর্তী এলাকায় বসবাসকারী ইয়াহুদী গোত্র সমূহের সাথে শান্তি চুক্তি সম্পাদন করেছিলেন। চুক্তিতে উল্লেখ করা হয়েছিল যে, ইয়াহুদীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হবে না এবং কোন আক্রমণকারীকে সাহায্য করবে না। তারা আক্রান্ত হলে মুসলমানগণ তাদেরকে সাহায্য করবে। শান্তি চুক্তিতে আরও অনেক ধারা ছিল। সীরাতে ইবনে হেশামে এর বিস্তারিত বর্ণনা আছে। এমনিভাবে বনু-নযীরসহ ইয়াহুদীদের সকল গোত্র এই চুক্তির অন্তর্ভুক্ত ছিল। মদীনা থেকে দুই মাইল দূরে বনু নুযীরের বসতি, দুর্ভেদ্য দুর্গ এবং বাগ-বাগিচা ছিল।

উহুদ যুদ্ধ পর্যন্ত তাদেরকে বাহ্যতঃ এই শান্তি চুক্তির অনুসারী দেখা যায়। কিন্তু উহুদ যুদ্ধের পর তারা বিশ্বাসঘাতকতা ও গোপন দুরভিসন্ধি শুরু করে দেয়। এই বিশ্বাসঘাতকতার সূচনা এভাবে হয় যে, বনু-নুযীরের জনৈক সর্দার কাব ইবনে আশরাফ উহুদ যুদ্ধের পর আরও চল্লিশজন ইয়াহুদীকে সাথে নিয়ে মক্কা পৌঁছে এবং উহুদ যুদ্ধ ফেরত কুরাইশী কাফেরদের সাথে সাক্ষাৎ করে। দীর্ঘ আলোচনার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার চুক্তি উভয় পক্ষের মধ্যে চূড়ান্ত হয়।

চুক্তিটি পাকাপোক্ত করার উদ্দেশ্যে কাব ইবনে আশরাফ চল্লিশ জন ইয়াহুদীসহ এবং প্রতিপক্ষের আবু সুফিয়ান চল্লিশজন কুরাইশী নেতাসহ কাবা গৃহে প্রবেশ করে এবং বায়তুল্লাহর গেলাফ স্পর্শ করতঃ পারস্পারিক সহযোগিতা ও মুসলমানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অঙ্গীকার করে। চুক্তি সম্পাদনের পর কাব ইবনে আশরাফ মদীনায় ফিরে এলে জিবরাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আদ্যোপান্ত ঘটনা এবং চুক্তির বিবরণ বলে দেন। অতঃপর রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাব ইবনে আশরাফকে হত্যার আদেশ জারি করেন এবং মুহাম্মদ ইবনে মাসলামা রাযিয়াল্লাহু আনহু সাহাবী তাকে হত্যা করেন। এরপর বনু-নুযীরের আরও অনেক চক্রান্ত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অবহিত হতে থাকেন। তন্মধ্যে একটি এই যে, তারা স্বয়ং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে হত্যার চক্রান্ত করে। যদি ওহীর মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাৎক্ষণিকভাবে এই চক্রান্ত সম্পর্কে অবহিত না হতেন, তবে তারা হত্যার এই ষড়যন্ত্রে সফলকাম হয়ে যেত। কেননা যে গৃহের নীচে তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বসিয়েছিল তার ছাদে চড়ে একটি প্রকাণ্ড ভারী পাথর তাঁর মাথায় ছেড়ে দেয়ার পরিকল্পনা প্রায় সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। যে ব্যক্তি এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে নিয়োজিত হয়েছিল। তার নাম উমর ইবনে জাহহাশ আল্লাহ তাআলার হেফাযতের কারণে এই পরিকল্পনা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়।

একটি শিক্ষা

আশ্চর্যের বিষয়! পরবর্তী পর্যায়ে বনু-নুযীরের সবাই নির্বাসিত হয়ে মদীনা ছেড়ে চলে গেল। কিন্তু তাদের মধ্যে মাত্র দুই ব্যক্তি মুসলমান হয়ে মদীনাতেই নিরাপদ জীবনযাপন করতে থাকে। তাদের একজন ছিল উমর ইবনে জাহহাশ, দ্বিতীয়জন তার পিতৃব্য ইয়ামীন ইবনে আমর ইবনে কা'ব।

(ইবনে কাসীর, মাআরেফুল কুরআন ৮/৪১৭-৪১৯)

ইসলাম ও মুসলমানদের উদারতা বর্তমান রাজনীতিকদের জন্য একটি শিক্ষাপ্রদ ব্যাপার

আজকালকার বড় বড় রাষ্ট্রপ্রধান ও সরকার মানবাধিকার সংরক্ষণকল্পে সারগর্ভ বক্তৃতা দেন। এর জন্য প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেন এবং বিশ্ব মানবাধিকারের হর্তাকর্তা কথিত হন। প্রিয় পাঠক! উপরোক্ত ঘটনার প্রতি একবার লক্ষ্য করুন। বনু-নুযীরের উপর্যুপরি চক্রান্ত, বিশ্বাসঘাতকতা, রাসূল হত্যার পরিকল্পনা ইত্যাদি ঘটনা একের পর এক রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের গোচরে আসতে থাকে। যদি এসব ঘটনা আজকালকার কোন মন্ত্রী ও রাষ্ট্র প্রধানের গোচরীভুত হত, তবে ইনসাফের সাথে বলুন তারা এহেন লোকদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করতেন? আজকাল তো জীবিত লোকদের উপর পেট্রোল ঢেলে ময়দান পরিষ্কার করে দেয়া কোন রাষ্ট্রীয় শক্তির ও মুখাপেক্ষী নয়। কিছু গুণ্ডা, দুষ্কৃতিকারী সংঘবদ্ধ হয়ে অনায়াশে একাজ সমাধা করে ফেলে। রাজকীয় রাগ ও গোস্বার লীলা খেলা এর চেয়ে মারাত্মকই হয়ে থাকে। কিন্তু এই রাষ্ট্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের। বনু-নুযীরের বিশ্বাসঘাতকতা যখন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায়, তখনও তিনি তাদের গণহত্যার সংকল্প করেননি। তাদের মাল ও আসবাবপত্র ছিনিয়ে নেয়ার কোন পরিকল্পনা করা হয়নি। বরং তিনি (১) সব আসবাবপত্র নিয়ে কেবল শহর খালি করে দেয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, (২) এর জন্যও তাদেরকে দশ দিনের সময় দেন। যাতে অনায়াসে সব আসবাবপত্র সাথে নিয়ে অন্যত্র স্থানান্তরিত হতে পারে। বনু-নুযায়ের এর পরেও যখন ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করল, তখন এ জাতীয় পদক্ষেপ নেয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়। তাই (৩) কিছু খেজুর বৃক্ষ কাটা হয় এবং কিছু বৃক্ষে অগ্নি সংযোগ করা হয়। যাতে তারা প্রভাবান্বিত হয়। কিন্তু দুর্গে অগ্নি সংযোগ অথবা গণহত্যার নির্দেশ তখনও জারী করা হয়নি। (৪) অতঃপর তারা যখন বেগতিক হয়ে শহর ছেড়ে দেয়ার সিদ্ধান্ত নিল, তখন সামরিক অভিযান সত্ত্বেও এক ব্যক্তি এক উটের পিঠে যে পরিমাণ আসবাব-পত্র নিয়ে যেতে পারে সে পরিমাণ আসবাব-পত্র নিয়ে যাওয়ার অধিকার তাদেরকে দেয়া হল।

ফলে তারা গৃহের কড়িকাট, তক্তা এবং দরজার কপাট পর্যন্ত উটের পিঠে তুলে নিল। (৫) তারা সব আসবাবপত্র সাথে নিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু কোন মুসলমান তাদের প্রতি বক্র দৃষ্টিতে তাকায়নি। শান্ত ও মুক্ত পরিবেশে সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগ অবস্থায় তারা আসবাব-পত্র নিয়ে বিদায় হয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে সময় শত্রুর কাছ থেকে ষোল আনা প্রতিশোধ গ্রহণ করার মত শক্তি ও ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। সেই সময় বনু-নুযীরের প্রতি তিনি এহেন উদারতা প্রদর্শন করেন। এই বিশ্বাসঘাতক, কুচক্রী শত্রুদের সাথে তাঁর এহেন উদার ব্যবহার, সেই ব্যবহারের নজীর, যা তিনি মক্কা বিজয়ের পর তাঁর পুরাতন শত্রুদের সাথে করেছিলেন।

(মাআরেফুল কুরআন ৮/৪২০-৪২১)

(ঝ) মক্কা বিজয়

ইরশাদ হয়েছেঃ

إِذَا جَآءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ (١) وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا (٢) فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ ط اِنَّهٗ كَانَ تَوَّابًا (٣) (النصر ١-٣)

তরজমাঃ (১) যখন আসবে আল্লাহর সাহায্য ও বিজয়। (২) এবং আপনি মানুষকে দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে প্রবেশ করতে দেখবেন, (৩) তখন আপনি আপনার পালনকর্তার পবিত্রতা বর্ণনা করুন এবং তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করুন। নিশ্চয়ই তিনি তাওবা কবুলকারী। (সূরা নাসর ১-৩)

তাফসীরঃ এ ব্যাপারে সকলেই একমত যে, প্রথম আয়াতে বিজয় বলে মক্কা বিজয় বুঝানো হয়েছে। তবে সূরাটি মক্কা বিজয়ের পূর্বে নাযিল হয়েছে। না পরে এ বিষয়ে মতভেদ রয়েছে। إِذَا جَآءَ ভাষা দৃষ্টে পূর্বে অবতীর্ণ হয়েছে বলে বাহ্যতঃ মনে হয়। রূহুল মাআনীতে এর অনুকূলে একটি রেওয়ায়েতও বর্ণিত আছে। যাতে বলা হয়েছে যে, খায়বার যুদ্ধ থেকে ফেরার পথে এ সূরাটি অবতীর্ণ হয়। খায়বার বিজয় যে মক্কা বিজয়ের পূর্বে হয়েছে তা

সর্বজনবিদিত। রূহুল মাআনীতে হযরত কাতাদাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুর উক্তি উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, এই সূরা অবতীর্ণ হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু বছর জীবিত ছিলেন। যেসব রেওয়ায়েত থেকে জানা যায় যে, সূরাটি মক্কা বিজয়ের দিন অথবা বিদায় হজ্জে নাযিল হয়েছে, সেগুলোর মর্মার্থ এরূপ হতে পারে যে, এ স্থলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সূরাটি পাঠ করে থাকবেন। ফলে সবাই ধারনা করেছে যে, এটা এক্ষুণি নাযিল হয়েছে। (মাআরেফুল কুরআন ৮/১০৩৩)

وَرَاَيْتَ النَّاسَ মক্কা বিজয়ের পূর্বে এমন লোকদের সংখ্যাও প্রচুর ছিল, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রেসালত ও ইসলামের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত বিশ্বাসের কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছিল। কিন্তু কুরাইশদের ভয়ে অথবা কোন ইতস্ততার কারণে তারা ইসলাম গ্রহণ করা থেকে বিরত ছিল। মক্কা বিজয় তাদের সেই বাধা দুর করে দেয়। সেমতে তারা দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করতে শুরু করে। ইয়েমেন থেকে সাতশ ব্যক্তি ইসলাম গ্রহণ করে। পথিমধ্যে আযান দিতে দিতে ও কুরআন পাঠ করতে করতে মদীনায় উপস্থিত হয়। সাধারণ আরবরাও এমনিভাবে দলে দলে ইসলামে দাখিল হয়। (মাআরেফুল কুরআন ৮/১০৩৪)

একাদশ অধ্যায়
ইসলামী রাষ্ট্রের সীমান্ত পাহারা দেয়া

ইরশাদ হয়েছেঃ

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱصْبِرُوا۟ وَصَابِرُوا۟ وَرَابِطُوا۟ وَٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (ال عمران ٢)

তরজমাঃ হে ঈমানদারগণ! ধৈর্য ধারণ কর এবং মোকাবেলায় দৃঢ়তা অবলম্বন কর এবং সদা প্রস্তুত থাক। আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক, যাতে তোমরা তোমাদের উদ্দেশ্য লাভে সমর্থ হতে পার। (সূরা আলে ইমরান ২০০)

রেবাত বা ইসলামী সীমান্ত রক্ষার ব্যবস্থা

তাফসীর ঃ ইসলামী সীমান্তের হেফাযত করার লক্ষ্যে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি নিয়ে অপেক্ষারত থাকাকেই রেবাত ও মোরাবাতাহ বলা হয়। এর দুটি রূপ হতে পারে। প্রথমতঃ যুদ্ধের কোন সম্ভাবনা নেই। সীমান্ত সম্পূর্ণ শান্ত এমতাবস্থায় শুধুমাত্র অগ্রীম হেফাযত তার দেখা-শোনা করতে থাকা। এক্ষেত্রে পরিবার-পরিজনসহ সেখানে (সীমান্তে) বসবাস করতে থাকা কিংবা চাষবাস করে নিজের রুজী-রোজগার করাও জায়েয। এমতাবস্থায় যদি সীমান্ত রক্ষাই নিয়ত হয় এবং সেখানে থাকা অবস্থায় রুজী-রোজগার করা যদি তারই আনুসাঙ্গিক বিষয় হয়, তবে এমন ব্যক্তিরও রেবাত ফী সাবীলিল্লাহ'র সওয়াব হতে থাকবে। তাকে যদি কখনও যুদ্ধ করতে না হয় তবুও। কিন্তু প্রকৃত নিয়ত যদি সীমান্তের হেফাযত না হয়, বরং নিজের রুজী-রোজগারই হয় মুখ্য। তবে দৃশ্যতঃ সীমান্ত রক্ষার কাজ করে থাকলেও এমন লোক মোরাবেত ফী সাবীলিল্লাহ হবে না। অর্থাৎ আল্লাহর ওয়াস্তে সীমান্ত রক্ষাকারী বলে গণ্য হবে না।

দ্বিতীয়তঃ সীমান্তে যদি শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা থাকে, তবে এমতাবস্থায় নারী ও শিশুদেরকে সেখানে রাখা জায়েয নয়। এ অবস্থায় সেখানে কেবলমাত্র ঐ সকল লোকই থাকবে যারা শত্রুর মোকাবিলা করতে পারে। (কুরতুবী)

এতদুভয় অবস্থাতে 'রেবাত' বা সীমান্ত রক্ষার অসংখ্য ফযীলত রয়েছে। সহীহ্ বুখারীর এক হাদীসে হযরত সাহল ইবনে সাদ সায়েদী রাযিয়াল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, আল্লাহর পথে একদিনের 'রেবাত' (সীমান্ত প্রহরা) সমগ্র দুনিয়া এবং এর মাঝে যা কিছু রয়েছে সে সমুদয় থেকেও উত্তম।

মুসলিম শরীফের এক হাদীসে হযরত সালমান কর্তৃক বর্ণিত রয়েছে যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, একদিন ও এক রাতের রেবাত (সীমান্ত প্রহরা) ক্রমাগত এক মাসের রোযা এবং সমগ্র রাত ইবাদতে কাটিয়ে দেওয়া অপেক্ষাও উত্তম। যদি এমতাবস্থায় কেউ মৃত্যুবরণ করে, তাহলে তার সীমান্ত প্রহরার পর্যায়ক্রমিক সওয়াব সর্বদা অব্যাহত থাকবে। আল্লাহর পক্ষ থেকে তার রিযিক জারী থাকবে এবং সে শয়তান থেকে নিরাপদে থাকবে।

আবু দাউদ (রহঃ) ফুযালাহ্ ইবনে ওবায়েদ এর রেওয়ায়েতক্রমে এ মর্মে এক রেওয়ায়েত উদ্ধৃত করেছেন যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, প্রত্যেক মৃত ব্যক্তির আমল তার মৃত্যুর সাথে সাথে শেষ হয়ে যায়। শুধুমাত্র মোরাবেত (ইসলামী সীমান্ত রক্ষী) ছাড়া। অর্থাৎ তার আমল কিয়ামত পর্যন্ত বাড়তে থাকবে এবং সে কবরে হিসাব-নিকাশ গ্রহণকারী থেকে নিরাপদ থাকবে।

এসব রেওয়ায়েত দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, রেবাত বা সীমান্ত রক্ষার কাজটি সমস্ত সদকায়ে জারিয়া অপেক্ষাও উত্তম। কারণ সদকায়ে জারিয়ার সওয়াব ততক্ষণ পর্যন্তই চলতে থাকে যতক্ষন পর্যন্ত তার সদকাকৃত বাড়ী-ঘর, জমি-জমা রচিত গ্রন্থরাজি কিংবা ওয়াকফকৃত জিনিসের দ্বারা মানুষ উপকৃত হতে থাকে। যখন এ উপকারিতা বন্ধ হয়ে যায়। তখন তার সওয়াবও বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু আল্লাহর পথে সীমান্ত প্রহরার সওয়াব কিয়ামত পর্যন্ত বন্ধ হবে না। কারণ সমস্ত মুসলমানের সৎ কর্মে নিয়োজিত থাকা তখনই সম্ভব, যখন তারা শত্রুর আক্রমণ থেকে নিরাপদে থাকবে। ফলে একজন সীমান্ত রক্ষীর এ কাজ সমস্ত মুসলমানের সৎ কাজের কারণ হয়। সে কারণেই কিয়ামত পর্যন্ত তার 'রেবাত' কর্মের সওয়াব অব্যাহত থাকবে। তাছাড়াও সে যত নেক কাজ দুনিয়ায় করত, সেগুলোর সওয়াবও আমল করা

ছাড়াই সর্বদা জারী থাকবে। যেমন, বিশুদ্ধ সনদ সহ ইবনে মাজাহ গ্রন্থে উদ্ধৃত রয়েছে যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন–

من مات مرابطا فی سبیل الله اجری علیه اجر عمله الصالح الذی کان یعمله واجری علیه رزقه وامن الفتان وبعثه الله یوم القیامة امنا من الفزع (سنن ابن ماجه)

অর্থাৎ যে ব্যক্তি সীমান্ত প্রহরায় নিয়োজিত অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে, সে দুনিয়ায় যে সমস্ত সৎ কাজ করত তার সওয়াব সব সময় জারী থাকবে এবং তার রিযিকও জারী থাকবে এবং সে শয়তান (কিংবা কবরের সওয়াল-জওয়াব) থেকে বেঁচে থাকবে। কিয়ামতের দিন আল্লাহ তাকে এমন বিশেষভাবে উত্থিত করবেন যে, হাশরের ময়দানের কোন ভয়-ভীতিই তার মধ্যে থাকবে না।

এই রেওয়ায়েতে যে সমস্ত ফযীলত বর্ণিত হয়েছে, তার একটি শর্ত রয়েছে যে, তাকে সীমান্ত রক্ষার কাজে নিয়োজিত থাকা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করতে হবে। কিন্তু অন্যান্য কোন কোন রেওয়ায়েত দ্বারা জানা যায় যে, সে জীবিত অবস্থায় তার সন্তান-সন্ততির কাছে ফিরে গেলেও সে সওয়াব জারী থাকবে।

হযরত উবাই ইবনে কা'আব রেওয়ায়েত করেন যে, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেছেন, রমযান ছাড়া অন্যান্য দিনে একদিন মুসলমানদের কোন দুর্বল সীমান্ত রক্ষার কাজ নিঃস্বার্থভাবে সম্পাদন করার সওয়াব শত বর্ষের ক্রমাগত রোযা এবং রাত্রি জাগরণের চেয়েও উত্তম। আর রমযানের সময় একদিন সীমান্ত প্রহরার কাজ এক হাজার বছরের সিয়াম ও কিয়ামের চেয়ে উত্তম। এখানে এ শব্দে সামান্য দোদুল্যমানতা প্রকাশ করার পর বর্ণনাকারী বলেন, আর যদি আল্লাহ অক্ষত অবস্থায় তাকে তার পরিবার-পরিজনের নিকট ফিরিয়ে নেন, তবে এক হাজার বছর পর্যন্ত তার কোন পাপ লেখা হবে না। বরং পুণ্য লেখা হতে থাকবে এবং তার সীমান্ত রক্ষার কাজের বিনিময় কিয়ামত অবধি জারী থাকবে। (কুরতুবী, মাআরেফুল কুরআন ২/৩০৫–৩০৭)

দ্বাদশ অধ্যায়
প্রতিশোধ গ্রহণ

ইরশাদ হয়েছেঃ

وَاِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوْا بِمِثْلِ مَاعُوْقِبْتُمْ بِهٖ ط وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصّٰبِرِيْنَ (النحل ١٢٦)

তরজমাঃ (১২৬) আর যদি তোমরা প্রতিশোধ গ্রহণ কর, তবে ঐ পরিমাণ প্রতিশোধ গ্রহণ করবে যে পরিমাণ তোমাদেরকে কষ্ট দেয়া হয়। যদি সবর কর তবে তা সবরকারীদের জন্য উত্তম। (সূরা নাহল ১২৬)

দাওয়াতদাতাকে কেউ কষ্ট দিলে প্রতিশোধ গ্রহণ করা জায়েয কিন্তু সবর করা উত্তম

তাফসীরঃ বিগত আয়াতের পূর্ববর্তী আয়াতে দাওয়াত দাতাদের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ বর্ণিত হয়েছে। তা এই যে, দাওয়াতের কাজে মাঝে মাঝে এমন কঠোর প্রাণ মুর্খদের সাথেও পালা পড়ে যায় যে, তাদেরকে যতই নম্রতা ও শুভেচ্ছা সহকারে বুঝানো হোক না কেন, তারা উত্তেজিত হয়ে যায়। কটু কথা বলে কষ্ট দেয় এবং কোন কোন সময় আরও বাড়াবাড়ি করে দাওয়াত দাতাদের উপর দৈহিক নির্যাতন চালায়। এমনকি তাদেরকে হত্যা করতেও কুণ্ঠিত হয় না। এমতাবস্থায় দাওয়াত দাতাদের কি করা উচিত।

এ সম্পর্কে وَاِنْ عَاقَبْتُمْ الخ বাক্যে প্রথমতঃ তাদেরকে আইনগত অধিকার দেয়া হয়েছে যে, যারা নির্যাতন চালায় তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ গ্রহণ করা আপনার জন্য বৈধ। কিন্তু এই শর্তে যে, প্রতিশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে নির্যাতনের সীমা অতিক্রম করা যাবে না, যতটুকু যুলুম প্রতিপক্ষের তরফ থেকে করা হয় প্রতিশোধ ততটুকুই গ্রহণ করতে হবে। বেশী হতে পারবে না। আয়াতের শেষে পরামর্শ দেয়া হয়েছে যে, যদিও প্রতিশোধ গ্রহণের অধিকার রয়েছে। কিন্তু সবর করা উত্তম।(মাআরেফুল কুরআন– ৫/৪৮৪–৪৮৫)

মাসআলাঃ আলোচ্য আয়াতটি প্রতেশোধ গ্রহণের ক্ষেত্রে সমতার আইন ব্যক্ত করেছে। এ কারণেই ফিকাহবিদগণ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কাউকে হত্যা করে তার বিনিময়ে হত্যাকারীকে হত্যা করা হবে। আহত করলে আহতকারীকে জখমের পরিমাণে জখম করা হবে। কেউ কাউকে হাত পা কেটে হত্যা করলে নিহতের ওলীকে অধিকার দেয়া হবে সেও প্রথমে হত্যাকারীর হাত পা কর্তন করবে। অতঃপর হত্যা করবে। তবে কেউ যদি কাউকে পাথর মেরে কিংবা তীর দ্বারা আহত করে হত্যা করে তাহলে এতে হত্যার প্রকারভেদের সঠিক পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভবপর নয় যে, কি পরিমাণ আঘাত দ্বারা হত্যা সংঘটিত হয়েছে এবং নিহত ব্যক্তি কি পরিমাণ কষ্ট পেয়েছে। এ ক্ষেত্রে সত্যিকার সমতার কোন মাপকাঠি নেই। তাই হত্যাকারীকে তরবারী দ্বারাই হত্যা করা হবে। (জাসসাস)

মাসআলাঃ আয়াতটি যদিও দৈহিক কষ্ট ও দৈহিক ক্ষতি সম্পর্কে অবতীর্ণ হয়েছে। কিন্তু ভাষা ব্যাপক এবং এতে আর্থিক ক্ষতিও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। এ কারণেই ফিকাহ বিদগণ বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কারও অর্থ-সম্পদ ছিনতাই করে প্রতিপক্ষেরও অধিকার রয়েছে সেই পরিমাণ অর্থ-সম্পদ তার কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয়ার কিংবা অপহরণ করার। তবে শর্ত এই যে, যে অর্থ-সম্পদ সে ছিনিয়ে নিবে কিংবা অপহরণ করবে, তা ছিনতাইকৃত অর্থ-সম্পদের অভিন্ন প্রকার হতে হবে। উদাহরণতঃ নগদ টাকা-পয়সা ছিনতাই করলে বিনিময়ে সেই পরিমাণ নগদ টাকা-পয়সা তার কাছ থেকে ছিনতাই কিংবা অপহরণের মাধ্যমে নিতে পারবে। খাদ্য-শস্য, বস্ত্র ইত্যাদি ছিনতাই করলে সেই রকম খাদ্য-শস্য ও বস্ত্র নিতে পারবে। কিন্তু এক প্রকার সামগ্রীর বিনিময়ে অন্য প্রকার সামগ্রী নিতে পারবে না। উদাহরণঃ টাকা-পয়সার বিনিময়ে বস্ত্র অথবা অন্য কোন ব্যবহারিক বস্তু জোরপূর্বক নিতে পারবে না। কোন কোন ফিকাহবিদ সর্বাবস্থায় অনুমতি দিয়েছেন এক প্রকার হোক কিংবা ভিন্ন প্রকার। এ মাসআলার কিছু বিবরণ কুরতুবী স্বীয় তাফসীরে লিপিবদ্ধ করেছেন। বিস্তারিত আলোচনা ফিকাহ গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। (মাআরেফুল কুরআন– ৫/৪৮৬–৪৮৭)

ত্রয়োদশ অধ্যায়
জিহাদের উপকরণ বা আসবাবপত্র

(ক) লৌহ

ইরশাদ হয়েছেঃ

لَقَدْ اَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنٰتِ وَاَنْزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتٰبَ وَالْمِيْزَانَ لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ ج وَاَنْزَلْنَا الْحَدِيْدَ فِيْهِ بَاْسٌ شَدِيْدٌ وَّمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَلِيَعْلَمَ اللّٰهُ مَنْ يَّنْصُرُهٗ وَرُسُلَهٗ بِالْغَيْبِ ط اِنَّ اللّٰهَ قَوِيٌّ عَزِيْزٌ

(الحديد ٢٥)

তরজমাঃ (২৫) আমি আমার রাসূলগণকে সুস্পষ্ট নিদর্শনসহ প্রেরণ করেছি এবং তাঁদের সাথে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায়নীতি, যাতে মানুষ ইনসাফ প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি নাযিল করেছি লৌহ, যাতে আছে প্রচণ্ড রণশক্তি এবং মানুষের বহুবিধ উপকার। এটা এজন্য যে, আল্লাহ্ জেনে নিবেন কে না দেখে তাঁকে ও তাঁর রাসূলগণকে সাহায্য করে। আল্লাহ শক্তিধর, পরাক্রমশালী। (সূরা হাদীদ ২৫)

তাফসীরঃ আয়াতে লৌহ নাযিল করার দুটি রহস্য উল্লেখ করা হয়েছে। (এক) এর ফলে শত্রুদের মনে ভীতি সঞ্চার হয় এবং এর সাহায্যে অবাধ্যদেরকে খোদায়ী বিধান ন্যায়নীতি পালনে বাধ্য করা যায়। (দুই) এতে আল্লাহ্ তাআলা মানুষের জন্যে বহুবিধ কল্যাণ নিহিত রেখেছেন। দুনিয়াতে যত শিল্প-কারখানা ও কলকব্জা আবিষ্কৃত হয়েছে এবং ভবিষ্যতে হবে, সবগুলোর মধ্যে লৌহের ভূমিকা সর্বাধিক। লৌহ ব্যতীত কোন শিল্প চলতে পারে না। এখানে আরও একটি প্রণিধানযোগ্য বিষয় এই যে, আলোচ্য আয়াতে পয়গম্বর ও কিতাব প্রেরণ ও ন্যায়-নীতির দাঁড়িপাল্লা আবিষ্কার ও ব্যবহারের আসল লক্ষ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে لِيَقُوْمَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ

অর্থাৎ মানুষ যাতে ইনসাফের উপর প্রতিষ্টিত হয়ে যায়। এরপর লৌহ সৃষ্টি করার কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। এর লক্ষ্য ও প্রকৃত পক্ষে ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করা। কেননা পয়গম্বরগণ ও আসমানী কিতাবসমূহ ন্যায় ও সুবিচার প্রতিষ্ঠা করার সুস্পষ্ট প্রমাণাদি দেন এবং যারা সুবিচার প্রতিষ্ঠা করে না, তাদেরকে পরকালের শাস্তির ভয় দেখান। মীযান ইনসাফের সীমা ব্যক্ত করে। কিন্তু যারা অবাধ্য ও হটকারী তারা কোন প্রমাণ মানে না এবং ন্যায়নীতি অনুযায়ী কাজ করতে সম্মত হয় না। তাদেরকে স্বাধীন ছেড়ে দেয়া হলে দুনিয়াতে ন্যায় ও ইনসাফ কায়েম করা সুদূর পরাহত। তাদেরকে বশে আনা লৌহ ও তরবারীর কাজ, যা শাসকবর্গ অবশেষে বেগতিক হয়ে ব্যবহার করেন। (মাআরেফুল কুরআন- ৮/৩৭৩-৩৭৪)

(খ) ঘোড়া

ইরশাদ হয়েছেঃ

زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوٰتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِيْنَ وَالْقَنَاطِيْرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْاَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ؕ ذٰلِكَ مَتَاعُ الْحَيٰوةِ الدُّنْيَا ۚ وَاللّٰهُ عِنْدَهٗ حُسْنُ الْمَاٰبِ (ال عمران ١٤)

তরজমাঃ (১৪) মানবকুলকে মোহগ্রস্ত করেছে নারী, সন্তান-সন্ততি, রাশিকৃত স্বর্ণ-রৌপ্য, চিহ্নিত অশ্ব, গবাদি পশুরাজি এবং ক্ষেত্র-খামারের মত আকর্ষণীয় বস্তু সামগ্রী। এসবই হচ্ছে পাথির্ব জীবনের ভোগ্য বস্তু। আল্লাহর নিকটই হলো উত্তম আশ্রয়। (সূরা আলে ইমরান ১৪)

তাফসীর ঃ সারাংশ এই যে, এসব বস্তু পার্থিব জীবনে (আল্লাহর সন্তুষ্টিমূলক কাজে) ব্যবহার করার জন্যে; মন বসাবার জন্য নয়। আর আল্লাহর কাছে রয়েছে উত্তম ঠিকানা। অর্থাৎ (জান্নাত) সেখানে চীরকাল থাকতে হবে এবং সেখানের নিআমত ধ্বংস হবে না,হ্রাসও পাবে না

(তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন ১৬৭ পৃঃ)

নিজের সামর্থের মধ্যে থেকে প্রস্তুতি গ্রহণ কর

ইরশাদ হয়েছেঃ

وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنَ بِهٖ عَدُوَّ اللّٰهِ وَعَدُوَّكُمْ وَاٰخَرِيْنَ مِنْ دُوْنِهِمْ ج لَا تَعْلَمُوْنَهُمْ ج اَللّٰهُ يَعْلَمُهُمْ ط وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ شَيْءٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ يُوَفَّ اِلَيْكُمْ وَاَنْتُمْ لَا تُظْلَمُوْنَ

(انفال ٦٠)

তরজমাঃ (৬০) আর প্রস্তুত কর তাদের সাথে যুদ্ধের জন্য যা কিছু সংগ্রহ করতে পার নিজের শক্তি সামর্থ্যের মধ্য থেকে এবং পালিত ঘোড়া থেকে, যেন প্রভাব পড়ে আল্লাহর শত্রুদের উপর এবং তোমাদের শত্রুদের উপর। আর তাদেরকে ছাড়া অন্যদের উপরও যাদেরকে তোমরা জাননা, আল্লাহ্ তাদেরকে চিনেন। বস্তুতঃ যা কিছু তোমরা ব্যয় করবে আল্লাহর রাহে, তা তোমরা পরিপূর্ণভাবে ফিরে পাবে এবং তোমাদের কোন হক অপূর্ণ থাকবে না। (সূরা আনফাল ৬০)

জিহাদের জন্য যুদ্ধোপকরণ ও অস্ত্রশস্ত্র তৈরী করা ফরয

তাফসীরঃ দ্বিতীয় আয়াতে ইসলামের শত্রুকে প্রতিরোধ ও কাফেরদের সাথে মোকাবেলা করার জন্য প্রস্তুতির বিধান বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে– وَاَعِدُّوْا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمْ অর্থাৎ কাফেরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধোপকরণ তৈরী করে নাও যতটা তোমাদের পক্ষে সম্ভব হয়। এক্ষেত্রে যুদ্ধোপকরণ তৈরী করার সাথে مَا اسْتَطَعْتُمْ এর শর্ত আরোপ করে ইঙ্গিত করা হয়েছে যে, তোমাদের সফলতা লাভের জন্য এটা অপরিহার্য নয় যে, তোমাদের প্রতিপক্ষের নিকট যে ধরনের এবং যে পরিমাণ উপকরণ রয়েছে তোমাদেরকেও ততটাই অর্জন করতে হবে, বরং সামর্থ্য অনুযায়ী যা কিছু উপকরণ জোগাড় করতে পার তাই সংগ্রহ করে নাও, তবে সেটুকুই যথেষ্ট আল্লাহর সাহায্য ও সহায়তা তোমাদের সঙ্গে থাকবে। অতঃপর সে

উপকরণের কিছুটা বিশ্লেষণ এভাবে করা হয়েছে مِنْ قُوَّةٍ অর্থাৎ মোকাবেলা করার শক্তি সঞ্চয় কর। এতে সমস্ত যুদ্ধোপকরণ, অস্ত্রশস্ত্র, যানবাহন প্রভৃতিও অন্তর্ভুক্ত এবং শরীর চর্চা ও সমর বিদ্যা শিক্ষা করাও অন্তর্ভুক্ত। কুরআনে কারীম এখানে তৎকালে প্রচলিত অস্ত্রশস্ত্রের কোন উল্লেখ করেনি বরং ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ 'শক্তি' ব্যবহার করে ইঙ্গিত করে দিয়েছে যে, শক্তি প্রত্যেক যুগ, দেশ ও স্থান অনুযায়ী বিভিন্ন রকম হতে পারে। তৎকালীন সময়ের অস্ত্র ছিল তীর-তলোয়ার, বর্শা প্রভৃতি। তার পরে বন্দুক-তোপের যুগ এসেছে। তারপর এখন চলছে বোমা, রকেটের যুগ। শক্তি শব্দটি এসব কিছুতেই ব্যাপক। সুতরাং যে কোন বিদ্যা ও কৌশল শিক্ষা করার প্রয়োজন হবে সেসবই যদি এই নিয়তে হয় যে, তার মাধ্যমে ইসলাম ও মুসলমানদের শত্রুকে প্রতিহত করা এবং কাফেরদের মোকাবেলা করা হবে, তাহলে তাও জিহাদেরই শামিল।

قُوَّةٌ শব্দটি ব্যাপকার্থে উল্লেখ করার পর প্রকৃষ্টভাবে বিশেষ قُوَّةٌ বা শক্তির কথাও বলা হয়েছে। وَمِنْ رِّبَاطِ الْخَيْلِ - رِبَاطٌ শব্দটি ধাতুগত অর্থে ব্যবহৃত হয়। আর مَرْبُوْطٌ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। প্রথম ক্ষেত্রে এর অর্থ হবে, ঘোড়া বাঁধা। আর দ্বিতীয় ক্ষেত্রে অর্থ হবে, বাঁধা ঘোড়া। তবে উভয়টির মর্মই এক। অর্থাৎ জিহাদের নিয়তে ঘোড়া পালা এবং সেগুলোকে বাঁধা কিংবা পালিত ঘোড়াগুলোকে এক জায়গায় এনে সমবেত করা। যুদ্ধোপকরণের মধ্যে বিশেষ করে ঘোড়ার উল্লেখ এজন্য করা হয়েছে যে, তখনকার যুগে কোন দেশ ও জাতিকে জয় করার জন্য ঘোড়াই ছিল সবচেয়ে কার্যকর ও উপকারী। তাছাড়া এ যুগেও বহু জায়গা রয়েছে, যা ঘোড়া ছাড়া জয় করা যাবে না। সে কারণেই রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, ঘোড়ার ললাট-দেশে আল্লাহ তাআলা বরকত দিয়েছেন। (মাআরেফুল কুরআন ৪/৩৪১-৩৪২)

তোমাদের আরোহনের জন্য

ইরশাদ হয়েছেঃ

وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيْرَ لِتَرْكَبُوْهَا وَزِيْنَةً وَّيَخْلُقُ مَالَا تَعْلَمُوْنَ (النحل ٨)

তরজমাঃ (৮) তোমাদের আরোহনের জন্য এবং শোভার জন্য তিনি ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি এমন জিনিস সৃষ্টি করেন, যা তোমরা জান না। (সূরা নাহল ৮)

তাফসীরঃ আমি ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি করেছি, যাতে তোমরা এগুলোতে সওয়ার হও, বোঝা বহনের কথাও প্রসঙ্গতঃ এর মধ্যে এসে গেছে এবং তোমাদের শোভা ও সৌন্দর্যের উপকরণ হওয়াও এগুলোকে সৃষ্টি করার অন্যতম কারণ। এখানে শোভন বলে ঐ শান-শওকত বুঝানো হয়েছে, যা সর্বসাধারণের মধ্যে মালিকদের জন্যে বর্তমান থাকে।

(মাআরেফুল কুরআন– ৫–৩৫৪)

শয়তানের বাহিনী

ইরশাদ হয়েছেঃ

وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَاَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِى الْاَمْوَالِ وَالْاَوْلَادِ وَعِدْهُمْ ط وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ اِلَّا غُرُوْرًا (بنى اسرائيل ٦٤)

তরজমাঃ তুই সত্যচ্যুত করে তাদের মধ্য থেকে যাকে পারিস স্বীয় আওয়াজ দ্বারা, স্বীয় অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে তাদেরকে আক্রমণ কর, তাদের অর্থ-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে শরীক হয়ে যা এবং তাদেরকে প্রতিশ্রুত দে। ছলনা ছাড়া শয়তান তাদেরকে কোন প্রতিশ্রুতি দেয় না।

(সূরা বনী ইসরাঈল ৬৪)

তাফসীরঃ আয়াতের اَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ বাক্যে শয়তানের অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। এতে করে বাস্তবেও শয়তানের কিছু অশ্বারোহী ও কিছু পদাতিক বাহিনী জরুরী বিবেচিত

হয় না। বরং এই বাক পদ্ধতিটি পূর্ণ বাহিনী তথা পূর্ণ শক্তি নিয়োগ করার অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। বাস্তবে যদি এরূপ থেকেও থাকে তবে তাও অস্বীকার করার কোন কারণ নেই। হযরত ইবনে আব্বাস রাযিয়াল্লাহু আনহু বলেনঃ যারা কুফরের সমর্থনে যুদ্ধ করতে যায় সেসব অশ্বারোহী ও পাদাতিক বাহিনী শয়তানেরই অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী। (মাআরেফুল কুরআন ৫/৫৮৮)

তোমরা ঘোড়ায় কিংবা উটে চড়ে যুদ্ধ করনি

ইরশাদ হয়েছেঃ

وَمَآ اَفَآءَ اللّٰهُ عَلٰى رَسُوْلِهٖ مِنْهُمْ فَمَآ اَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَّلَا رِكَابٍ وَّلٰكِنَّ اللّٰهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهٗ عَلٰى مَنْ يَّشَآءُ ؕ وَاللّٰهُ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ (الحشر ٦)

তরজমাঃ (৬) আল্লাহ বনু নযীরের কাছ থেকে তাঁর রাসূলকে যে ধন-সম্পদ দিয়েছেন, তজ্জন্যে তোমরা ঘোড়ায় কিংবা উটে চড়ে যুদ্ধ করনি, কিন্তু আল্লাহ যার উপর ইচ্ছা তাঁর রাসূলগণকে প্রাধান্য দান করেন। আল্লাহ সবকিছুর উপর সর্বশক্তিমান। (সূরা হাশর ৬)

তাফসীরঃ এখানে তাদের মাল সম্পর্কিত ব্যাপারে আলোচনা করা হচ্ছেঃ আল্লাহ বনু-নুযায়রের কাছ থেকে তাঁর রাসূলকে যা কিছু দিয়েছেন, (তাতে তোমাদের কোনরূপ কষ্ট স্বীকার করতে হয়নি) তোমরা তজ্জন্যে (অর্থাৎ তা হাসিল করার জন্যে) ঘোড়া ও উটে চড়ে যুদ্ধ করনি। (উদ্দেশ্য এই যে, মদীনা থেকে দুই মাইল দূরে অবস্থিত হওয়ার কারণে সফরও করতে হয়নি এবং যুদ্ধ করারও প্রয়োজন দেখা দেয়নি। মোকাবিলা যা হয়েছে, তা নেহায়েত অনুল্লেখযোগ্য। (রূহুল মাআনী, তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন ৮/৪২৪)

চতুর্দশ অধ্যায়

আল্লাহর জন্য হিজরত

হিজরতের আবশ্যকতা

ইরশাদ হয়েছেঃ

وَدُّوْا لَوْ تَكْفُرُوْنَ كَمَا كَفَرُوْا فَتَكُوْنُوْنَ سَوَآءً فَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ أَوْلِيَآءَ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ط فَاِنْ تَوَلَّوْا فَخُذُوْهُمْ وَاقْتُلُوْهُمْ حَيْثُ وَجَدْتُّمُوْهُمْ ص وَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا (نساء ٨٩)

তরজমাঃ তারা চায় যে, তারা যেমন কাফের, তোমরাও তেমন কাফের হয়ে যাও, যাতে তোমরা এবং তারা সব সমান হয়ে যাও। অতএব তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না, যে পর্যন্ত তারা আল্লাহর পথে হিজরত করে চলে আসে। অতঃপর যদি তারা বিমুখ হয়। তবে তাদেরকে পাকড়াও কর এবং যেখানে পাও হত্যা কর। তাদের মধ্যে কাউকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করো না এবং সাহায্যকারী বানিও না। (সূরা নিসা ৮৯)

হিজরতের বিভিন্ন প্রকার ও বিধান

তাফসীরঃ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ইসলামের প্রাথমিক যুগে কাফেরদের দেশ থেকে হিজরত করা প্রত্যেক মুসলমানদের উপর ফরয ছিল। (১) এ কারণে যারা এ ফরয পরিত্যাগ করত, তাদের সাথে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের মত ব্যবহার করতে নিষেধ করে দেন। মক্কা বিজিত হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেনঃ لاهجرة بعد الفتح। অর্থাৎ মক্কা বিজিত হয়ে যখন দারুল ইসলাম হয়ে গেল, তখন সেখান থেকে হিজরত করা ফরয নয়। (বুখারী)

এটা ছিল তখনকার কথা যখন হিজরত ঈমানের শর্ত ছিল, সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যে ব্যক্তি হিজরত করত না, তাকে মুসলমান মনে করা হতো না। কিন্তু পরে এ বিধান রহিত হয়ে যায়।

দ্বিতীয় প্রকার হিজরত কিয়ামত পর্যন্ত বাকী থাকবে। এ সম্পর্কে হাদীসে বলা হয়েছে– لاتنقطع الهجرة حتى تنقطع التوبة অর্থাৎ যত দিন তাওবা কবুল হওয়ার সময় থাকবে, ততদিন হিজরত বাকী থাকবে। (বুখারী)

এ হিজরত সম্পর্কে বুখারীর টীকাকার আল্লামা আইনী লিখেনঃ ان المراد بالهجرة الباقية هى هجر السيئات অর্থাৎ স্থায়ী হিজরতের অর্থ হচ্ছে পাপকর্ম পরিত্যাগ করা। যেমন, এক হাদীসে রাসূলূল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ المهاجر من هجر مانهى الله عنه অর্থাৎ ঐ ব্যক্তি মুহাজির যে আল্লাহর নিষিদ্ধ বিষয় বর্জন করে। (মিরকাত প্রথম খণ্ড)

এ আলোচনা থেকে জানা গেল যে, পরিভাষায় হিজরত দুই অর্থে ব্যবহৃত হয়ঃ (১) ধর্মের খাতিরে দেশ ত্যাগ করা। যেমন, সাহাবায়ে কেরাম স্বদেশ মক্কা ছেড়ে মদীনা ও আবিসিনিয়ায় চলে যান, (২) পাপকাজ বর্জন করা।

وَلَا تَتَّخِذُوْا مِنْهُمْ وَلِيًّا وَّلَا نَصِيْرًا এ আয়াত থেকে জানা যায় যে, কাফেরদের কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা হারাম। বর্ণিত আছে যে, আনসাররা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কাফেরদের বিরুদ্ধে ইয়াহুদীদের কাছ থেকে সাহায্য চাওয়ার অনুমতি প্রার্থনা করলে তিনি বললেনঃ الخبيث لاحاجة لنابهم অর্থাৎ এরা দুরাচারী জাতি, তাদের সাহায্য আমাদের প্রয়োজন নেই। (মাযহারী ২য় খণ্ড, মাআরেফুল কুরআন ২/৫৮৪-৫৮৫)

ইরশাদ হয়েছেঃ

اِنَّ الَّذِيْنَ تَوَفّٰهُمُ الْمَلٰٓئِكَةُ ظَالِمِيْٓ اَنْفُسِهِمْ قَالُوْا فِيْمَ كُنْتُمْ ط قَالُوْا كُنَّا مُسْتَضْعَفِيْنَ فِى الْاَرْضِ ط قَالُوْٓا اَلَمْ تَكُنْ اَرْضُ اللّٰهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوْا فِيْهَا ط فَاُولٰٓئِكَ مَاْوٰهُمْ جَهَنَّمُ ط وَسَآءَتْ مَصِيْرًا (٩٧) اِلَّا الْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَآءِ وَالْوِلْدَانِ لَايَسْتَطِيْعُوْنَ حِيْلَةً وَّلَا يَهْتَدُوْنَ سَبِيْلًا (٩٨) فَاُولٰٓئِكَ عَسَى اللّٰهُ اَنْ

يَعْفُوَ عَنْهُمْ ط وَكَانَ اللّٰهُ عَفُوًّا غَفُوْرًا (٩٩) (نساء ٩٧ - ٩٩)

তরজমাঃ (৯৭) যারা নিজের অনিষ্ঠ করে, ফেরেশতারা তাদের প্রাণ হরণ করে বলে, তোমরা কি অবস্থায় ছিলে? তারা বলেঃ এ ভূখণ্ডে আমরা অসহায় ছিলাম। ফেরেশতারা বলেঃ আল্লাহর পৃথিবী কি প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা দেশ ত্যাগ করে সেখানে চলে যেতে? অতএব এদের বাসস্থান হল জাহান্নাম এবং তা অত্যন্ত মন্দ স্থান। (৯৮) কিন্তু পুরুষ, নারী ও শিশুদের মধ্যে যারা অসহায়, তারা কোন উপায় করতে পারে না এবং পথও জানেনা। (৯৯) অতএব, আশা করা যায়, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল। (সূরা নিসা ৯৭-৯৯)

হিজরতের সংজ্ঞা

তাফসীরঃ আলোচ্য আয়াতে হিজরতের ফযীলত, বরকত ও বিধি-বিধান বর্ণিত হয়েছে। অভিধানে হিজরত শব্দটি হিজরান অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। অর্থাৎ অসন্তুষ্টচিত্তে কোন কিছুকে ত্যাগ করা। সাধারণের মধ্যে প্রচলিত ভাষায় দেশ ত্যাগ করাকে হিজরত বলা হয়। শরীয়তের পরিভাষায় দারুল কুফর তথা কাফেরদের দেশ ত্যাগ করে দারুল ইসলাম তথা মুসলমানদের দেশে গমন করার নাম হিজরত। (রূহুল মাআনী)

মোল্লা আলী কারী (রহঃ) মেশকাতের শরায় বলেন, ধর্মীয় কারণে কোন দেশ ত্যাগ করাও হিজরতের অন্তর্ভুক্ত। (মিরকাত ১ম খণ্ড ৩৯ পৃষ্ঠা)

মুহাজির সাহাবীগণের সম্পর্ককে অবতীর্ণ সূরা হাশরের

اَلَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ

আয়াত থেকে জানা যায় যে, কোন দেশের কাফেররা যদি মুসলমানকে মুসলমান হওয়ার কারণে দেশ থেকে জোর-জবরদস্তি মূলকভাবে বহিষ্কার করে তবে তাও হিজরতের অন্তর্ভুক্ত।

এ সংজ্ঞা থেকে জানা গেল যেসব মুসলমান ভারতীয় দারুল কুফরের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে স্বেচ্ছায় পাকিস্তানে স্থানান্তরিত হয়েছে অথবা অমুসলমানরা যাদেরকে শুধু মুসলমান হওয়ার কারণে বাধ্যতামূলকভাবে দেশ থেকে বহিষ্কার করেছে। তারা সবাই শরীয়তের দৃষ্টিতে মুহাজির। তবে যারা

বাণিজ্যিক উন্নতি কিংবা চাকুরীর সুযোগ-সুবিধা লাভের নিয়তে দেশান্তরিত হয়েছে, তারা শরীয়তের দৃষ্টিতে মুহাজির বলে অভিহিত হওয়ার যোগ্য নয়। বুখারী ও মুসলিমের এক হাদীসে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ المهاجر من هجر مانهى الله عنه ورسوله। অর্থাৎ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রাসূল কর্তৃক নিষিদ্ধ বিষয়াদি পরিত্যাগ করে, সে মুহাজির। অতএব এ হাদীসেরই প্রথম বাক্য থেকে এর মর্ম ফুটে উঠে। বলা হয়েছেঃ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده। অর্থাৎ যার মুখ ও হাতের কষ্ট থেকে সব মুসলমান নিরাপদ থাকে সে মুসলমান। এর উদ্দেশ্য এই যে, যে ব্যক্তি অপরকে কষ্ট না দেয়, সেই সাচ্চা ও পাক্কা মুসলমান। এমনিভাবে সাচ্চা ও সফল মুহাজির ঐ ব্যক্তি যে, শুধু দেশত্যাগ করেই ক্ষান্ত হয় না, বরং শরীয়ত যেসব বিষয় হারাম ও অবৈধ সাব্যস্ত করেছে। সেগুলোকেও পরিত্যাগ করে। (মাআরেফুল কুরআন ৩/৬০০)

ইরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَنَصَرُوْا اُولٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ط وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا مَا لَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا ط وَاِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلَّا عَلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيْثَاقٌ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ (انفال ٧٢)

তরজমাঃ এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে, স্বীয় জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর রাহে জিহাদ করেছে এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় ও সাহায্য-সহায়তা দিয়েছে, তারা একে অপরের সহায়ক। আর যারা ঈমান এনেছে কিন্তু দেশ ত্যাগ করেনি তাদের বন্ধুত্বে তোমাদের প্রয়োজন নেই যতক্ষণ না তারা দেশ ত্যাগ করে। অবশ্য যদি তারা ধর্মীয় ব্যাপারে তোমাদের সহায়তা কামনা করে, তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। কিন্তু তোমাদের সাথে যাদের সহযোগী চুক্তি বিদ্যমান রয়েছে, তাদের মোকাবেলায় নয়। বস্তুতঃ তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ সে

সবই দেখেন। (সূরা আনফাল ৭২)

তাফসীরঃ সে সমস্ত লোক যারা ঈমান এনেছে এবং যারা আল্লাহর ওয়াস্তে নিজেদের প্রিয় জন্মভূমি ও আত্মীয়-আপনজনদের পরিত্যাগ করেছে এবং আল্লাহর রাহে নিজেদের জান-মাল দিয়ে জিহাদ করেছে, সম্পদ ব্যয় করে যুদ্ধের জন্য অস্ত্রশস্ত্র ও সাজ-সরঞ্জাম সংগ্রহ করেছে এবং যুদ্ধের জন্য নিজেদেরকে উৎসর্গ করেছে অর্থাৎ প্রাথমিক পর্যায়ে মুহাজিরবৃন্দ এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে; অর্থাৎ মদীনায় আনসার মুসলমানগণ– এতদুভয়ের সম্পর্কে বলা হয়েছে যে, তারা পরস্পরের ওলী বা সহায়ক। অতঃপর বলা হয়েছে সেসব লোক যারা ঈমান এনেছে বটে কিন্তু হিজরত করেনি। তাদের সাথে তোমাদের কোনই সম্পর্ক নেই যতক্ষণ না তারা হিজরত করবে। (মাআরেফুল কুরআন ৪/৩৭৩)

ইরশাদ হয়েছেঃ

ثُمَّ إِنَّ رَبَّكَ لِلَّذِينَ هَاجَرُوا مِنْ بَعْدِ مَا فُتِنُوا ثُمَّ جَاهَدُوا وَصَبَرُوا إِنَّ رَبَّكَ مِنْ بَعْدِهَا لَغَفُورٌ رَحِيمٌ (النحل ١١٠)

তরজমাঃ (১১০) যারা দুঃখ-কষ্ট ভোগের পর দেশ ত্যাগী হয়েছে অতঃপর জিহাদ করেছে এবং ধৈর্য ধারণ করেছে, নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা এসব বিষয়ের পরে অবশ্যই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (সূরা নাহল ১১০)

তাফসীরঃ এরপর যদি কুফরের পরে তারা বিশ্বাস স্থাপন করে, তবে নিশ্চয় আপনার পালনকর্তা তাদের জন্যে, যারা কুফরে লিপ্ত হওয়ার পর ঈমান আনয়ন করে হিজরত করেছে, অতঃপর জিহাদ করেছে এবং ঈমানে অবিচল রয়েছে, আপনার পালনকর্তা তাদের জন্যে এসবের অর্থাৎ এসব আমলের পর অত্যন্ত ক্ষমাকারী, দয়ালু। অর্থাৎ ঈমান ও সৎ কর্মের বরকতে অতীতের যাবতীয় গোনাহ মাফ হয়ে যাবে। আল্লাহ তাআলার রহমতে তারা জান্নাতে উচ্চ উচ্চ শ্রেণী পাবে। কুফর ও পূর্ববর্তী গোনাহতো শুধু ঈমান দ্বারাই মাফ হয়ে যায়– জিহাদ ইত্যাদি সৎকর্ম গোনাহ্ মাফ হওয়ার জন্য শর্ত নয়– কিন্তু সৎকর্ম জান্নাতে উচ্চ শ্রেণী পাওয়ার কারণ। তাই এর সাথে উল্লেখ করা হয়েছে। (মাআরেফুল কুরআন ৫/৪৫৮ পৃষ্ঠা)

হিজরতের ফযীলত

ইরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَٰئِكَ يَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ (البقرة ٢١٨)

তরজমাঃ আর এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, যারা ঈমান এনেছে এবং যারা হিজরত করেছে আর আল্লাহর পথে লড়াই (জিহাদ) করেছে। তারা আল্লাহর রহমতের প্রত্যাশী। আর আল্লাহ্ হচ্ছেন ক্ষমাকারী, করুণাময়। (বাকারা ২১৮)

তাফসীরঃ প্রকৃতপক্ষে যারা ঈমান এনেছে এবং যারা আল্লাহর রাস্তায় দেশ ত্যাগ করেছে এবং জিহাদ করেছে, তারাতো আল্লাহর রহমত ও অনুগ্রহ পাওয়ার আশা রাখে। কাজেই ঈমান ও হিজরতের সওয়াবতো সুনির্দিষ্ট। ঈমান, জিহাদ ও হিজরতের দরুন আল্লাহ্ পাক তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।

ইরশাদ হয়েছেঃ

فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لَا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِّنكُم مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَىٰ ۖ بَعْضُكُم مِّن بَعْضٍ ۖ فَالَّذِينَ هَاجَرُوا وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي وَقَاتَلُوا وَقُتِلُوا لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عِندَهُ حُسْنُ الثَّوَابِ (ال عمران ١٩٥)

তরজমাঃ অতঃপর তাদের পালনকর্তা তাদের দু'আ (এই বলে) কবুল করে নিলেন যে, আমি তোমাদের কোন পরিশ্রমকারীর পরিশ্রমই বিনষ্ট করি না, তা সে পুরুষ হোক কিংবা স্ত্রীলোক। তোমরা পরস্পর এক। তারপর সে সমস্ত লোক যারা হিজরত করেছে; তাদেরকে নিজেদের দেশ থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের প্রতি উৎপীড়ন করা হয়েছে আমার পথে এবং যারা লড়াই করেছে ও মৃত্যুবরণ করেছে, অবশ্যই আমি তাদের উপর

থেকে অকল্যাণকে অপসারিত করব এবং তাদেরকে প্রবিষ্ঠ করব জান্নাতে যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত। এই হলো বিনিময় আল্লাহর পক্ষ থেকে। আর আল্লাহর নিকট রয়েছে উত্তম বিনিময়। (সূরা আলে ইমরান ১৯৫)

হিজরত ও শাহাদাতের দ্বারা হক্কুল এবাদ ব্যতীত অন্যান্য সব গোনাহ মাফ হয়ে যায়

তাফসীরঃ لَنُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّاٰتِهِمْ আয়াতের আওতায় তাফসীরের সার সংক্ষেপে এই শর্তারোপ করা হয়েছে যে, আল্লাহর হকের বেলায় যে সমস্ত ত্রুটি-গাফলতী ও পাপ-তাপ হয়ে থাকে তা হিজরত ও শাহাদতের মাধ্যমে মাফ হয়ে যাবে। তার কারণ স্বয়ং রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাদীসে ঋণ-ধারকে এ থেকে পৃথক করে দিয়েছেন। বরং তাঁর নিয়ম হলো স্বয়ং পাওনাদার কিংবা তার উত্তরাধিকারীদেরকে প্রাপ্য পরিশোধ করে দিবে অথবা তাদের কাছ থেকে ক্ষমা করিয়ে নিবে। অবশ্য যদি কারো প্রতি আল্লাহ তাআলা বিশেষ অনুগ্রহ করে পাওনাদারকে রাজী করিয়ে দেন, তবে তা স্বতন্ত্র কথা। কারো কারো ব্যাপারে এমন হবেও বটে। (তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন ২/৩০৩-৩০৪)

اِنَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْا اُولٰٓئِكَ بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ط وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَلَمْ يُهَاجِرُوْا مَالَكُمْ مِّنْ وَّلَايَتِهِمْ مِّنْ شَىْءٍ حَتّٰى يُهَاجِرُوْا ج وَاِنِ اسْتَنْصَرُوْكُمْ فِى الدِّيْنِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ اِلَّا عَلٰى قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِّيْثَاقٌ ط وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ (٧٢) وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بَعْضُهُمْ اَوْلِيَآءُ بَعْضٍ ط اِلَّا تَفْعَلُوْهُ تَكُنْ فِتْنَةٌ فِى الْاَرْضِ وَفَسَادٌ كَبِيْرٌ (٧٣) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ اٰوَوْا وَّنَصَرُوْا اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا ط لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ وَّرِزْقٌ كَرِيْمٌ (٧٤) وَالَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا مَعَكُمْ فَاُولٰٓئِكَ مِنْكُمْ ط

وَاُولُوا الْاَرْحَامِ بَعْضُهُمْ اَوْلٰى بِبَعْضٍ فِىْ كِتٰبِ اللّٰهِ ط اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ
شَىْءٍ عَلِيْمٌ (٧٥) (انفال ٧٢-٧٥)

তরজমাঃ (৭২) এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে, স্বীয় জান ও মাল দ্বারা আল্লাহর রাহে জিহাদ করেছে এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় ও সাহায্য সহায়তা দিয়েছে, তারা একে অপরের সহায়ক। আর যারা ঈমান এনেছে কিন্তু দেশ ত্যাগ করেনি তাদের বন্ধুত্বে তোমাদের প্রয়োজন নেই যতক্ষণ না তারা দেশ ত্যাগ করে। অবশ্য যদি তারা ধর্মীয় ব্যাপারে তোমাদের সহায়তা কামনা করে, তবে তাদের সাহায্য করা তোমাদের কর্তব্য। কিন্তু তোমাদের সাথে যাদের সহযোগী চুক্তি বিদ্যমান রয়েছে, তাদের মোকাবেলায় নয়। বস্তুতঃ তোমরা যা কিছু কর, আল্লাহ সে সবই দেখেন। (৭৩) আর যারা কাফের তারা পারস্পরিক সহযোগী, বন্ধু। তোমরা যদি এমন ব্যবস্থা না কর তবে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বিস্তার লাভ করবে এবং দেশময় বড়ই অকল্যাণ হবে। (৭৪) আর যারা ঈমান এনেছে, নিজেদের ঘর-বাড়ী ছেড়েছে এবং আল্লাহর রাহে জিহাদ করেছে এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে, সাহায্য-সহায়তা করেছে, তাঁরাই হলো সত্যিকার মুসলমান। তাঁদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও সম্মানজনক রুযী। (৭৫) আর যারা ঈমান এনেছে পরবর্তী পর্যায়ে এবং ঘর-বাড়ী ছেড়েছে এবং তোমাদের সাথে সম্মিলিত হয়ে জিহাদ করেছে, তারাও তোমাদেরই অন্তর্ভুক্ত। বস্তুতঃ যারা আত্মীয়, আল্লাহর বিধান মতে তারা পরস্পর বেশী হকদার। নিশ্চয়ই আল্লাহ যাবতীয় বিষয়ে অবগত। (আনফাল ৭২-৭৫)

তাফসীরঃ তৃতীয় আয়াতে মক্কা থেকে হিজরতকারী সাহাবায়ে কেরাম এবং তাঁদের সাহায্যকারী মদীনাবাসী আনসারদের প্রশংসা, তাঁদের সত্যিকার মুসলমান হওয়ার সাক্ষ্য ও তাদের মাগফিরাত ও সম্মানজনক উপার্জন দানের ওয়াদার কথা বলা হয়েছে। ইরশাদ হয়েছে- اُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَقًّا অর্থাৎ তারাই হচ্ছেন সত্যিকারভাবে মুসলমান। এতে ইঙ্গিত রয়েছে যে, যারা হিজরত করতে পারেননি যদিও তাঁরা মুসলমান কিন্তু তাদের ইসলাম পরিপূর্ণ নয় এবং নিশ্চিতও নয়। কারণ তাতে এমন সম্ভাবনাও রয়েছে যে, হয়তো বা তারা প্রকৃতপক্ষে মুনাফিক হয়ে প্রকাশ্যে ইসলামের দাবী করছে।

তারপরেই বলা হয়েছে– لَهُمْ مَّغْفِرَةٌ অর্থাৎ তাদের জন্য মাগফেরাত নির্ধারিত। যেমনঃ বিশুদ্ধ হাদীসসমূহে বর্ণিত রয়েছে যে, الاسلام يهدم ماكان قبله والهجرة تهدم ماكان قبلها অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ যেমন তার পূর্ববর্তী সমস্ত পাপকে নিঃশেষ করে দেয়, তেমনিভাবে হিজরত তার পূর্ববর্তী সমস্ত পাপকে নিঃশেষ করে দেয়।

(তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন ৪/৩৭৬–৩৭৭)

ইরশাদ হয়েছেঃ

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِهِمْ وَاَنْفُسِهِمْ اَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللّٰهِ ط وَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ (٢٠) يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَّجَنّٰتٍ لَّهُمْ فِيْهَا نَعِيْمٌ مُّقِيْمٌ (٢١) خٰلِدِيْنَ فِيْهَا اَبَدًا ط اِنَّ اللّٰهَ عِنْدَهٗٓ اَجْرٌ عَظِيْمٌ (التوبة ٢٠ - ٢٢)

তরজমাঃ (২০) যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহর রাহে নিজেদের মাল ও জান দিয়ে জিহাদ করেছে। তাদের বড় মর্যাদা রয়েছে আল্লাহর কাছে আর তারাই সফলকাম। (২১) তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন তাদের পরোয়ারদেগার স্বীয় দয়া ও সন্তোষের এবং জান্নাতের, সেখানে আছে তাদের জন্য স্থায়ী শান্তি। (২২) তথায় তারা থাকবে চিরদিন। নিঃসন্দেহে আল্লাহর কাছে আছে মহা পুরস্কার (তাওবা ২০–২২)

তাফসীরঃ আল্লাহ্ পাক ইরশাদ করেন–

اَلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجٰهَدُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ

অর্থাৎ যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে এবং আল্লাহর রাহে মাল ও জান দিয়ে যুদ্ধ করেছে। আল্লাহ্ তাআলার কাছে রয়েছে তাদের বড় মর্যাদা এবং তারাই সফলকাম। পক্ষান্তরে তাদের প্রতিপক্ষ মুশরিকদের কোন সফলতা আল্লাহ দান করেন না। তবে সাধারণ মুসলমানগণ এ সফলতার অংশীদার কিন্তু দেশত্যাগী মুজাহিদগণের সফলতা সবার উর্ধ্বে। তাই পূর্ণ সফলতার অধিকারী হল তারা। ২১তম ও ২২তম আয়াতে সেই সকল

লোকদের পুরস্কার ও পরকালীন মর্যাদার বর্ণনা রয়েছে। ইরশাদ হয়েছে–

يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَّجَنّٰتٍ তাদের প্রতিপালক তাদের সুসংবাদ দিচ্ছেন স্বীয় দয়া ও সন্তোষের এবং জান্নাতের যেখানে তাদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শান্তি, তারা সেখানে চিরদিন থাকবে। আর আল্লাহর কাছে রয়েছে মহান পুরস্কার। (মাআরেফুল কুরআন ৪/৪১৬)

ইরশাদ হয়েছেঃ

وَالسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ رَّضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ وَاَعَدَّ لَهُمْ جَنّٰتٍ تَجْرِيْ تَحْتَهَا الْاَنْهٰرُ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ط ذٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ (التوبة ١)

তরজমাঃ আর যারা সর্বপ্রথম হিজরতকারী ও আনসারদের মাঝে পুরাতন এবং যারা তাদের অনুসরণ করেছে, আল্লাহ সে সমস্ত লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছে। আর তাদের জন্য প্রস্তুত রেখেছেন কাননকুঞ্জ, যার তলদেশ দিয়ে প্রবাহিত প্রস্রবণসমূহ। সেখানে তারা থাকবে চিরকাল। এটাই হল মহান কৃতকার্যতা। (তাওবা ১০০)

তাফসীরঃ উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ পাক সাহাবায়ে কেরাম তথা মুহাজেরীন ও আসনারদেরকে দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। (১) ঐ সকল সাহাবা যারা ঈমান গ্রহনে ও হিজরতে যারা অগ্রবর্তী। (২) অন্যান্য সাহাবা। তবে সাহাবায়ে কেরামের সকলেই জান্নাতী হবেন। কারণ তাঁরা আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রাপ্ত।

اَلسّٰبِقُوْنَ الْاَوَّلُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ

বাক্যটিতে ব্যবহৃত مِنْ অব্যয়কে অধিকাংশ তাফসীরবিদগণ تَبْعِيْضٌ এর জন্য সাব্যস্ত করে মুহাজিরীন ও আনসারদের দুটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। (১) ঈমান গ্রহণে ও হিজরতে যারা অগ্রবর্তী এবং (২) অন্যান্য সাহাবায়ে কেরাম। এমন করার ক্ষেত্রেও মতবিরোধ রয়েছে। কোন কোন মনীষী সাহাবায়ে কেরামদের মধ্যে سَابِقِيْنَ اَوَّلِيْنَ তাদেরকেই সাব্যস্ত করেছেন, যারা উভয় কেবলা (অর্থাৎ বায়তুল মুকাদ্দাস ও বায়তুল্লাহ)-এর দিকে মুখ করে নামায পড়েছেন। অর্থাৎ যারা কেবলা পরিবর্তনের পূর্বে

মুসলমান হয়েছেন তাঁদেরকে سَابِقِيْنَ اَوَّلِيْنَ গণ্য করেছেন। এমতটি হল সাঈদ ইবনে মুসাইয়্যেব ও কাতাদাহ রাযিয়াল্লাহু আনহুর। হযরত আতা ইবনে আবী রাবাহ বলেছেন যে, সাবেকীনে আওয়ালীন হলেন সে সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম যারা গাযওয়ায়ে বদরে অংশগ্রহণ করেছেন। আর ইমাম শা'বী (রহঃ) এর মতে যেসব সাহাবী হুদায়বিয়ার বায়আতে রেদওয়ানে অংশগ্রহণ করেছিলেন, তাঁরাই 'সাবেকীনে আওয়ালীন'। বস্তুতঃ প্রতিটি মতানুযায়ী অন্যান্য সাহাবাগণ মুজাহির হোক বা আনসার সাবেকীনে আওয়ালীনের পর দ্বিতীয় শ্রেণীভুক্ত। (কুরতুবী, মাযহারী)

তাফসীরে মাযহারীতে আরো একটি মত উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, এ আয়াতে مِنْ অব্যয়টি আংশিককে বুঝানোর উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়নি, বরং বিবরণের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়েছে। তখন এর মর্ম হবে এই যে, সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম অন্যান্য সমস্ত উম্মতের তুলনায় সাবেকীনে আওয়ালীন। আর سَابِقِيْنَ اَوَّلِيْنَ হল তার বিবরণ। প্রথম তাফসীর অনুযায়ী সাহাবায়ে কেরামের দুটি শ্রেণী সাব্যস্ত হয়েছে। একটি হল সাবেকীনে আওয়ালীনের। আর দ্বিতীয়টি কেবলা পরিবর্তন কিংবা গযওয়ায়ে বদর অথবা বায়আতে রেদওয়ানের পরে যারা মুসলমান হয়েছেন। তাঁদের আর দ্বিতীয় তাফসীরের মর্ম হল এই যে, সাহাবায়ে কেরামই হলেন মুসলমানদের মধ্যে সাবেকীনে আওয়ালীন। কারণ ঈমান আনার ক্ষেত্রে তাঁরাই সমগ্র উম্মতের অগ্রবর্তী ও প্রথম। وَالَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ بِاِحْسَانٍ অর্থাৎ যারা আমল ও চরিত্রের ক্ষেত্রে প্রথম পর্যায়ের অগ্রবর্তী মুসলমানদের অনুসরণ করেছে পরিপূর্ণভাবে। প্রথম বাক্যের প্রথম তাফসীর অনুযায়ী তাঁদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীতে রয়েছে সে সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম। যারা কেবলা পরিবর্তন কিংবা গাওয়ায়ে বদর অথবা বায়আতে হুদায়বিয়ার পর মুসলমান হয়ে সাহাবায়ে কেরামের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। দ্বিতীয় শ্রেণী হল তাঁদের পরবর্তী সে সমস্ত মুসলমানদের, যারা কিয়ামত অবধি ঈমান গ্রহণ, সৎকর্ম ও সচ্চরিত্রিকতার ক্ষেত্রে সাহাবায়ে কেরামের আদর্শের উপর চলবে এবং পরিপূর্ণভাবে তাঁদের অনুসরণ করবে।

আর দ্বিতীয় তাফসীর অনুযায়ী اَلَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُمْ বাক্যে সাহাবায়ে কেরামের পরবর্তী মুসলমানগণ অন্তর্ভুক্ত। যাদেরকে পরিভাষাগতভাবে تَابِعِىٌّ (তাবেয়ী) বলা হয়। এরপর পরিভাষাগত এই তাবেয়ীগণের পর

কিয়ামত অবধি আগত সে সমস্ত মুসলমানও এর অন্তর্ভুক্ত যারা ঈমান ও সৎকর্মের ক্ষেত্রে পরিপূর্ণভাবে সাহাবায়ে কেরামের আনুগত্য ও অনুসরণ করবে। (মাআরেফুল কুরআন ৪/৫৪৩-৪৫৫)

ইরশাদ হয়েছেঃ

لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهٰجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِيْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ مِنْ بَعْدِ مَا كَادَ يَزِيْغُ قُلُوْبُ فَرِيْقٍ مِّنْهُمْ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ ط اِنَّهٗ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ (التوبة ١١٧)

তরজমাঃ আল্লাহ্ দয়াশীল নবীর প্রতি এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি, যারা কঠিন মুহূর্তে নবীর সঙ্গে ছিল, যখন তাদের এক দলের অন্তর ফিরে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। অতঃপর তিনি দয়া পরবশ হন তাদের প্রতি। নিঃসন্দেহে তিনি তাদের প্রতি দয়াশীল ও করুণাময়। (তাওবা ১১৭)

তাফসীরঃ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং মুহাজির ও আনসারদের প্রতি সর্বদা আল্লাহ পাকের রহমত বর্ষিত হওয়া ও মুহাজির ও আনসারগণ কঠিন মুহূর্তেও নবীর সঙ্গে থাকায় আল্লাহর সন্তুষ্টির কথা বর্ণিত হয়েছে।

ইরশাদ হয়েছেঃ

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِى اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مَا ظُلِمُوْا لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِى الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّلَاَجْرُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ م لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُوْنَ (٤١) اَلَّذِيْنَ صَبَرُوْا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ (٤٢) (النحل ٤١-٤٢)

তরজমাঃ (৪১) যারা নির্যাতিত হওয়ার পর আল্লাহ তাআলার জন্য গৃহত্যাগ করেছে, আমি অবশ্যই তাদেরকে দুনিয়াতে উত্তম আবাস দেব এবং পরকালের পুরস্কার তো সর্বাধিক; হায়! যদি তারা জানত। (৪২) যারা দৃঢ়পদ রয়েছে এবং তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করেছে। (সূরা নাহল ৪১-৪২)

হিজরত দুনিয়াতেও সচ্ছল জীবিকার কারণ হয় কি?

তাফসীরঃ আলোচ্য আয়াতদ্বয়ে কতিপয় শর্তাধীনে মুহাজিরদের সাথে দুটি বিরাট ওয়াদা করা হয়েছে। প্রথম দুনিয়াতেই উত্তম ঠিকানা দেয়ার এবং

দ্বিতীয় পরকালে বেহিসাব সওয়াবের। দুনিয়াতে উত্তম ঠিকানা এটি একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ। বসবাসের জন্য গৃহ এবং সৎ প্রতিবেশী পাওয়া উত্তম রিযিক পাওয়া, শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয় ও সাফল্য পাওয়া, সাধারণের মুখে মুহাজিরদের প্রশংসা ও সুখ্যাতি থাকা এবং পুরুষানুক্রমে পারিবারিক ইজ্জত ও গৌরব পাওয়া সবই এর অন্তর্ভুক্ত। (কুরতুবী)

আয়াতের শানে নুযূল মূলতঃ ঐ প্রথম হিজরত, যা সাহাবায়ে কেরাম আবিসিনিয়া অভিমুখে করেন। এরূপ সম্ভাবনাও রয়েছে যে, আবিসিনিয়ার হিজরত এবং পরবর্তী কালের মদীনায় হিজরত উভয়টি এর অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তাই কেউ কেউ বলেন যে, এ ওয়াদা বিশেষ করে ঐ সাহাবায়ে কেরামের জন্য, যাঁরা আবিসিনিয়ায় কিংবা মদীনায় হিজরত করেছিলেন। আল্লাহ্‌র ওয়াদা দুনিয়াতে পূর্ণ হয়ে গেছে। সবাই তা প্রত্যক্ষ করেছে। আল্লাহ্‌ তাআলা মদীনাকে তাঁদের জন্য কি চমৎকার ঠিকানা করেছিলেন। উৎপীড়নকারী প্রতিবেশীদের স্থলে তাঁরা সহানুভূতিশীল, মহানুভব প্রতিবেশী পেয়েছিলেন। তাঁরা শত্রুদের বিপক্ষে বিজয় ও সাফল্য লাভ করেছিলেন। হিজরতের পর অল্প কিছু দিন অতিবাহিত হতেই তাঁদের সামনে রিযিকের দ্বার উম্মুক্ত করে দেয়া হয়। যাঁরা ছিলেন ফকীর-মিসকীন, তাঁরা হয়ে যায় বিত্তশালী-ধনী। দুনিয়ার বিভিন্ন দেশ বিজিত হয়। তাঁদের চরিত্র মাধুর্য ও সৎ কর্মের কীর্তি আবহমানকাল পর্যন্ত শত্রু-মিত্র নির্বিশেষে সবার মুখে উচ্চারিত হয়। তাঁদেরকে এবং তাদের বংশধরকে আল্লাহ্‌ তাআলা অসামান্য ইজ্জত ও গৌরব দান করেন। এগুলো হচ্ছে পার্থিব বিষয়। পরকালের ওয়াদা পূর্ণ হওয়াও অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তাফসীর বাহ্‌রে মুহীতে আবু হাইয়্যান বলেনঃ

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا عام فى المهاجرين كائنا ماكانوا فيشمل اولهم واخرهم

অর্থাৎ اَلَّذِيْنَ هَاجَرُوْا আয়াতটি বিশ্বের সমস্ত মুহাজিরের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য, যে কোন অঞ্চল ও যুগের মুহাজির হোক না কেন। তাই প্রথম যুগের হিজরতকারী মুহাজির এবং কিয়ামত পর্যন্ত আরও যত মুহাজির হবে সবাই এর অন্তর্ভুক্ত। সাধারণ তাফসীর বিধির তাগিদও তাই। আয়াতের শানে নুযূল বিশেষ ঘটনা ও বিশেষ শ্রেণীর লোক হলেও শব্দের ব্যাপকতা ধর্তব্য হয়ে থাকে। তাই সারা বিশ্বের এবং সর্বকালের মুহাজির

আলোচ্য ওয়াদার অন্তর্ভুক্ত। উভয় ওয়াদা সব মুহাজিরের ক্ষেত্রে পূর্ণ হওয়া একটি নিশ্চিত ও অনিবার্য ব্যাপার। (মাআরেফুল কুরআন ৫/৩৭৭-৩৭৮)

وَالَّذِيْنَ هَاجَرُوْا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ قُتِلُوْٓا اَوْ مَاتُوْا لَيَرْزُقَنَّهُمُ اللّٰهُ رِزْقًا حَسَنًا ط وَاِنَّ اللّٰهَ لَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ (٥٨) لَيُدْخِلَنَّهُمْ مُّدْخَلاً يَّرْضَوْنَهٗ ط وَاِنَّ اللّٰهَ لَعَلِيْمٌ حَلِيْمٌ (٥٩) ذٰلِكَ ج وَمَنْ عَاقَبَ بِمِثْلِ مَا عُوْقِبَ بِهٖ ثُمَّ بُغِىَ عَلَيْهِ لَيَنْصُرَنَّهُ اللّٰهُ ط اِنَّ اللّٰهَ لَعَفُوٌّ غَفُوْرٌ (٦٠) (الحج ٥٨-٦٠)

তরজমাঃ (৫৮) যারা আল্লাহর পথে গৃহ ত্যাগ করেছে, এরপর নিহত হয়েছে অথবা মরে গেছে; আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করবেন এবং আল্লাহ সর্বোৎকৃষ্ট রিযিকদাতা। (৫৯) তাদেরকে অবশ্যই এমন এক স্থানে পৌঁছাবেন, যাকে তারা পছন্দ করবে এবং আল্লাহ জ্ঞানময়, সহনশীল। (৬০) এতো শুনলে, যে ব্যক্তি নিপীড়িত হয়ে নিপীড়ন পরিমাণে প্রতিশোধ গ্রহণ করে এবং পুণরায় সে নিপীড়িত হয়, আল্লাহ অবশ্যই তাকে সাহায্য করবেন। নিশ্চয় আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল। (সূরা হজ্জ ৫৮-৬০)

তাফসীরঃ হিজরত ও শাহাদাতের ফযীলত এই যে, আল্লাহ পাক তাদেরকে উৎকৃষ্ট জীবিকা দান করবেন এবং বেহেশতে প্রবেশ করাবেন, আর এটাই চরম সফলতা।

لِلْفُقَرَآءِ الْمُهٰجِرِيْنَ الَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلاً مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ ط اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ (٨) وَالَّذِيْنَ تَبَوَّؤُ الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُوْنَ فِىْ صُدُوْرِهِمْ حَاجَةً مِّمَّآ اُوْتُوْا وَيُؤْثِرُوْنَ عَلٰى اَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ قف وَّمَنْ يُّوْقَ شُحَّ نَفْسِهٖ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ (٩) وَالَّذِيْنَ جَآءُوْا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِاِخْوَانِنَا الَّذِيْنَ سَبَقُوْنَا بِالْاِيْمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِىْ قُلُوْبِنَا غِلًّا لِّلَّذِيْنَ

اٰمَنُوْا رَبَّنَا اِنَّكَ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ (١٠) (الحشر ٨-١٠)

তরজমাঃ (৮) এই ধন-সম্পদ দেশত্যাগী নিঃস্বদের জন্যে, যারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি লাভের অন্বেষণে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাহায্যার্থে নিজেদের বাস্তুভিটা ও ধন-সম্পদ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে, তারাই সত্যবাদী। (৯) যারা মুহাজিরদের আগমনের পূর্বে মদীনায় বসবাস করেছিল এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছিল, তারা মুহাজিরদের ভালবাসে, মুজাহিদেরকে যা দেয়া হয়েছে, তজ্জন্যে তারা অন্তরে ঈর্ষা পোষণ করে না এবং নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও তাদেরকে অগ্রাধিকার দান করে, যারা মনের কার্পণ্য থেকে মুক্ত, তারাই সফলকাম। (১০) (আর এই সম্পদ তাদের জন্য), যারা তাদের পরে আগমন করেছে। তারা বলেঃ হে আমাদের পালনকর্তা! আমাদেরকে এবং ঈমানে অগ্রণী আমাদের ভ্রাতাগণকে ক্ষমা কর এবং ঈমানদারদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে কোন বিদ্বেষ রেখো না। হে আমাদের পালনকর্তা! আপনি দয়ালু, পরম করুণাময়। (সূরা হাশর ৮–১০)

মুহাজিরদের শ্রেষ্ঠত্ব

তাফসীরঃ اَلَّذِيْنَ اُخْرِجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَاَمْوَالِهِمْ يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا وَّيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ এতে মুহাজিরগণের প্রথম গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, তাঁরা স্বদেশ ও সহায়-সম্পত্তি থেকে বহিষ্কৃত হয়েছেন। তাঁরা মুসলমান এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সমর্থক ও সাহায্যকারী শুধু এই অপরাধে মক্কার কাফেররা তাঁদের উপর অকথ্য নির্যাতন চালায়। শেষ পর্যন্ত তাঁরা মাতৃভূমি, ধন-সম্পদ ও বাস্তুভিটা ছেড়ে হিজরত করতে বাধ্য হন। তাঁদের কেউ কেউ ক্ষুধার তাড়নায় অতিষ্ঠ হয়ে পেটে পাথর বেঁধে নিতেন এবং কেউ কেউ শীত বস্ত্রের অভাবে গর্ত খনন করে তাতে শীতের দাপট থেকে আত্মরক্ষা করতেন। (মাযহারী, কুরতুবী)

মুসলমানদের ধন-সম্পদের উপর কাফেরদের দখল সম্পর্কিত বিধান

আলোচ্য আয়াতে মুহাজিরগণকে ফকীর বলা হয়েছে। ফকীর সেই ব্যক্তি, যার মালিকানায় কিছু না থাকে অথবা নেসাব পরিমাণ কোন কিছু না থাকে। মক্কায় তাঁদের অধিকাংশই ধন-সম্পদ ও সহায়-সম্বলের অধিকারী ছিলেন। হিজরতের পরও যদি সেই ধন-সম্পদ তাঁদের মালিকানায় থাকত, তবে তাঁদেরকে ফকীর ও নিঃস্ব বলা ঠিক হত না। কুরআন পাক তাঁদেরকে ফকীর বলে ইঙ্গিত করেছে যে, হিজরতের পর তাঁদের মক্কায় পরিত্যক্ত বিষয়-সম্পত্তি তাঁদের মালিকানা থেকে বের হয়ে কাফেরদের দখলে চলে গেছে। এ কারণেই ইমাম আযম আবু হানীফা (রহঃ) ও ইমাম মালেক (রহঃ) বলেনঃ যদি মুসলমান কোন জায়গায় হিজরত করে চলে যায় এবং তাদের পরিত্যক্ত বিষয়-সম্পত্তি কাফেররা দখল করে নেয়, অথবা খোদা না করুন কোন দারুল ইসলাম কাফেররা অধিকার করে মুসলমানদের ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নেয়, তবে এসব ধন-সম্পদ কাফেরদের পুরোপুরি দখলের পর তাদের মালিকানায় চলে যায়। এগুলো বেচাকেনা ইত্যাদি কার্যকলাপ আইনসিদ্ধ নয়। বিভিন্ন হাদীস থেকেও এর সমর্থন পাওয়া যায়। এ স্থলে তাফসীরে মাযহারীতে সে সব হাদীস উল্লেখ করা হয়েছে।

মুহাজিরগণের দ্বিতীয় গুণ বর্ণনা প্রসঙ্গে বলা হয়েছে–

يَبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا

অর্থাৎ তারা কোন জাগতিক স্বার্থের বশবর্তী হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেননি এবং হিজরত করে মাতৃভূমি ও ধন-সম্পদ ত্যাগ করেননি। কেবলমাত্র আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টিই তাঁদের কাম্য ছিল। এ থেকে তাঁদের পূর্ণ আন্তরিকতা বুঝা যায়। فَضْلًا শব্দটি প্রায়শঃ পার্থিব নিআমতের জন্য এবং رِضْوَانٌ শব্দটি পারলৌকিক নিআমতের জন্য ব্যবহৃত হয়। কাজেই অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তাঁরা তাঁদের সাবেক ঘর-বাড়ী, বিষয় সম্পত্তি ইত্যাদি ছেড়ে দিয়ে এখন ইসলামের ছায়াতলে সাংসারিক প্রয়োজন এবং পরকালের নিআমত কামনা করছেন।

মুহাজিরগণের তৃতীয় গুণ এই বর্ণিত হয়েছে– وَيَنْصُرُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সাহায্য করার জন্য তাঁরা উপরোক্ত সবকিছু করেছেন। আল্লাহকে সাহায্য করার অর্থ তাঁর দ্বীনকে সাহায্য করা। এক্ষেত্রে তাঁদের ত্যাগ ও তীতিক্ষা বিস্ময়কর।

তাদের চতুর্থ গুণ হচ্ছেঃ اُولٰٓئِكَ هُمُ الصّٰدِقُوْنَ অর্থাৎ তাঁরাই কথা ও কাজে সত্যবাদী। ইসলামের কালেমা পাঠ করে তাঁরা আল্লাহ ও রাসূলের সাথে যে অঙ্গীকারে আবদ্ধ হয়েছিলেন, তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন। এ আয়াত সকল মুহাজির সাহাবী সত্যবাদী বলে দৃপ্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেছে। অতএব যে ব্যক্তি তাঁদের কাউকে মিথ্যাবাদী বলে, সে এই আয়াত অস্বীকার করার কারণে মুসলমান হতে পারে না। নাউযুবিল্লাহ। রাফেযী সম্প্রদায় তাঁদেরকে মুনাফিক আখ্যা দেয়। এটা এই আয়াতের সুস্পষ্ট লংঘন। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই ফকীর মুহাজিরগণের ওসীলা দিয়ে আল্লাহর কাছে দু'আ করতেন। এতেই বুঝা যায় যে, হুযূরের কাছে তাঁদের কি মর্যাদা ছিল। (মাযহারী, তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন ৮/৪৩৪–৪৩৬)

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরত

ইরশাদ হয়েছেঃ

اِلَّا تَنْصُرُوْهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللّٰهُ اِذْ اَخْرَجَهُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا ثَانِيَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِى الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِهٖ لَا تَحْزَنْ اِنَّ اللّٰهَ مَعَنَا ج فَاَنْزَلَ اللّٰهُ سَكِيْنَتَهٗ عَلَيْهِ وَاَيَّدَهٗ بِجُنُوْدٍ لَّمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا السُّفْلٰى وَكَلِمَةُ اللّٰهِ هِيَ الْعُلْيَا ط وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ حَكِيْمٌ (التوبة ٤٠)

তরজমাঃ যদি তোমরা তাকে (রাসূলকে) সাহায্য না কর, তবে মনে রেখো, আল্লাহ তার সাহায্য করেছিলেন, যখন তাকে কাফেররা বহিষ্কার করেছিল। তিনি ছিলেন দু'জনের একজন, যখন তারা গুহার মধ্যে ছিলেন। তখন তিনি আপন সঙ্গীকে বললেন, বিষণ্ন হয়ো না, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। অতঃপর আল্লাহ তার প্রতি স্বীয় সান্ত্বনা নাযিল করলেন এবং তাঁর

সাহায্যে এমন বাহিনী পাঠালেন, যা তোমরা দেখনি। বস্তুতঃ আল্লাহ কাফেরদের মাথা নীচু করে দিলেন আর আল্লাহর কথাই সদা সমুন্নত এবং আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (তাওবা ৪০)

তাফসীরঃ উক্ত আয়াতে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের ঘটনা উল্লেখ করে দেখিয়ে দেয়া হয় যে, আল্লাহর রাসূল কোন মানুষের সাহায্য-সহযোগিতার মোহতাজ নন। আল্লাহ প্রত্যক্ষভাবে গায়ের থেকে তাঁর সাহায্য করতে সক্ষম। যেমন, হিজরতের সময় করা হয়, যখন তাঁর আপন গোত্র ও দেশবাসী তাঁকে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করে। সফর সঙ্গী হিসেবে একমাত্র সিদ্দীকে আকবর রাযিয়াল্লাহু আনহু ছাড়া আর কেউ ছিল না। পদব্রজী ও অশ্বারোহী শত্রুরা সর্বত্র তাঁর খোঁজ করে ফিরছে। অথচ আশ্রয়স্থল কোন মজবুত দুর্গ ছিল না; বরং তা ছিল এক গীরি গুহা, যার দ্বার প্রান্ত পর্যন্ত পৌঁছে ছিল তাঁর শত্রুরা। তখন গুহা সঙ্গী আবু বকর রাযিয়াল্লাহু আনহুর চিন্তা নিজের জন্য ছিল না, বরং তিনি এই ভেবে সন্ত্রস্ত হয়েছিলেন যে, হয়ত শত্রুরা তাঁর বন্ধুর জীবন নাশ করে দিবে। কিন্তু এ সময়েও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন পাহাড়ের মত অনড়, অটল ও নিশ্চিন্ত। শুধু যে নিজে তা নয়, বরং সফর সঙ্গীকেও অভয় দিয়ে বলছিলেন, "চিন্তিত হয়ো না। আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন।" দু শব্দের এ বাক্যটি বলা মুশকিল কিছু নয়। কিন্তু শ্রোতাবৃন্দ এ নাজুক দৃশ্য সামনে রেখে চিন্তা করলে বুঝতে দেরী হবে না যে, নিছক দুনিয়াবী উপায়-উপকরণের প্রতি ভরসা রেখে মনের এই নিশ্চিন্তভাব সম্ভব নয়। তবুও যে সম্ভব হল আয়াতের পরবর্তী বাক্যে তার রহস্য বলে দেয়া হল। ইরশাদ হয়– "আল্লাহ তাঁর কলব মুবারকে সান্ত্বনা নাযিল করেন এবং এমন বাহিনী দ্বারা তাঁর সাহায্য করেন, যা তোমাদের দৃষ্টিগোচর হয়নি।" অদৃশ্য বাহিনী বলতে ফেরেশতাগণও হতে পারেন এবং জগতের গোপন শক্তিসমূহও হতে পারে। কারণ এগুলোও আল্লাহর সৈন্য দল। সারকথা এর ফলে কুফরীর পতাকা অবনমিত হয় এবং আল্লাহর ঝাণ্ডা মাথা তুলে দাঁড়ায়। (তাফসীরে মাআরেফুল কুরআন ৪/৪৬৪)

সমাপ্ত

মাকতাবাতুল আশরাফ
(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
পাঠকবন্ধু মার্কেট (আন্ডার গ্রাউন্ড)
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ০১১-৮৩৭৩০৮, ০১৭-১৪১৭৬৪